দেখে এলাম

মনোজ বসু

মনোজ বসু

মনোজ বসু

মনোজ বসু

চীন দেখে এলাম

বেঙ্গল পাবলিশার্স * কলিকাতা-১২

পঞ্চম সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৬২
প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৬০
দ্বিতীয় সংস্করণ—মাঘ, ১৩৬০
তৃতীয় সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১
চতুর্থ সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬১
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স,
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর—রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ
১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড,
কলিকাতা-১৩
প্রচ্ছদপট শিল্পী—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক, প্রচ্ছদপট ও ছবি মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

তিন টাকা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার
করকমলেষু,

ভারতবর্ষে ছায়াছবির পথিকৃৎ, সর্বব্যাপ্ত এই পরিচয়। আর এক বড় পরিচয় অন্তরঙ্গরাই শুধু জানেন—অপরূপ ভ্রমণরস-রসিকতা। নতুন-চীনের এই ছবি নিশ্চয় দেখা নেই, তাই নতুন লাগবে।

মনোজ বসু

সামনের চিত্র-পরিচয়ঃ

শান্তি-সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি ও দর্শক। প্রথম সারির কেন্দ্রস্থলে দলপতি ডক্টর কিচলু। দক্ষিণে যথাক্রমে রবিশঙ্কর মহারাজ, ডক্টর জ্ঞানচাঁদ, লেখক...

এই লেখকের—

মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প (২য় সং), **বকুল** (৩য় সং), **জলজঙ্গল** (২য় সং), **নবীন-যাত্রা** (৪র্থ সং), **কুঙ্কুম** (২য় সং), **খদ্যোত** (২য় সং), **বাঁশের কেল্লা** (৪র্থ সং), **উলু** (২য় সং), **কাচের আকাশ** (২য় সং), **রাখিবন্ধন**, **বিপর্যয়**, **আগস্ট ১৯৪২** (৩য় সং), **ভুলি নাই** (২৫শ সং), **শত্রুপক্ষের মেয়ে** (৩য় সং), **সৈনিক** (৬ষ্ঠ সং), **ওগো বধূ সুন্দরী** (৩য় সং), **নরবাঁধ** (৪র্থ সং), **বনমর্মর** (৪র্থ সং), **একদা নিশীথকালে** (৪র্থ সং), **পৃথিবী কাদের** (৪র্থ সং), **দেবী কিশোরী** (২য় সং), **দুঃখ নিশার শেষে** (৩য় সং), **নূতন প্রভাত** (৪র্থ সং), **প্লাবন** (৪র্থ সং), **যুগান্তর** (২য় সং), **দিল্লি অনেক দূর**, **আজ সন্ধ্যায়**, **অভিনয়**, **এক বিহঙ্গী** (২য় সং), **কিংশুক**।

প্রথম পর্ব

(১)

নিমন্ত্রণটা এলো অপ্রত্যাশিত ভাবে। আমাকে শান্তি-সম্মেলনের প্রতিনিধি করা হয়েছে। কেন হে বাপু? ভেবে-চিন্তে তো কোন গুণের হদিস পাইনে। রাজনীতি করিনে, কোন দলে নেই। পড়ি এবং লিখি। যা সত্যি বলে মনে হয়, সেটাই লিখে প্রকাশ করি—কোন দাদার ধার ধারিনে যে যুক্তি-পরামর্শ করে রেখে-ঢেকে লিখতে হবে। এত সমস্ত ধুরন্ধর ব্যক্তি যাবার জন্য তদ্বির-তাগাদা করছেন, তাঁদের ভিড় ঠেলে এ অভাজনের নাম ওঠে কেমন করে?

যে বন্ধুরা এসেছিলেন, তাঁরা বললেন, আমরা যেতে পারছিনে—কিন্তু জানতে চাই সমস্ত কথা। যান আপনি—ফিরে এসে লিখবেন। সত্যি খবর-গুলো পাবো, এই আমাদের প্রত্যাশা রইল।

তথাস্তু। মনে মনে ভারি লোভ ছিল—যে তাজ্জব কথা শুনি, কার না লোভ হয় বলুন। এই এক বিচিত্র ব্যাপার দেখতে পাই—আমার জীবনে বাসনার জিনিসগুলো কেমন আপনা-আপনি জুটে যায়। কত যে পেলাম, তার অবধি নেই। ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে যাই।

১৮ই সেপ্টেম্বর রওনা হবার তারিখ। একেবারে দিনক্ষণ সাব্যস্ত করে দিল্লি থেকে ওঁরা প্যান-আমেরিকান প্লেনে জায়গা করে রেখেছেন। কিন্তু পাসপোর্ট-ভিসার ব্যাপার আছে—সরকারি ফাইলের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেয়ে বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে এর মধ্যে? ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি চলেছে আমাদের। টেলিফোনে আর্তনাদ করছি, কি মশায় পন্ড করে দেবেন নাকি?

থানায় গিয়ে বললাম, এনকোয়ারিটা তাড়াতাড়ি সমাধা করে দিন। খবর নিয়ে দেখুন, মনে এক মুখে আর নেই আমার। বই-টই পড়ার অভ্যাস এখনো যদি থাকে তো দেখবেন, কংগ্রেসের কথাও আছে অনেক বইয়ে—সেকালের সেই ত্যাগব্রতী সংগ্রামশীল কংগ্রেস।

খুব ভদ্রতা করলেন তাঁরা। ভরসা দিলেন, না না—আমাদের এখানে আটকা পড়ে থাকবে না। কালকের মধ্যেই সেরে দিচ্ছি। তার পরে কপাল আপনার।

দিল্লি থেকে টেলিগ্রাম এলো, ভারত-গবর্নমেন্ট পশ্চিমবঙ্গ-কর্তাদের পাস-পোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জাঁদরেল এক সরকারি

অফিসার—আমার পরম স্নেহভাজন তিনি—পাসপোর্ট হাতে নিয়ে এসে হাজির। আর তরুণ বন্ধুরা তদ্বির করছিলেন—তাঁরাও ফোন করলেন, পেয়ে গেছেন পাসপোর্ট ? এক্ষুণি তৈরি হন।

কিন্তু ওঠ বললেই বোঁচকা-কাঁধে বেরুব—অতখানি মুক্ত পুরুষ নই আমি। সবুর করো, দুটো-একটা দিন ফাঁক দাও। আঠারোই অন্য কাউকে পাঠিয়ে দাও আমার জায়গায়।

তাই হল। ২১শে যাবার পাকাপাকি ব্যবস্থা—মাঝে তিনটে দিন। একুশে রাত্রিবেলা প্লেন ছাড়বে, টমাস কুক থেকে বলে দিল। এ নিয়েও বিভ্রাট হতে যাচ্ছিল। হেলথ সার্টিফিকেট ও ভিসা ইত্যাদির জন্য অশেষ হাঙ্গামা ও টানাপোড়েন চলল শনিবার (২০শে) সমস্তটা দিন ধরে। কি ভাগ্যে ঐ পথে একবার প্যান-আমেরিকান এয়ার-অফিসে গেলাম। জানা গেল, প্লেন ছাড়ছে সেই দিনই। রাত্রি সাড়ে-বারোটা, অতএব বিধান মতে তারিখটা একুশে হয়ে যাচ্ছে।

রাত্রি দশটায় চৌরঙ্গি এয়ার-অফিসে হাজির হওয়া গেল। পাসপোর্ট দেখে-শুনে সাহেব ফিরিয়ে দিল।

আপনার যাওয়া হবে না।

অপরাধ ?

হংকঙে নামবেন, তার ছাড়পত্র কই ? এ তো দেখছি চীন ও দশটা আজে-বাজে দেশের নাম লিখে দিয়েছে। হংকং না হয়ে যাবেন কি করে ?

কিন্তু অতগুলো টাকা গুণে নিয়ে টিকিট দিয়ে দিল—তারা একবার দেখল না ?

টমাস কুক ভুল করতে পারে, আমরা পারিনে। পরশু সোমবারের দিন চেষ্টা করবেন—কিছু বাদ-সাদ দিয়ে ভাড়ার টাকা হয়তো ফেরত দিয়ে দেবে।

সাহেব মুখ ঘুরিয়ে পরের জনকে নিয়ে পড়ল।

আকাশ-পথে ঢের ঢের ঘুরেছি, কিন্তু এমন মুশকিলে তো পড়িনি। লটবহর কাঁধে করে কোন লজ্জায় বাড়ি ফিরি এখন ?

সাহেব !

দুঃখিত। আমাদের কিছু করবার নেই। হংকং লিখিয়ে নিয়ে আসুন, তার পরে কথা শুনব।

নিশিরাত্রে পাসপোর্ট-সংশোধনের জন্য কে জেগে রয়েছে কোনখানে ? ব্যাপারটা হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল।

'কমনওয়েলথ কান্ট্রিস' বলে এই যে রয়েছে—হংকং নিশ্চয় এরই মধ্যে পড়ে যাবে।

সাহেব সচকিত হয়ে ঘাড় ফেরাল।

আছে নাকি? কোথায়?

ঐ কথা ক'টা রবার-স্ট্যাম্পে ছাপা ছিল, বাকি সমস্ত হাতের লেখায়। কি না কি ছাপা আছে—পড়ে দেখেনি সেটা।

ঠিকই আছে তবে। বড় দুঃখিত।

তবে যে সাহেব ভুল হয় না তোমার?

সাহেব যেন শুনতেই পেল না আমার কথা। মাল ওজন করতে বলল লোককে। আমার অনেক বই নিয়ে যাচ্ছি পিকিন য়্যুনিভার্সিটিতে দেবো বলে। একটা প্যাকেট দেবব্রত শাস্ত্রীর কাছে গছিয়ে দিলাম—তা সত্ত্বেও ওজন কিছু বেশি হচ্ছে। কিন্তু সাহেব দৃকপাত করল না, আমার দিকে তাকালই না আর মুখ তুলে।

বাস এগারোটায় ওখান থেকে এরোড্রোমে রওনা হবে—হা হতোঽস্মি! প্লেনের নাকি খবর নেই। বারোটা বাজল, একটা বাজল—বসেই আছি, ঝিমুচ্ছি বসে বসে।

চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে অহরহ পরিভ্রমণ করে। আরও কিছু নতুন উপ-গ্রহ জুটেছে—তার মধ্যে পি. এ. এ., বি. ও. এ. সি. ইত্যাদি কোম্পানির প্লেন-গুলি। চাঁদের মতো এদের গতিও সুনির্দিষ্ট—কোন কক্ষপথে কোথায় কখন উদয় হবে, টাইম-টেবলে ঘণ্টা মিনিট ধরে ছাপা আছে। কি গোলযোগ ঘটেছে আজকে, প্লেন এসে পেঁছচ্ছে না। নাঃ, ঈশ্বরের ব্যবস্থা অনেক ভালো মানুষের চেয়ে—চাঁদের টাইম-টেবলে কখনো তো গোলমাল দেখিনে!

রাত প্রায় দুটো। ফোন বেজে উঠল। উঠুন—উঠে পড়ুন বাসে। খবর হয়েছে।

ঘনান্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। প্রবল ধারায় জল নামল এইবার। বন্ধ দরজা-জানলা কলকাতা শহরের রাস্তায় অসহায় আলোগুলো জলে ভিজতে লাগল। ঝড়-জল মাথায় করে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাস ছুটেছে।

ঘুমন্ত নগর-সীমান্তে সদাজাগ্রত দমদম। আকাশে উজ্জ্বল সতর্ক আলোর চোখ মেলে আহ্বান করছে আকাশচারী আগন্তুকদের। আসছে যাচ্ছে সমুদ্র-পর্বত দেশ-দেশান্তর পার হয়ে—দিন-রাত্রির মধ্যে তার আর বিরাম নেই। পৃথিবীটা এখানে অতি সঙ্কীর্ণ—আমেরিকা আর ইংলন্ড নিতান্তই এপাড়া-

ওপাড়া। দেয়ালে নানা দেশের পোস্টার হাতছানি দিয়ে ডাকে। লাউড-স্পীকার যখন তখন হাঁক দিচ্ছে, কায়রোর যাত্রীরা উঠুন এবার......চলে আসুন সিংগাপুর......

দীর্ঘকায় শীর্ণদেহ এক বৃদ্ধ এলেন—কণ্ঠে মালার বোঝা, পিছনে অগণ্য লোক। ইনিও যাবেন আমাদের সংগে? খালি পা, গান্ধিটুপি মাথায়—তুষার-শুভ্র খদ্দরের ধুতি-কোর্তা পরনে। পিকিনের বিষম শীত—এই সজ্জায় সেখানে টিকবেন ইনি কেমন করে?

এঁর সংগে চলেছেন গুজরাটের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক উমাশঙ্কর যোশি এবং অধ্যাপক যশোবন্ত প্রাণশঙ্কর শুকলা (গুজরাট বিদ্যাসভা)। পরে একদিন তাঁদের কাছে সবিস্তারে শুনেছিলাম সত্তর বছরের এই বুড়ো মানুষটির কথা। রবিশঙ্কর ব্যাস—গুজরাটের আবালবৃদ্ধ সকলের কাছে মহারাজ নামে খ্যাত। গান্ধিজি তাঁকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করতেন—তিনিও গান্ধিজির পরম অনুরাগী। জন-উন্নয়ন বিশেষ করে হরিজন সম্পর্কীয় কাজে নিবেদিতপ্রাণ। বল্লভভাই প্যাটেলের নামে ইস্কুল করেছেন।

মহারাজ শান্তি-সম্মেলনে যাচ্ছেন। পথের মধ্যেও লোকে কথা শুনতে চেয়েছে, তাই স্টেশনে স্টেশনে বক্তৃতা করে এসেছেন—কেন অতদূর পিকিনের শান্তি-সম্মেলনে যাচ্ছেন এই বয়সে। নিখিল পৃথিবীতে কখনো আর সংগ্রাম হবে না—এই চেষ্টা হোক আজ সকল দেশে সর্ব মানুষের। গান্ধিজিরও এই বাণী। কলকাতা শহরেও গোটা দশেক সভায় বলতে হয়েছে মহারাজকে। সেকালের রাজা-মহারাজেরই সম্মান পাচ্ছেন, দেখতে পেলাম। কাস্টমসের আড়গড়ার মধ্যে ঢুকেছেন, তখনো মালা দিচ্ছে ওদিক থেকে।

রাত্রির অন্ধকারে অবিরল বৃষ্টিজলের মধ্যে প্লেন সগর্জনে আকাশে উড়ল। অতিকায় ক্লিপার বিমান,—মেঘ ভেদ করে উঁচুতে, অনেক উঁচুতে চাঁদ-তারার এলাকায় ঢুঁ মেরে এরা ওড়ে। সাধারণ আর দশটা প্লেনের মতো মানুষের দৃষ্টি-সীমানার মধ্যে উড়ে বেড়ানো অপমানজনক এই জাতীয় প্লেনের কাছে। ঝড়-জল দেখলে সেই স্তর ছাড়িয়ে আরও উপরে গিয়ে ওঠে, সেখানে গোলমাল বুঝলে নেমে এলো হয়তো বা খানিকটা। আপদ-বিপদের সংগে লুকোচুরি খেলে জঠর-অভ্যন্তরের মানুষ ও মালপত্র নিয়ে মহাব্যোমে দিনরাত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।

তারা দেখা যায় কাচ দিয়ে—তারারা মিটিমিটি তাকিয়ে দেখছে। চোখ বুঁজে এল। হোস্টেস এসে চেয়ার নামিয়ে গায়ের উপর কম্বল ঢাকা দিয়ে

গেল। চোখে না লাগে সেজন্য পাশের আলো নেবানো। মাঝখানের কয়েকটা আলো ক্ষীণ ভাবে জ্বলছে শুধু। ধরণীর অনেক ঊর্ধ্বে কত জনপদ অরণ্য পর্বত লঙ্ঘন করে রাত্রির শেষযামে গর্জন করতে করতে প্লেন ছুটেছে।

ঘুম ভাঙল এক সময়। অলস চক্ষু মেলে পাশের কাচ দিয়ে তাকালাম। তখন উপলব্ধি হল, ঘরবাড়ি নয়—আকাশের উপরে শুয়ে শুয়ে চলেছি। খাড়া হয়ে বসলাম, চেয়ারটা দিলাম খাড়া করে। জানলা দিয়ে ভালো করে তাকাচ্ছি। ফর্শা হয়ে গেছে—সোনার রোদে ঝলমল করছে আকাশ। হাত-ঘড়িতে ছ'টা।

উঃ, কত উঁচুতে এখন! মেঘপুঞ্জের উপর দিয়ে উড়ছি। ঘুমুচ্ছে পরম শান্ত মেঘদল আরাম করে রোদে পিঠ দিয়ে। ছোট্ট খাতাখানায় লিখে রাখছি। তুলি দিয়ে এঁকে রাখবার মতো ছবিটা। সে হয়তো হোসেন সাহেব (বম্বের শিল্পী মকবুল হোসেন) করছেন, আমার শক্তি নেই।

প্লেন নিচুতে নামছে। ভুবনের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত ছুটছিলাম এতক্ষণ—ক্রমশ নদী আর খালের রেখা প্রকট হতে লাগল। হাল্কা ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ—যেন পেঁজা-তুলো বিছিয়ে দিয়েছে আকাশ জুড়ে।

ব্যাঙককে নামছি এবার। মাটি আরও স্পষ্ট হচ্ছে। সুদীর্ঘ সরলরেখার মতো সংখ্যাতীত খাল—দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি বিসারিত। কয়েকটি মাত্র আঁকাবাঁকা—সেইগুলো স্বাভাবিক নদী, মাটি কেটে বানানো নয়। পুরোপুরি জ্যামিতির দেশ। চতুর্ভুজ ত্রিভুজ—সমস্ত ভূমিতল যেন টানা-টানা রেখায় ভাগ করা। আমাদের গ্রাম্য ইস্কুলে কাঁদনমাস্টার মশায় ব্লাকবোর্ডের উপর দাগ কেটে জ্যামিতি শেখাতেন। উপর থেকে সারা দেশটা তেমনি ছক-কাটা দেখায়।

অনেকেই জানলায় ঝুঁকে থাইল্যান্ড দেখছেন। 'শ্যাম' নামে জেনে এসেছি এ দেশকে এতকাল—চারিদিকে সুশ্যামল রূপ—ঐ নামই আপনি মুখে এসে যায়। অজস্র ধানক্ষেত—শেষ নেই, সীমা নেই। মাঝে মাঝে ঝুপসি গাছপালা—সুশোভন, শ্রেণীবদ্ধ। কাত হয়েছে প্লেন—কোমরে বেল্ট-বাঁধা, পড়ে যাবার ভয় নেই। নদী-নালা পথ-ঘাট ঘর-উঠোন—সমস্ত পৃথিবীটাই যেন কাত হয়ে পড়েছে এক দিকে। আরও নিচুতে নামছে প্লেন—খেলাঘরের মতো অগণিত ঘর-বাড়ি। না, আর লেখা চলবে না—ভূমিলগ্ন হল এবার......

দেখ কাণ্ড! ব্যাঙকক-এরোড্রোমের ঘড়িতে সাড়ে-আটটা বেজে রয়েছে। ঘড়িতে দম দেওয়া আমারও অভ্যাস নয়, প্রায়ই বন্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু সে হল একলা একটি মানুষের ব্যাপার। এত লোকের আসা-যাওয়া এখানে—ছি-ছি, এইটুকু হুঁশ-জ্ঞান নেই! আমাকে হার মানিয়ে দিয়েছে এরা!

না হে, ঠিকই আছে। সূর্যের পথ বেয়ে পূবের দিকে উজান চলেছি আমরা। আমার ভারতে সাতটা এখন—এ রাজ্যে সাতটা বাজিয়ে দিয়ে সূর্য পশ্চিমে ছুটেছে দেড় ঘণ্টা আগে। চলেছি আমরা যে সব ঘণ্টা-মুহূর্ত অতীত হয়ে গেছে সেই অঞ্চলে। এমনি করে যদি যেতে থাকি! যেতে যেতে—ক্রমাগত গিয়ে পৌঁছব কি জীবনের অতীত দিনগুলোয়—কৈশোর ও বাল্যের পরম বিস্মৃতির মধ্যে যে মণি-মাণিক্যগুলো ফেলে এসেছি বহুবর্ষ আগে?

আজ সকালে অনেক মজুর কাজ করছে, খোঁড়াখুঁড়ি চলছে চতুর্দিকে। ভাল রাস্তা হবে, নতুন আরও ঘর উঠবে—তারই আয়োজন। আমার গ্রামের বিলে রৌদ্র-বৃষ্টির মধ্যে চাষীরা যেমন টোকা মাথায় কাজ করে, এখানকার মজুরদের মাথায় অবিকল সেই বস্তু। ব্যাঙককে নেমে ফোটো তুলবেন না কেউ খবরদার—প্লেনের ভিতর থেকেই বলে দিয়েছে। সত্যিই তো—কার কি মতলব, বলা যায় না। আর আমরা হলাম এক নম্বর দাগি আসামি—নতুন-চীনে চলেছি, কম্যুনিস্টরা সেখানকার কর্তা। বললে কি হবে যে আমি লেখকমাত্র—রাজনীতিক নই। গল্প-উপন্যাসে ভেবে-চিন্তে মিথ্যে কথা লেখার অভ্যাস আছে বটে, কিন্তু বেপরোয়া মিথ্যা বলতে বুক কাঁপে। তাই রাজনীতি ধাতে সইল না; রাজ্যপাট জুটল না, কলম পিশে খেতে হচ্ছে।

দেয়াল ঠেশ দিয়ে দিগ্‌ব্যাপ্ত মাঠের দিকে তাকিয়ে আছি, আর লিখছি একটু-আধটু। টিনের ঘর দূরে দূরে। এত গরম যে ঘাম ফুটেছে গায়ে। প্লেনের ভিতরে নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়া—সেখানে কষ্ট হয় না।

ছবি মনে আসছে, নেতাজি যেদিন নামলেন এখানে। হাজার হাজার মানুষ ভিড় করে এসেছিল বাইরের ঐ জায়গায়। আমরা ঘুণাক্ষরে জানতে পারিনি যে অনতিদূরে এত উৎসব-সমারোহ; আমাদের মুক্তির জন্য দেশি ফৌজ দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলটা জুড়ে কুচ-কাওয়াজ করে বেড়াচ্ছে। চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে এই বিমুক্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে গৌরবময় সেই অতীত ছবিটা মনে আনবার চেষ্টা করি।

কটমট করে তাকাচ্ছে এরোড্রোমের এক অফিসার। পেন্সিলে যৎসামান্য দাগ বুলাচ্ছি—সেই জন্যেই নাকি? না-ও হতে পারে, মনের মিথ্যা সন্দেহ

হয় তো! থাক গে, কাজ নেই এখন আর লিখে। এই রৌদ্রালোকিত দ্বীপময় মহা-ভারতের ছবি মনের পরতে আঁকা হয়ে রইল—আর কি প্রয়োজন?

বিশ্রামাদির পর প্লেনের খোপে ঢুকে পড়েছি আবার। নতুন যাত্রীও উঠল এখান থেকে, কয়েকটি মেয়ে-পুরুষ বিদায় দিতে এসেছে। রুমাল নাড়ছে তারা বেড়ার ওধারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। একটা মেয়ে বড় সুন্দরী—বারম্বার চোখে রুমাল দিচ্ছে, কান্নায়-ভেজা করুণ চোখের দৃষ্টি। আমরাও সেই অভিনন্দন গ্রহণ করলাম নিজেদের মনে করে, কাচের এধারে তাদের উদ্দেশে রুমাল নাড়ছে আমাদের কেউ কেউ। প্লেন আবার আকাশে উঠে গেল।

অনেক বেলা—কিন্তু হাত-ঘড়িতে মাত্র সাতটা-পঞ্চাশ। ঘড়ি মেলাবো না এখন। আরও দূরে যাচ্ছি—হংকঙে সাড়ে-তিন ঘণ্টার তফাৎ ভারতের সঙ্গে। সেইখানে একেবারে কাঁটা ঘুরাবো।

সিটের লাগোয়া একটুখানি টেবিল তৈরি করে নেবার ব্যবস্থা আছে। তার উপরে খাতা রেখে লিখে যাচ্ছি। পাশে পট্টনায়ক উড়িষ্যার লোক—তিনিও লেখক। ওধারে মবলঙ্কর—তাঁর ব্যাগের উপর 'পার্লামেন্টের মাননীয় স্পিকার' পরিচয় দেখে চমকে গিয়েছিলাম। পরে টের পেলাম, স্পিকারের ছেলে তিনি—বাপের ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। মবলঙ্কর বারম্বার তাকাচ্ছেন আমার দিকে। অর্থাৎ, আকাশে উঠেও লেখা ছাড়ে না—কেমনতরো কলমবাজ হে? তাই বটে! দীনেশ সেন মশায়কে শ্মশানে নিয়ে দেখা গিয়েছিল, তর্জনী ও বুড়ো-আঙুলে কালির দাগ। দুটো দিন আগেও তিনি লিখেছিলেন। তাঁর নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের তুলনা করতে চাইনে। মবলঙ্করকে বললাম, সাদা কাগজে বিস্তর কালি মাখিয়েছি—মরবার কালেও কিছু তার কলঙ্কচিহ্ন নিয়ে যাবো, এইমাত্র কামনা।

মেঘ ভেদ করে ছুটেছি। বেলা দশটা তখন আমার ঘড়িতে। কত জনপদ কত পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে সমুদ্রের উপর এলাম। সুনীল প্রশান্ত মহাসাগর—এতটুকু বীচি-বিক্ষোভ নেই। অন্তত উপর থেকে দেখতে পাচ্ছিনে। পরে একদিন পিকিন-হোটেলে খেতে খেতে আমাদের সহযাত্রী এক মহিলা এই সময়কার কথা বলেছিলেন, মা গো! সমুদ্রের উপর দিয়ে যখন প্লেন যাচ্ছে, আমি তো ভয়ে কাঁটা! এখানে যদি পড়ে যায়, তবে আর ফিরে যেতে হবে না। আমি জবাব দিয়েছিলাম, তা ঠিক! ডাঙায় যদি প্লেন ভেঙে পড়ে, বেরিয়ে এসে কোন এক বাড়ি অতিথি হওয়া যেতো—কি বলেন?

ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেল। মহাব্যোমে ভাসতে ভাসতে আরাম করে গরম পরিচ খাচ্ছি। ভারি একটা অদ্ভুত কথা মনে আসে—কি মজা, ক্ষুধায় বিবর্ণ বিক্ষুব্ধ ধরিত্রী হাত বাড়িয়ে নাগাল পাবে না আমাদের। কিম্বা বাজপাখীর মতো পৃথিবী থেকে আরাম-আনন্দ ছোঁ মেরে নিয়ে নানান দেশের কয়েকটি বিচিত্র মানুষ শূন্যলোকে সংসার রচনা করেছি। অদূরে একজোড়া মোটা সাহেব-মেম। মেমটিকে প্রথম দর্শনে লাবণ্য ও যৌবন-মতী মনে হয়েছিল। তখন বেলা আটটা। এখন সাড়ে-দশটায় কপালে বলিচিহ্ন প্রকট হয়েছে, রূপ-যৌবন ঝরে পড়ে গেছে। বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি একবার লাউঞ্জে গিয়ে ঘুরে এলো। একেবারে প্রস্ফুটযৌবনা—আগের চেয়েও চমকদার। ওদের লাবণ্য ভ্যানিটি-ব্যাগে কৌটো ভরতি প্রচ্ছন্ন থাকে। সাহেব আর মেম দু-জনেই, দেখছি, বাঁ হাতে কাজকর্ম করে। রাজযোটক আর কি! রাঙানো নখ মেম সাহেবের—সে আবার উখো জাতীয় এক বস্তুতে সাহেবের নখ ঘসে ঘসে সাফ করে দিচ্ছে। আর কি কাজ এখন ওদের?

পাইলটের ঘর থেকে বার্তা এলো। প্লেন গতি বদলাবে এবার—চলছিল পূব-দক্ষিণে, এবার থেকে পূব-উত্তরে। নিচে তাকিয়ে দেখ, প্রবাল-দ্বীপপুঞ্জ। একটু নিচু দিয়েই চলেছে, যাতে সকলে দেখতে পায়। ঝুঁকে পড়েছি সকলে জানলা দিয়ে। সমুদ্র-জলের উপর বুঝি অজস্র মুক্তা ছড়িয়ে রেখেছে, রৌদ্রালোকে ঝিকমিক করছে। ঠিক নামই দিয়েছে—মুক্তা-দ্বীপপুঞ্জ।

চীন আর ভারত নিতান্ত পাড়াপড়শি। এবাড়ি-ওবাড়ির মাঝখানে একটুখানি পাঁচিল—হিমালয় পর্বত। প্রাচীনেরা সমুদ্র দিয়ে যেতেন, আবার ঐ পাঁচিল গলেও যাতায়াত করতেন। বৌদ্ধ শ্রমণরা এবং হুয়েন সাং, ফা-হিয়ান প্রভৃতির নখদর্পণে ছিল ঐ সোজা পথ। পশ্চিমি অক্টোপাসরা তার পর ভারত, চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া শত পাকে বেঁধে ফেলল—সোজা পথ একেবারে অগম্য হয়ে উঠল তখন থেকে। আর বন্ধ হল চিরকালের সহজ মেলা-মেশা। পাছে এরা সব একজোট হয়ে যায়, এই ভয়ে হয়তো। যুদ্ধের সময়টা সংক্ষিপ্ত পথ বেরিয়েছিল, আকাশ-পথে প্রায় ছ-ঘণ্টায় কলকাতা থেকে চীন পৌঁছানো যেত। রাস্তাও তৈরি হয়েছিল আসাম ও বর্মা হয়ে চীন অবধি। সে সব বাতিল; এখন বৃটিশ-এলাকা হংকং ঘুরে চীন যেতে হয়। যাওয়া উচিত সোজাসুজি উত্তরমুখো—কিন্তু আমরা যাই দক্ষিণ-পূবে, তার পর উত্তর-পূবে, এবং হংকং পৌঁছে পশ্চিমমুখো সেখান থেকে। অর্থাৎ নাক দেখানো হচ্ছে কান ও মাথাটা বেড় দিয়ে।

হংকঙের কাছাকাছি একটু বিপদ। চারিদিক ঘনান্ধকার—দিন-দুপুরে অকস্মাৎ দুপুর-রাত্রি নেমেছে। প্লেন উঠছে, নামছে। ঝড়-বাদলের সঙ্গে লড়াই চলছে, ভিতর থেকে বুঝতে পারছি। গোত্তা মারছে ঝড়ের উপর, ঘূর্ণি-গর্তের মধ্যে পড়ে হু হু করে নেমে যাচ্ছে এক-একবার। যাত্রীদের মুখ শুকনো। নামতে নামতে মাটিতে পড়ে যাবে নাকি এমনি ভাবে? মাটিই বা কোথায়, সমুদ্র-জল। অনেক নিচুতে নেমে এসেছে এবার। সমুদ্রের প্রান্তসীমা দেখা দিয়েছে। পাহাড়—ধাপে ধাপে অগণ্য ঘর-বাড়ি, আকাশ-ছোঁওয়া বড় বড় প্রাসাদ। সমুদ্রের খাড়িতে সংখ্যাতীত নৌকো-জাহাজ, এপারে-ওপারে বিচিত্র জনপদ। হংকঙে এসে গেছে তবে! ঐ তো বিমানঘাঁটি। মানুষজন সুস্পষ্ট দেখছি, চলাফেরা করছে। শহরের উপরে চক্রাকারে ঘুরছি আমরা। মৃত্যুর পর নিরালম্ব প্রেতদলের মতো। প্লেন আবার উঁচুতে উঠে দূরে চলে গেল। আধ ঘণ্টারও বেশি এমনি লক্ষ্যহীন ঘুরে ঘুরে ফাঁক বুঝে এক সময় নেমে পড়ল।

ঠিক হংকং নয়, হংকঙের উল্টো পারে—কাই-তেক বিমানঘাঁটি। ঘড়িতে একটা। সাড়ে-তিন ঘণ্টা এগিয়ে সাড়ে-চার করে দিলাম।

কাস্টমসের আড়গড়া পার হয়ে বেরুচ্ছি—

আসুন। ভারত থেকে আসছেন আপনারা? ক'জন আজকে? উঠে পড়ুন ঐ বাসে। প্যান-আমেরিকান এয়ার-টারমিন্যাল নিয়ে যাবে। আমরা থাকব সেখানে। পথে অসুবিধা হয়নি তো? আচ্ছা—হোটেলে গিয়ে কথা-বার্তা হবে।

কয়েকটি চীনা যুবক। ইংরেজি ভাষায় তাঁরা আপ্যায়ন করলেন। সিংহুয়া সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের লোক—হংকঙে অভ্যর্থনার ভার এঁদের উপর।

(২)

ছোট্ট দ্বীপ হংকং। দ্বীপের আসল নাম ভিক্টোরিয়া। চীনের মূল-ভূখণ্ড আর দ্বীপের মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্য। মাইল দুয়েক হবে বড় জোর। এপারের জায়গাটার আসল নাম কৌলুন। এখানেই আছি আমরা—কৌলুন হোটেলে।

এই কৌলুন—এবং চীনের মূল-ভূমির আরও মাইল ত্রিশেক বৃটিশের দখলে। অবাধ-বন্দর হংকং—আমদানি জিনিসপত্রে ট্যাক্স লাগে না, তাই

অকল্পিত রূপ সস্তা। কিন্তু নতুন কারো পক্ষে সুবিধা নেওয়া শক্ত। দোকানদারদের চক্ষুলজ্জার বালাই নেই—ডবল কি তারও বেশি দর তো হেঁকে বসল, তার পর কত কমাবে কমাও। এক নজর দেখেই তারা খদ্দেরের ধরন বুঝতে পারে। গায়ক ক্ষিতীশ বসু ছিলেন আমাদের দলে—তিনি এক ঘড়ি কিনলেন। ঘড়ির গায়ে দর সাঁটা আছে পয়ষট্টি ডলার—সম্ভ্রান্ত দোকান, সিকি পয়সাও নাকি ওর থেকে কম হবার জো নেই। সেই ঘড়ি শেষ অবধি রফা-নিষ্পত্তি হল একত্রিশ ডলারে। সকলেই জিনিসপত্র কিনেছি দরাদরি করে—তবু শেষ পর্যন্ত খুঁতখুঁতানি থেকে যায়, আরও হয়তো কমে পাওয়া যেত।

এই আন্তর্জাতিক বন্দরে হাজার রকম মানুষের আনাগোনা। যেখানে সেখানে বিজ্ঞপ্তি ঝুলছে—পকেটমার সাবধান! খেয়া-স্টিমারে পার হব, ভাড়া কত জিজ্ঞাসা করছি—কাউন্টারের ভদ্রলোক বললেন, ব্যাগ সামাল করুন আগে। কৌলুন হোটেলের ম্যানেজার দম্ভোক্তি করলেন, মনিব্যাগটা অমনি আলতো ভাবে রেখে খানিকক্ষণ ঘুরে আসুন তো রাস্তায়—তার পরেও ব্যাগ যদি আপনার থাকে, তবে বলব বিষম বাহাদুর।

শুধু কি ওঁরাই, দেশ-বিদেশের যত বেপরোয়া আর স্ফূর্তিবাজেরা এসে জোটে। আগে সাংহাইও ছিল এমনি—নতুন-চীন ঝেঁটিয়ে পরিচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাই ময়লা আরো বেশি জমেছে এখানে। ভাল লোক যে নেই, তা বলিনে; কিন্তু পাপচক্ষে অধিক দেখতে পেলাম না। হৈ-হুল্লোড় চলছে অহোরাত্রি। মদ ভারি সস্তা এবং মালেও অতি চমৎকার—এমনটি নাকি ত্রিভুবনে আর নেই। আমি নিতান্তই 'ও-রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস'—তাই হলপ করে কিছু বলতে পারব না। তবে রসিক জনের স্বমুখে শ্রবণ করেছি। আর পণ্য-মেয়েদের ভিড়ে দিনমানেই পথে চলা দায়। এটা স্বচক্ষে দেখা।

যাবার সময় একটা রাত্রি মাত্র, কিন্তু ফিরতি মুখে পাঁচ-পাঁচটা দিন এখানে কাটাতে হয়েছিল কলকাতার প্লেন না পাওয়ায়। সেই সময় আসল মূর্তি দেখেছি। পালাই-পালাই ডাক ছেড়েছিলাম। অথচ চীনভূমিতে দিন চল্লিশেক কাটিয়ে এসেছি—বলুক না ওরা, আরও গিয়ে থাকতে রাজি আছি।

হংকঙের ব্যাপার আগে ভাগে তাড়াতাড়ি সেরে নিচ্ছি। চীনের প্রোজ্জ্বল কাহিনী শেষ করে তখন এসব বলবার আর রুচি হবে না। আমেরিকান ডলার ভাঙিয়ে হাতে বিস্তর টাকা। সমস্ত নিঃশেষে খরচ করতে হবে, এ, মহৎ সঙ্কল্প নিয়ে পথে বেরিয়েছি। আমি, ক্ষিতীশ, শিল্পপতি বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী নীলিমা দেবী এবং মাদ্রাজের সিনেমা-ডিরেক্টর কৃষ্ণ-

স্বামী। ঘোরাঘুরিই সার, কিছুই কেনা যাচ্ছে না—দর শুনে আঁৎকে উঠতে হয়।

বৈদ্যনাথ এমনি সময় আঙুল দেখালেন, ভারতীয় পতাকা উড়ছে। নির্ঘাৎ সেখানে ভারতের মানুষ থাকে। সওদার ব্যাপারে তাঁরা সাহায্য করবেন।

তাই বটে! একটা ব্যাঙ্ক—ঢুকেই পারেখ মশায়ের সঙ্গে আলাপ হল। অত্যন্ত ভদ্র ও সদাশয়। হংকঙের পথে-ঘাটে সহযাত্রী হয়ে আমাদের প্রচুর সাহায্য করেছেন। একটি বাঙালিও আছেন—শ্রীযুক্ত মিত্র। কিন্তু কি কারণে জানিনে, তাঁকে তেমন কাছাকাছি পাওয়া গেল না।

রূপসী হংকং। স্টার কোম্পানির খেয়া-স্টিমার অবিরত এপার-ওপার করছে। প্রথম ও দ্বিতীয় দুটো ক্লাস—স্টিমার ঢুকবার পথও দুটো। প্রথম পথে ঠিক উপরে পৌঁছে যাবেন, দ্বিতীয় পথে নিচের তলায়। ঢুকবার পথে ভাড়াটা দিয়ে যান জানলার খোপে, তার পর জাহাজে চেপে বসুন। বসবার আরামপ্রদ ব্যবস্থা। কত লোক যে পারাপার হচ্ছে, তার সীমাসংখ্যা নেই। এ ছাড়া মোটর-লঞ্চ ও অন্যান্য খেয়ার ব্যবস্থা আছে এদিকে-সেদিকে। ইচ্ছে হলে মোটর-লঞ্চ নিয়ে বেরোন প্রমোদ-ভ্রমণে—ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া ঠিক করা আছে। পাহাড়ের উত্তুঙ্গ চূড়ায় অসংখ্য অট্টালিকা। ট্রাম আছে সেই চূড়া অবধি পৌঁছবার—মোটরের পথও আছে। ট্রামে যাওয়াটা ভারি মজার। পারেখ সঙ্গী আছেন—তাঁর কথা মতো রাত্রিবেলা চলেছি। আলোকোজ্জ্বল এপার-ওপারের শহর ও সমুদ্র অপরূপ দেখাচ্ছে।

এই পিক-ট্রাম (Peak Tram) এক বিস্ময়কর শিল্পকীর্তি। জায়গায় জায়গায় রাস্তা একেবারে খাড়া উঠে গেছে—আমরা কাত হয়ে পড়েছি বেঞ্চিতে। পাতলা জামা গায়ে ছিল—পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে উপরে উঠে হি-হি করে শীতে কাঁপছি। কনকনে হাওয়া বইছে গিরি-চূড়ায়। কিছুক্ষণ ঘুরে-ফিরে দেখলাম। নেমে আবার উষ্ণলোকে এসে বাঁচি।

আর এক দ্রষ্টব্য স্থান টাইগার পার্ক। সেখানে বুদ্ধ-মন্দির আছে—টাইগার-প্যাগোডা নামে খ্যাত। প্রচুর বিভবশালী এক চীনা ব্যবসায়ীর কীর্তি, ভদ্রলোকের বাড়িও এই পার্কের মধ্যে। কাজ শেষ হয়নি, যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ চালাবেন এই তাঁর ইচ্ছা। প্রতি বৎসর নিয়মিত ভাবে কাজ চলছে। শুনলাম, সিঙাপুরে তাঁর বড় ব্যবসা—সেখানে অবিকল এই রকম আর একটা পার্ক তৈরি হয়েছে। বাঘ, ড্রাগন—এসব অতি-পবিত্র চীন অঞ্চলে; বাঘের নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছে সেই জন্যে। পাহাড়ের উপর পাথর কেটে কেটে তৈরি। দেব-দেবীর

মূর্তি—ওঁদের পৌরাণিক দেব-দেবীর সঙ্গে আমাদের দেবতাদের আশ্চর্য রকম মিল। দেয়ালে দেয়ালে অসংখ্য ছবি—আর বিস্তর সদুপদেশ। জুয়াখেলা, আফিং-চরস খাওয়া ও গণিকা-সঙ্গের দোষ দেখানো হয়েছে ছবির মধ্য দিয়ে। নতুন-চীনে এসব পথের পথিক কেউ নেই আজকাল, হংকং বলেই ছবি দেখানোর প্রয়োজন হয়েছে। পাপ করলে মৃত্যুর পর কি রকম সাংঘাতিক নরকভোগ করতে হয়, নানা বীভৎস মূর্তির মাধ্যমে তা-ও আছে। বাংলা দেশে পটুয়ারা পটের শেষ দিকে পাপের শাস্তি দেখায়—সেই ব্যাপার।

সওদা করতে গিয়ে এক চীনা দোকানদারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। পিকিন থেকে ফিরছি শুনে বলল, আচ্ছা বলো কি দেখে এলে—

পাঁচ-দশ মিনিটে বলবার বস্তু নয়। তবু বললাম দু-এক কথা। হংকং আর আসল চীনে কতটুকুই বা দূরত্ব! অথচ কিছুই মেলে না—আকাশ আর পাতালের পার্থক্য। তোমরা যেন চীনের মানুষ নও, এ আর একটা দেশ।

দোকানি বলল, বাছাই-করা কতকগুলো জিনিস তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছে, আসল কিছুই জানো না। লোকের ভারি কষ্ট, সব কিছু ওরা কেড়েকুড়ে নিচ্ছে।

গলায় আঙুল ঘুরিয়ে কাটবার ভঙ্গিতে বলল, টাকা-পয়সা থাকলেই সাবাড় করে দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে—

এসব নতুন নয়, দেশে থাকতেও এমন অনেক শুনেছি। উ-ইয়ুন-চু'র সঙ্গে একত্র বেড়ালাম, একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া। (সম্প্রতি মারা গিয়েছেন, কিছু দিন আগে যে চীনা সাংস্কৃতিক দল এসেছিলেন, তাঁদের কাছে শুনলাম। আহা, অতি মহাশয় লোক।) পাঁচটা ফ্যাক্টরির মালিক অথচ নতুন-চীনের বিশিষ্টদের এক জন তিনি—অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্য। এমন ধনী আরও অনেক আছেন। তবে বেপরোয়া মুনাফা লুঠবার উপায় নেই—এই যা। কিন্তু শুনছে কে? প্রোপাগান্ডার বিচিত্র মহিমা—অতি নিখুঁত তার কারুকর্ম। কান ও মন এমন বিষিয়ে দেয় যে এত কাছে থেকেও সত্যি খবর এরা শুনতে পায় না।

আবেগে একটা কথা না বলে পারিনে। ঐ যে মেয়েগুলো সেজেগুজে রং মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে—দিন নেই রাত্রি নেই, শীত নেই বর্ষা নেই, নানান দেশের বদমায়েসরা কয়েকটা ডলার ছুঁড়ে দিয়ে ছিনিমিনি খেলছে ওদের নিয়ে—ওরা তোমার নিজের জাত নয়, চোখের উপর দেখছ তবু অপমান গায়ে বেঁধে না তোমাদের?

লোকটা জবাব দিল না, হিসাবপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমার মুখের

দিকে আর তাকাবে না বুঝতে পারছি। কি-ই বা আছে জবাব দেবার!......

কোন জন্মে আমি কোট-প্যাণ্টলুন পরিনে, এবারে চীনের বন্ধুরা এক গরম স্যুট উপহার দিয়েছে। বাক্সবন্দি ছিল জিনিসটা। হংকঙে এসে দু-দিন পরে সেটা পরলাম। পিকিনের অত শীত ধুতি-পাঞ্জাবি-আলোয়ানে কাটিয়ে দিয়েছি, আর হংকঙের প্রায়-গরম আবহাওয়ায় ঐ ভারী উষ্ণ সজ্জা গায়ে চাপিয়ে সাহেব সাজবার প্রয়োজন হল।

বুদ্ধিটা ক্ষিতীশের। মাল ওজন করাতে গিয়েছিলাম এয়ার-অফিসে। চক্ষু কপালে উঠল। ত্রিশ কিলোগ্রাম বেখরচায় নিয়ে যেতে পারব। সেটা বাদ দিয়েও এত ওজন উঠেছে যে অতিরিক্ত শ' দুয়েক টাকা মালের ভাড়া দিতে হবে। অনেক জিনিস উপহার পেয়েছি, আর অনেক কিনেছি ও'দের উপহারের টাকায়। সাতটা বইয়ের প্যাকেট তবু ডাকযোগে পাঠিয়ে এসেছি পিকিন থেকে।

কমাও—যে উপায়ে যত পারো ওজন কমিয়ে ফেল। ক্ষিতীশ বলল, ধুতি পাঞ্জাবির কি-ই বা ওজন—ওই স্যুটে সজ্জিত হয়ে কাঁধে ওভারকোট চাপিয়ে প্লেনে উঠবেন, তাতে বিস্তর ওজন কমে যাবে।

চমৎকার যুক্তি। কিন্তু স্যুট পরা আগে-ভাগে একটু রপ্ত করে নেবার দরকার। নতুন-চীনের সার্বজনীন পোশাক এই রকম—কাটছাঁট অবিকল তাই। আমিই বলেছিলাম, দেবে তো দাও তোমাদেরই মতন। পোশাক পরে তোমাদের এই বিপুল উদ্দীপনার ছোঁয়াচ যদি লাগে মনে।

সাজসজ্জা সমাপন করে বেরুনো গেল। হোটেলের লোকজন কেমন-কেমন চোখে আমার দিকে তাকায়। রাস্তায় পড়েছি, সেখানেও তাই। ভালই তো, পোশাকের দৌলতেই না হয় হংকং শহরে একটু অসাধারণ হওয়া গেল!

ব্যাপার কিন্তু আরো কিঞ্চিৎ ঘোরালো। এয়ার-টার্মিনাসে প্লেনের খবরা-খবর নিতে গিয়েছি। জাতে ইংরেজ কি ইয়াঙ্কি জানিনে—হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, মাও-সে-তুঙের তুমি খুব বন্ধু বুঝি?

বিরক্ত হয়ে বললাম, নিশ্চয়। নতুন-চীন যে দেখবে, সেই তাঁর বন্ধু হয়ে যাবে।

সে কিছু বলল না আর, নিজের মনে কাজ করতে লাগল। এক চীনা কর্মচারী এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত দিল। আর এক জনকে কি বলছে আমার অবোধ্য ভাষায়। অবস্থাটা অপমানজনক মনে হল। কাঁধ থেকে সজোরে লোকটার হাত ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, কি বলতে চাও তুমি?

গটমট করে বেরিয়ে এলাম।

প্যাং টাক-সেং সিংহুয়া সাংবাদিক-দলের নেতৃস্থানীয়—হংকঙে ওদেরই তত্ত্বাবধানে আছি। তাকে ঘটনাটা বললাম। প্যাং গম্ভীর হল। বলে, ও-পোশাক খুলে রাখো—প্লেনে উঠবার সময় পোরো। তার আগে দরকার নেই। চারিদিকে কত শত্রু ঘুরছে, কত দেশের গুপ্তচর! বেশি প্রকট হয়ে কাজ নেই এ জায়গায়।

স্তব্ধ হয়ে রইল এক মুহূর্ত। তার পর ধীরে ধীরে বলে, হংকং আমাদের নয়। দেখ না, আমরাই কি রকম অতিথি-জনের মতো রয়েছি।

ভৌগোলিক হিসাবে এক বটে, হংকং তবু চীন নয়। আমাদের যেমন পণ্ডিচেরি বা গোয়া—উঁহু, এরও চেয়ে নিঃসম্পর্কিত। ১৯৫০ অব্দে বিরাট ষড়যন্ত্র হয়েছিল নতুন-চীনের নায়কদের মেরে ফেলবার জন্য। তার উদ্ভব, শুনতে পেলাম, এই জায়গাতেই। কোন মানুষ কি মতলবে ঘুরছে, কে বলবে? কোরিয়ার লড়াইয়ে চীনের ভল্যান্টিয়ারদের উপর বোমা মেরে সৈন্যরা এইখানে হাত-পা মেলে বিশ্রাম নেয়। তার জন্য আরামপ্রদ ঘরবাড়ি ও নানাবিধ ব্যবস্থা রয়েছে। কত মতবাদের খবরের কাগজ, খবরের জোগানদারই বা কত বিচিত্র ধরনের! হংকঙেরই এক কাগজে বেরিয়েছিল, পিকিনের শান্তি-সম্মেলনটা কম্যুনিস্টদের একটা হৈ-চৈ মাত্র—মলোটভ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। খবর তৈরি করতে জানে বটে! চিরজন্ম তো গল্প-উপন্যাস লিখে গেলাম—কিন্তু লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করি, এতদূর কল্পনার দৌড় আমাদের নেই।

হংকং চীন নয়—নতুন-চীনে পা ছোঁয়াবার আগেই টের পেয়েছিলাম। হোটেলে সেই একটা রাত কাটিয়ে গিয়েছিলাম—তখনই। ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল, পট্টনায়ক পাশের শয্যায় বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছেন। চারতলার বারাণ্ডার অনেক নীচে পিচ-ঢালা ঝকঝকে রাস্তা। সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম অনেকক্ষণ। ওপারে পাহাড়ের উপরে লাল নীল সাদা আলোর বিচিত্র মালা পরে হংকং শহর রূপের বিভায় বিত্ত আর আনন্দ-পিয়াসী দূর-দূরান্তরের মানুষজনকে হাতছানি দিয়ে প্রলুব্ধ করছে।

মোটরের সুতীব্র হেডলাইট জ্বলে উঠল হঠাৎ। সেই আলোয় দেখলাম, বৃষ্টিস্নাত রাস্তার উপর সৈন্যেরা আর মেয়ে কতকগুলো। আর রিকশা ছুটোছুটি করছে শিকার ধরবার আশায়। রিকশাওয়ালারা জাতে চীনা, কালো হাফপ্যান্ট-পরা—আলোয় ঝকমক করছে তাদের ফরসা গায়ের রং। অন্তরাত্মা অবধি কেঁপে ওঠে। নিশিরাত্রে মনে হল, শহর নয়, ভয়াল অরণ্য—ডোরা-কাটা বাঘের দল রক্ত-ক্ষুধায় ক্ষেপে উঠেছে। দরিদ্র সর্বরিক্ত হতভাগ্য মেয়েরা, আর

লালসাদুর্বল কাপুরুষ যুবার দল। অবিরল বৃষ্টিধারার মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল নর-নারীর উৎকট হাস্যধ্বনিতে আকাশব্যাপ্ত হাহাকার উঠছে যেন। প্রশান্ত মহাসমুদ্র-তীরে আলো-ঝলমল রূপসী হংকং নগরীর নিঃসহায় নিশীথ-ক্রন্দন!

(৩)

সমুদ্রের খাড়ি। পারঘাটার এ-ধারে রেলস্টেশন। জলের একেবারে উপরে স্টেশনটা। সকাল ৭-২০ মিনিটে ট্রেন ছাড়ল।

খাড়ির কিনারা ধরে গাড়ি চলেছে। ডানদিকে জল, বাঁদিকে শহর। শহর শেষ হয়ে বস্তি অঞ্চল। জনালয় ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে। দুই পাহাড়ের মাঝখানে এসে পড়েছি। পাহাড়, পাহাড়—দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে আছে রক্তাভ পাহাড়ের সারি। সহসা অবারিত হয়ে গেল ডানহাতের দিকটা। বিস্তীর্ণ জলরাশি—জলের উপর নৌকো-স্টিমার। কি গাঢ় নীল জল! সীমাহীন প্রশান্ত মহাসাগর হাত বাড়িয়ে মহাচীনের এক মুঠো মাটি আঁকড়ে ধরেছে। তারই নাম হংকং।

নাদুসনুদুস কার্তিক ঠাকুরটি—আজ্ঞে না, খাঁটি নাম কিছুতে বলছি নে। বাপ-মা ঠাহর পান নি, ভাবীকালে ছেলের চেহারা এমন খুলবে। তাই অন্য একটা নাম রেখেছিলেন। কার্তিকই ভদ্রলোকের নাম হওয়া উচিত।

এদিককার বেঞ্চি থেকে কার্তিক ঘাড় লম্বা করে ঝুঁকে পড়ল।

কি লিখছেন?

খরচগুলো টুকে রাখছি—

খরচ আবার কি? হেঁ-হেঁ, ও বললে কি শুনি? আমি তবু ট্রাউসার কিনলাম আঠারো ডলারে। আপনি কৃপণের যাসু, খরচ করবার ভয়ে বেরুলেন না মোটে। দেখেছেন আমার ট্রাউসার?

আমি একা নই এবং শুধুমাত্র ভারতীয়েরা নয়। কার্তিকের ট্রাউসার অনেক জনকে দেখতে হয়েছে। এবং শুনতে হয়েছে দাঁও মেরে ঐ বস্তু আঠারো ডলারে কেনবার আদ্যন্ত ইতিহাস। সেই ব্যাপার আবার উঠে পড়ে বুঝি! ভয়ে-ভয়ে মুখ তুলে তাকালাম।

না, কার্তিকের মতি এখন অন্যদিকে। বলে, বই লিখছেন তা বুঝতে পেরেছি। আমার কথা লিখবেন কিন্তু।

ভোঁতা-বুদ্ধি এই মানুষগুলোর ভারি ঝোঁক, ফাঁকতালে নাম করে নেবার।

নামের নেশায় কোন এক মওকায় হঠাৎ বীরত্বের কাজও করে বসে। কিন্তু আপাতত হাত এড়ানোর দরকার। মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। বললাম, শ—মশায়ও এক ট্রাউসার কিনেছেন। বেশ ভালো জিনিস।

দেখেছেন আপনি? ভালো আমার চেয়ে?

তাই তো মনে হল—

ব্যস। মুহূর্তে উধাও। শ— ওদিকে, কামরার একেবারে শেষ প্রান্তে। অতএব নিশ্চিন্ত আপাতত।

পাহাড় আরো ঘনীভূত হয়েছে। টানেল পার হচ্ছি মাঝে মাঝে। একটা টানেল অত্যন্ত বড়। আলো জ্বলে উঠল কামরার মধ্যে। চলেছে তো চলেইছে—শেষ আর হতে চায় না টানেল।

স্টেশন—কি নাম? চীনা অক্ষর......ইংরেজিতেও লেখা আছে ওদিকে। সা তিন। একটা মেয়ে ঐ পাহাড়ের উপর পা ছড়িয়ে বসে রেলগাড়ি দেখছে। জেলে জাল ফেলছে খাড়ির জলে। পাল-তোলা কত নৌকো যাচ্ছে সারবন্দি—মেঘনার উপর দিয়ে এমনিধারা বহর যেতে দেখেছি। কলাগাছ, ঝাউগাছ। নাম-না-জানা রকমারি গাছের জঙ্গল কলকেফুলের মতো হলদে হলদে ফুলে আলো হয়ে আছে। পাহাড়ের গা বেয়ে পিচ-ঢালা এক পথ উঠে গেছে কচ্ছপের সুমসৃণ পিঠের মতো। খাড়ি চওড়া হচ্ছে ক্রমশ। বাঁদিকের উত্তুঙ্গ পাহাড় থেকে কলোচ্ছলিত ঝরণা এ-পাথর থেকে ও-পাথরে নাচতে নাচতে নেমে এসে আমাদের রেললাইনের নিচে গুড়ি মেরে খাড়ির জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে—

পাটনার দৈনিক 'নবরাষ্ট্রের' সম্পাদক দেবব্রত শাস্ত্রী। শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল কংগ্রেসের কাজ করেছেন; এখন আর কংগ্রেসে নেই। চমৎকার মানুষ, আমার সঙ্গে খাতির জমেছে কলকাতা থেকেই। একবার গিয়ে তাঁর কাছে দাঁড়ালাম।

শাস্ত্রী বলেন, স্বর্গ না পাতাল—কোথায় চলেছি বলুন তো?

জবাব দিলাম, মর্তেই নিঃসন্দেহ। জড়বাদীর দেশ বলে মাটি কিছু কঠিন হতে পারে।

সারা দেশ রক্তে ভেসেছে এই তো সেদিন অবধি—

মাটিতে দাগ আছে কি না, খুঁজে দেখতে হবে। এত দেশের এতগুলো কড়া চোখ নিশ্চয় এড়াতে পারবে না।

মনোভাব অনেকেরই এমনই। কৌতূহল, সন্দেহ—একটু-আধটু আতঙ্কও যে নেই, এমন কথা হলপ করে বলতে পারি নে। সবজান্তা হিতৈষীদের অভাব নেই, ঘরে বসেই এক এক দিক্‌পাল। যাত্রার মুখে তাঁরা মুষলধারে সদুপদেশ ছেড়েছেন—

সমাজতান্ত্রিক নতুন ব্যবস্থা—দেশজোড়া দেখবে শুধু এক বিরাট মেশিন, মানুষগুলো সেই মেশিনের ইস্‌ক্রুপ-নাট। ব্যক্তি-সত্তা বলে কিছু আর নেই। কথাবার্তা সামাল হয়ে বোলো হে, দেখে বুঝে চলাফেরা কোরো। বেফাঁস কিছু ঘটলে কচ করে মুণ্ডটা ধড় থেকে নামিয়ে নিতে বাধে না ওদের।...

কত রকমের উদ্ভট ধারণা! শুধু প্রয়োজন ছাড়া আর কিছু নেই নাকি সেখানে! ফুলের মধ্যে হয়তো ফুলকপি—মানুষের যা ক্ষুধা-নিবৃত্তির কাজে লাগে। হাসি-আনন্দ-হীন উৎকট বস্তু-সর্বস্বতা। যাওয়া পণ্ডশ্রম ওসব দেশে। রীতিমতো ওজনদার পর্দায় ঘেরা চতুর্দিক। সে পর্দার যেটুকু ওরা প্রয়োজন মাফিক তুলে ধরবে, ঝাপসা-ঝাপসা আলোয় তাই দেখে এসো। আর শুনে এসো দম-দেওয়া পুতুলের মতো কলের মানুষগুলোর মুখে কয়েকটি শেখানো কথা। এই মাত্র, এর বেশি নয়।

সে যাই হোক, আর যে লেখা চলে না। প্লেন নয়, রেলগাড়ি। জোরে ছুটেছে। যে চীনে চলেছি, হাতের বাংলা অক্ষর এখন থেকেই তার লিপির প্রতিরূপ নিতে শুরু করেছে। লেখা অবশ্য চালিয়ে যেতে পারি, কিন্তু পড়ে দেবে কে?...

পাহাড় জমে আসছে, খাড়ির ওপারেও পাহাড়। ক্রমশ পাহাড়-ঘেরা হ্রদ হয়ে দাঁড়াল ঐ খাড়ি। পাহাড়ের ছায়া পড়ে মসীকৃষ্ণ দেখাচ্ছে জলের রং। জলের নিচে থেকেও ছোট ছোট পাহাড় মাথা উঁচু করেছে। পাহাড়ের গায়ে একেবারে হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছে এক নিশ্চল স্টিমার—চিমনি দিয়ে মৃদু ধোঁয়া উড়ছে ঘুমন্ত জনের শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো।

তার পর কখন এক সময়ে হ্রদ থেকে দূরবর্তী হয়ে পড়েছি, জল আর কোন দিকে নেই। সমতল জনপদ, একটা দুটো পাহাড় কদাচিৎ। স্টেশন, হাট-বাজার, ইস্কুল-মাঠ সাঁ-সাঁ করে পার হয়ে যাচ্ছি। সীমান্তে এসে গাড়ির গতি স্তব্ধ হল। আর এগোবার এক্তিয়ার নেই।

লাউ-হু—স্টেশনের নাম। বৃটিশ-প্রভুত্বের শেষ। মহাচীনের প্রান্তভাগে

কীটদষ্ট কয়েকটা টুকরো এমনি রয়ে গেছে এখনো। অনেক দিন ধরে বিস্তর আরাম করেছে, যাই-যাই করে এখন হাই তুলছে।

ছোট্ট খাল। খালের উপর পুল। খাল-পারে অনেক দূর অবধি কাঁটা-তারে ঘেরা। নতুন-চীনের আরম্ভ পুলের ও-পার থেকে।

রোদ প্রখর। মালপত্র নামিয়ে স্তূপাকার করে রেখেছে। তারই মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে যে যার জিনিস দেখে নিতে ব্যস্ত। শুধু চোখের দেখা দেখলেই হল যে ঠিকমতো সমস্ত এসে পেঁছেছে। আর কোন হাঙ্গামা নেই। এখান থেকে বয়ে নিয়ে ও-পারের গাড়িতে তোলা এবং ক্যাণ্টনে পেঁছে দেওয়ার যাবতীয় দায়ঝক্কি ওঁদের। সর্বদা হাতের কাছে প্রয়োজন, গাড়ির গাদার মধ্যে দিলে চলবে না, সেই ক'টি জিনিস শুধু হাতে করে নিন।

আমি ছোট স্যুটকেসটা নিয়েছি। কে আবার ওর থেকে আজে-বাজে জিনিস বের করে আলাদা ভরে দিতে যায় এখন? কিন্তু আলস্যটুকু না করলেই ভাল হত! ভাবা উচিত ছিল, এক এলাকা থেকে একেবারে পৃথক আর এক এলাকায় ঢুকছি—পথ কিছু বেশিই হবে। আরও মুশকিল, কাস্টমসের নানা আগড় অতিক্রম করে গজেন্দ্রগমনে এগুতে হচ্ছে। মাথায় চড়চড়ে রোদ—ছুটে গিয়ে বসব ও-পারে তার জো নেই।

পুলের মাঝামাঝি এসে পিছনে তাকাই একবার। ছোট্ট খাল—এপারে-ওপারে তবু কি দুস্তর ব্যবধান! কার্তিক পাশে এসে পড়েছে। বলে উঠল, ট্রাউসার পনেরো ডলারে কিনেছে বটে, কিন্তু কাপড় অতি খেলো। সওদায় আমার সঙ্গে পারবে? উনি তো শ—, ওঁদের মাথা রাজাগোপালাচারীকে ডেকে নিয়ে আসুন না!

পুল পেরিয়ে নতুন-চীনের মাটিতে পা দিলাম। উঁচু টিলার উপর এখানে একজন ওখানে একজন বন্দুকধারী সৈন্য ঘাঁটি আগলাচ্ছে। নিচের মাঠে শুয়ে বসে ছিল একদল—গায়ে পোশাক কিন্তু হাতে অস্ত্র নেই। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে তারা হাততালি দিচ্ছে। হাততালি দিয়ে অভ্যর্থনা করছে আমাদের।

আর ওদিকে তারের বেড়ার ওধারে পদ্মবন। পদ্মফুলের সময় এখন নয়, ডাঁটার উপর বড় বড় পাতা ছত্রাকারে মেলা। দুলছে প্রসন্ন বাতাসে।

না দাদা, ঠকিয়েছে-আমায়। তাই ভাবছিলাম এতক্ষণ ধরে। কাপড় হয় তো উনিশ-বিশ—গালে চড় মেরে আমার কাছ থেকে আঠারো ডলার নিয়ে

মিল। ট্রাউসারের দাম পনের-ষোলর বেশি হতেই পারে না।

দ্রুত হেঁটে দূরবর্তী হই কার্তিকের কাছ থেকে। এ হাহাকার শুনতে পারি নে। আরও যে কত ঠকে যাচ্ছ, হুঁশ নেই। দূরবিস্তৃত প্রান্তর, প্রান্তর-শেষে ছবির মতন ঐ সব ঘরবাড়ি, উদার সূর্যালোক, আনন্দ-ভাসিত পদ্মবন—তিন ডলারের শোকে আচ্ছন্ন হয়ে আছ, কিছুই এ সব তাকিয়ে দেখলে না একটি বার!

রাজা-মহারাজাদের অভ্যাগম হচ্ছে—এমনি খাতির! উঁহু, ভুল বললাম—অনেক কালের অদেখা আপন মানুষদের পেয়ে এরা উল্লাসে মেতে গিয়েছে। তাই বটে! প্রশান্ত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইদানীং যারা চীনের তটে উঠেছে, লুঠেরা প্রায় সবাই; আফিঙের মৌতাতে অজ্ঞান করে রেখে সর্বস্ব পাচার করে দিত নানান দিকে। আজকের এই ব্যাপার নিতান্ত অভিনব। সাঁইত্রিশটা দেশের নির্বিরোধী মানুষেরা শলা করতে আসছে, আনন্দ এবং মান-ইজ্জত নিয়ে কি করে সকলে শান্তিতে বেঁচে থাকতে পারে।

বাজনা বাজছে। শিল্পী পিকাসোর পরিকল্পিত সুবৃহৎ কবুতরের ছবি—তারই নিচে দিয়ে তোরণদ্বার অতিক্রম করে এগিয়ে গেলাম। স্টেশনের নাম সেন-চুন। মোভি-ক্যামেরায় চলন্ত ছবি নিচ্ছে। দু'জন মহিলা ছিলেন, কার্তিক এগিয়ে তাঁদের কাছে জুটল। হাত নেড়ে ব্যস্তভাবে কি কথা বলছে। আমি কিন্তু জানি। কথোপকথন লোক-দেখানো—আসল দরকার বুঝতে পেরেছি। মেয়েদের সঙ্গে ক্যামেরার মুখে দাঁড়াবে। মেয়েদের খাতিরে ক্যামেরা নিশ্চয় একটু বেশিক্ষণ থাকবে ওঁদের উপর, কার্তিক ঐ সঙ্গে ভালমতো ছবিতে উঠবে।

স্টেশনে পা দিয়েই তাজ্জব! ওয়েটিং-রুম না লাইব্রেরি? টানা টেবিলের ধারে বেঞ্চি, লোকে সারি সারি বসে পড়ছে। বই সাজানো আছে একদিকে, রেল কোম্পানির লোক আছে লেনদেন ও খবরদারির জন্য। মহাব্যস্ত তারা। চীনা ভাষা অবোধ্য, তবু উল্টেপাল্টে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে বোঝা গেল, শিশু-পাঠ্য থেকে উঁচু রাজনীতি-সংক্রান্ত—সকল রকমের বই আছে। কার্ল মার্কস এঙ্গেলস লেনিন স্ট্যালিন প্রভৃতির ছবি থেকে আন্দাজ করা যাচ্ছে মার্কসবাদ ও কম্যুনিজমের বইও বিস্তর। একেবারে চুপচাপ—মাটিতে সূঁচ ফেললে বুঝি শোনা যাবে। হৈ-হুল্লোড়ের জায়গা স্টেশন—কিন্তু এই প্রান্তটুকুতে যেন ধ্যানস্তব্ধ তপস্যার ক্ষেত্র বানিয়েছে। ট্রেনে যাবার জন্য স্টেশনে এসেছ, গাড়ির দেরি আছে—আহা, মিছে সময় নষ্ট করে হবে কি? পড়ো বসে বসে—

শিখে নাও এই ফাঁকে যতটুকু পারো।

সবাই যে পড়ছে, তা নয়। পড়তে জানেও না কত জন! ক্যারমবোর্ড আছে, ভূমিতে নয়—খানিকটা উঁচুতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলতে হয়। খেলছে কয়েক জনে চারিদিক ঘিরে। আর ওদিকে সারি সারি বেঞ্চি পাতা, পিছনে ঠেশ দেবার ব্যবস্থা আছে। আমাদের ইস্কুলে যেমন ক্লাস সাজানো থাকে। অনেকে বসে আছে সেখানে। যাত্রীদের মালপত্র একদিকে পাশাপাশি সাজানো। শৃঙ্খলা সর্বত্র।

দেয়ালে দেয়ালে ছবি ও পোস্টার। ইতস্তত নয়, সাজাবার পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি আছে। শিক্ষার সঙ্গে শিল্পরুচির অপরূপ সমন্বয়। আছে খবরের কাগজ—বোর্ডে ক্লিপ দিয়ে আঁটা। নতুন-চীন ডাকহাঁক করে সকলকে শোনাতে চায়—কি মাণিক্য সে পেয়েছে, আরও কি কি সে পেতে চায়। এই সীমান্ত-স্টেশন থেকেই তার শুরু।

আর এক বিস্ময়—স্টেশন জায়গা, এত মানুষের আনাগোনা, কিন্তু ধুলো-ময়লা নেই কোনখানে। ছোট্ট মেয়েটা কমলালেবু খেল—আরে আরে, খোসা নিয়ে গুটগুট করে যায় কোথা ওদিকে? আবর্জনা ফেলবার জায়গা আছে—উপরে ঢাকনি, ঢাকনির সঙ্গে কাঠের লম্বা হাতল। হাতল ধরে ঢাকনি তুলে লেবুর খোসা তার মধ্যে ফেলে আবার ঢাকা দিল। থুতু ফেলছে, তা-ও এই সব জায়গায়। কেমন অসোয়াস্তি লাগে। নিতান্তই রেললাইন পাশে, তাই ধরে নিচ্ছি স্টেশন। নইলে বাস-ঘর কিম্বা ঠাকুরঘর বললেই বা ঠেকায় কে? ভয় হয়, কেউ আবার জুতো খুলতে না বলে বসে!

এদিকে—

ভদ্রলোক ইংরেজি জানেন না—হাত নেড়ে হাস্যমুখে পাশের হলঘর দেখাচ্ছেন, ঢুকে পড়তে ইসারা করছেন।

নিচু নিচু টেবিলে কেক স্যান্ডউইচ রকমারি ফল লেমন-স্কোয়াশ ইত্যাদি। চা নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে জনে জনের কাছে। অতএব ঢোকাবার কারণ বোঝা যাচ্ছে; মুখের বাক্য নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু বাক্যবিদ্‌ও একজন এসে পড়লেন।

দাঁড়িয়ে আছেন আপনি?

এতক্ষণ বসে বসে এলাম। আবার এই ঘরের ভিতর ঠায় বসিয়ে রাখবেন, দেখতে শুনতে দেবেন না?

দেখবেন বই কি! দোষত্রুটিও দেখিয়ে দেবেন, এই আমরা চাই। কিন্তু

কষ্ট করে এলেন, এখন বিশ্রাম নিন।

বললাম, সকালে হংকং থেকে আচ্ছা এক দফা সেরে ট্রেনে উঠেছি। তুলোর বাক্সে যেমন করে আঙুর আনে, সারা পথ তেমনি করে তো নিয়ে এলেন। বলছেন যখন, কষ্ট কিছু করেছি নিশ্চয়। কিন্তু ভেবে পাচ্ছি নে। দয়া করে যদি একটু ধরিয়ে দেন কি কষ্ট করেছি, তদনুপাতে বসে বসে হাঁপাতে থাকি আর সরবত গিলি।...

এক বর্ষিয়সী স্টেশনে আসছেন—পিঠের সঙ্গে বাচ্চা বাঁধা, আর এক বাচ্চাকে হাতে ধরে হাঁটিয়ে আনছেন। পিছনে এক তরুণী—ছোট বোনই হবে আগের জনের। হাতে ঘড়ি, চোখে চশমা—ছিমছাম আধুনিকা। কিন্তু কান্ড দেখুন—কাঁধে এক বাঁক, বাঁকের দুই প্রান্তে গন্ধমাদন তুল্য দুই বোঝা। দিন দুপুরে অন্তত পক্ষে শ' দুই-তিন চক্ষুর সামনে প্রকাশ্য স্টেশনের উপর আধুনিকা বাঁকে ঝুলিয়ে বোঝা নিয়ে আসছে—ভ্যানিটি-ব্যাগ বইতেই ঘাম বেরিয়ে যায় 'পল্লবিনী-লতেব' ললনা দর্শনে অভ্যস্ত আমাদের দৃষ্টিতে আর পলক পড়ে না।

না, দেখেছিলাম একবার গোবরডাঙা স্টেশনে। পায়ে মল ও আলতা, মাথায় দেড়গজি ঘোমটা—এক বউ ট্রাঙ্ক ঘাড়ে করে নিয়ে চলেছে। আগে আগে যাচ্ছে স্বামীপ্রবর—হাতে ছড়ি, মুখে বিড়ি, ফাঁপানো টেড়ি মাথায়। ছড়ি তুলে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, বউ পিছিয়ে পড়েছে বলে। গাড়ির কামরায় বসে সেই একবার দেখেছিলাম। কিন্তু এখানে ছড়ি-ধারী মার্তণ্ড-মূর্তি দেখছি না কাউকে কাছে-পিঠে। আর বোঝা বয়ে মেয়েটা একটু যে কাতর হয়েছে, তার কোন চিহ্ন নেই। বরঞ্চ 'রণং দেহি' দৃষ্টি। দাও না আর গোটা দুই বোঝা এর উপর, ডরাই নাকি—চোখে মুখে এমনি ভাব প্রকট। দুম করে বোঝা নামাল, রাখল সে দুটো সাজিয়ে। হাতঘড়ি এক নজর দেখে টিকিট করতে চলল।

স্বাস্থ্যান্বিত উজ্জ্বল মেয়েগুলোর এমনি প্রতাপ নতুন-চীনের পথে ঘাটে সর্বত্র। ওয়াং-সিও-মেই-কে তাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম......থাকগে এখন। ওকথা পরে হবে।

ছোট স্টেশন ছিল। এখন প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে, সম্প্রসারিত হচ্ছে নানান দিকে। অনেক লোক খাটছে, দিন-কে-দিন ভোল বদলে যাচ্ছে। আমাদের জিনিসপত্র এনে ফেলেছে। এইবার একটু কাজ—কোন্ জিনিসটা কার, বলে দেওয়া। ওদের নিজ ভাষায় নাম লিখে নিয়ে যথাব্যবস্থা করবে।

ক্যান্টনের হোটেলে গিয়ে দেখতে পাবেন, ঘরের তাকে আপনার বাক্স-বোঁচকা সাজানো রয়েছে।

দাদা, রাখবেন তো আমায় ?

কার্তিক এসে অনুনয় করছে। অবাক হয়ে বলি, মারছে কে আপনাকে ? আর মারে যদি, আমিই কোন শক্তি ধরি রুখবার ?

কার্তিক বলে, আপনি মালিক—সর্বশক্তিমান। সমস্ত আপনার হাতে—হাতের ঐ কলমের ডগায়। এত টুকছেন, আমার কথাও টুকে নেবেন। বইয়ে যেন বাদ না পড়ি।

হুড়মুড় করে ট্রেন এসে পড়ল। ট্রেন এলো কামরা ভর্তি কলহাস্য আর প্রাণ-চাঞ্চল্য নিয়ে। ট্রেন এসে আমাদের কাছে যেন উপুড় করে দিল নতুন-চীনের বিচিত্র উল্লাস। গাড়ি থামতে না থামতে ছড়িয়ে পড়ল প্লাটফরমে, আমাদের বসবার ঘরে, আমাদের সকলের মনে মনে।

কলেজের ছাত্র-ছাত্রী—টাটকা গ্রাজুয়েটও আছে কয়েকটি। অতিথিদের দেখাশুনো ও দোভাষির কাজ করবে। ভার পেয়ে কৃতার্থ হয়েছে, এমনি ভাব। পরে আরো কত ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছে—তাদের এ কাজে আনা হয় নি, যেহেতু তারা বিদেশি ভাষা-বিভাগের (foreign language department) নয়। বেচারিরা সেজন্য মরমে মরে আছে।

সাঁইত্রিশটা দেশের প্রায় পৌনে চার শ' অতিথি—এমনি হাজার তিনেক ছাত্র-ছাত্রী তাদের আপ্যায়নের জন্য এসেছে। পড়াশুনো মুলতুবি রেখে ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে। নানা জায়গায় ছড়িয়ে রাখা হয়েছে তাদের, যেখানে-যেখানে অতিথিদের পা পড়বে। সংখ্যায় সব চেয়ে বেশি অবশ্য পিকিনে; কাজের দক্ষতাও তাদের সর্বাধিক। দিন নেই রাত নেই, শীত নেই বর্ষা নেই, সময় নেই অসময় নেই—ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে আছে। পান থেকে কারো চুণ না খসে, এমনি সতর্কতা।

ঐ ট্রেনই আমাদের বয়ে নিয়ে যাবে ক্যান্টনে। দাঁড়িয়ে আছে। উঠুন, উঠে পড়ুন এবার দয়া করে। ছেলে আর মেয়েগুলো ঘিরে নিয়ে আমাদের গাড়িতে তুলল। ওরাও চলল সঙ্গে। শুধুমাত্র বিদেশীয় হওয়ার গুণে এত-খানি খাতির মেলে, আগে কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছি ?

গাড়ি ছাড়ল। পিছনে তাকালাম একবার। বৃটিশ-এলাকা একটু-একটু

করে দূরে সরে যাচ্ছে। দুই রাজ্যের মাঝখানে ছোট্ট একটু খাল—অথচ আকাশ ও পাতালের ব্যবধান। হঠাৎ যেন নিশ্বাস লাগল গায়ে, নিশ্বাসের মতন হাওয়া। হাওয়া আসে ওপারের লাউ-হু স্টেশনের দিক থেকে। ঝুর-ঝুর করে পাতা ঝরে প্লাটফরমের গাছটার। রৌদ্রদীপ্ত আকাশের নিচে মনে হল রূপগরবিণী হংকং ঈর্ষান্বিত চোখে তাকাচ্ছে নতুন-চীনের দিকে। মূলভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আরামেই ছিল মোটের উপর। একটিমাত্র বৃটিশ-মনিবের মন জুগিয়ে এসেছে—চীনের মতো বারো ভূতের হাতে ভোগান্তি হয়নি। আজকে শতেক বৎসর পরে টনটন করে উঠেছে বুঝি পুরানো নাড়ি-ছেঁড়া বেদনা!

(৪)

ট্রেনে দুটো ক্লাস—নরম আর শক্ত। নরম ক্লাসের বেঞ্চিতে গদি-আঁটা, ভাড়াও কিছু বেশি। শক্ত ক্লাসে শুধু কাঠ। তফাৎ এই মাত্র, আর কিছু নয়। যাত্রীরা চা পায় বিনামূল্যে। খাও বা না খাও সামনে চা রয়েছে; ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ঢেলে নিয়ে চা-পাতায় আবার গরম জল দিয়ে যাচ্ছে। নরম বা শক্ত ক্লাস বলে কোন বাছ-বিচার নেই। টানা পথ গিয়েছে আমাদের খোপগুলোর পাশ দিয়ে—ইঞ্জিন থেকে শেষ অবধি এই পথে গতায়াত চলে। লাউড-স্পিকার প্রতি কামরায়—মাঝে-মাঝে গান হচ্ছে যাত্রীদের খুশি রাখবার জন্য। কাজের কথাও হচ্ছে—অমুক স্টেশন আসছে এবার; এক মিনিট থাকবে, যারা নামবে, তৈরি হও এখন থেকে। কিম্বা, অমুক পাহাড় দেখ ঐ ডান দিকে। অমুক নদীর পুল। লড়াইয়ের সময় বিশ জন মুক্তিসৈন্য আশ্রয় নিয়েছিল এই পুলের নিচে—কি কষ্ট তাদের, কি কষ্ট!

ট্রেন যে অঞ্চল অতিক্রম করছে, সেটা চিনিয়ে দিয়ে যাচ্ছে এমনি করে। ভূগোল আর ইতিহাস পুঁথির পাতায় মাত্র নয়—জীবন্ত হয়ে উঠছে চোখের সামনে। আমরা চীনা ভাষা বুঝি না, বোকার মতো হাঁ করে থাকি—ওরাই সদয় হয়ে যা-কিছু মানে বলে দেয়। কিন্তু কত আর বলবে! নানা জনের নানা প্রশ্নে টগবগ করে মুখে খই ফুটছে। চতুর্মুখের চারটে করে মুখ হলেও তো থই পেতো না।

সত্যি, এ কী অমোঘ সঙ্কল্প! শতকরা আশী জন ছিল অশিক্ষিত—তাদের একটি প্রাণীকে আর অজ্ঞ থাকতে দেবে না। সেন-চুন স্টেশনে পা

দিয়ে দেখেছিলাম, গাড়ির মধ্যেও ঠিক সেই ব্যাপার। ইস্কুল কলেজ য়ুনিভার্সিটি তো আছেই—পথযাত্রী, এখন একটু ফাঁক পেয়েছ, শিখে নাও যেটুকু পারো।

পরে দেখেছি, এ নীতি চীনের সর্বত্র। ভোর বেলা—হ্যাংচাউয়ের হ্রদের কিনারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সারি সারি নৌকো বাঁধা। নৌকো চালায় মেয়েরাই বেশির ভাগ। চড়নদার বেলায় আসবে। হাতে কাজ নেই—কি করবে, গলুয়ের সঙ্গে আঁটা কাঠের বাক্স থেকে বই বের করে নিয়ে পড়তে লাগল। রাত বারোটায় বাসে চড়ে পিকিঙের পথে শেষ দিনের শান্তিসম্মেলনে যাচ্ছি—রাস্তার ধারে আলো জেবলে ঐ বাঘা শীতের মধ্যে বয়স্কেরা লেখাপড়া করছে। দিনমানে সময় পায় না, লেখাপড়া শিখতেই তো হবে—রাত বারোটায় এসে জমেছে। গিয়েছি এক গ্রামে। বেলা দুপুর। ভয়াবহ চিৎকার আসছে এক বাড়ির উঠোন থেকে। কি ব্যাপার? একদল সৈন্য বিশ্রামের জন্য আছে, সেখানেই হাঁকডাক করে তারা পাঠ অভ্যাস করছে। নিরক্ষর ছিল। অল্প ক'দিনের মধ্যে শিখে নিতে হবে। তাই উৎসাহ ও বিক্রমের অবধি নেই।

যাক গে, পরের কথা—এ সব পরে হবে। ঝকমক করছে গাড়ির কামরাগুলো, বেঞ্চির উপরে পাটভাঙা চাদর পাতা। দুপুরের ভূরি-ভোজনের ব্যবস্থা চলতি ট্রেনে—আমিষ নিরামিষ যেমন খুশি। খেয়েদেয়ে ঝিমুনি আসছে। কিন্তু, না—অপরাধ মনে করি এ জায়গায় ঘুমানো। জীবনের এত বছর অতীত হয়েছে, অর্ধেক তার তো ঘুমিয়েই কাটালাম। আজকে জাগ্রত থাকো দুই চক্ষু। ট্রেন ছুটছে মাটি কাঁপিয়ে। গ্রাম ঘরবাড়ি মাঠঘাট নদীনালায় শ্যামশ্রী নতুন-চীনের হাস্যাননই দেখতে পাচ্ছি চতুর্দিকে। বন্ধুজনেরা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, অনেক—অনেক রক্তস্রোতে ভেসে আজকের এ দিনে এরা পৌঁছেছে। সকলের মুখে নজর করি, এক-একটা স্টেশনের প্ল্যাটফরমে নেমে তাকাই এদিক-ওদিক। রক্তের দাগ লেগে থাকে যদি কোথাও!

দক্ষিণ-চীনের এই অঞ্চল বাংলা দেশ বলে বারম্বার ভুল হয়ে যায়, ঠিক পূর্ব-বাংলা। বাঁশঝাড় গ্রামের ধারে। কলাগাছ, পেঁপেগাছ, কলাইক্ষেত। জলা যায়গায় কত পদ্মবন! নিঃসীম ধানক্ষেত। পাটক্ষেতও অনেক। আমাদের পাটের জিনিসের পুরানো খদ্দের চীন। মতলব ভাল নয় তবে তো —দেদার পাট চাষ করছে। নানা একজিবিশনে গিয়ে দেখেছি, কোথায় কত পাটকল হয়েছে তার হিসাব। পাটের জিনিসের উৎপাদন অতি-দ্রুত বাড়ছে। তৈরি জিনিসের নমুনাও দেখিয়েছে। ঢাকা-ময়মনসিঙের মতো উৎকৃষ্ট নয়

যদিচ, তবু দিব্যি কাজ চলবে। পাকিস্তানি বন্ধুদের সঙ্গে একত্র গিয়েছিলাম এক একজিবিশনে। উভয় তরফ থেকে চোখ টেপাটেপি করি—হায় রে, এ বাজারটাও হাতছাড়া হয়ে গেল! আগে জানতাম, পাট বাংলার একচেটিয়া। সে গর্ব নির্মমভাবে ভেঙে দিচ্ছে নানান জায়গা থেকে।

দীর্ঘ-দেহ এবং দীর্ঘ-দাড়ি মকবুল হোসেন—মাথায় কালো টুপি। বম্বের নাম-করা চিত্রকর। তিনি স্কেচ করে চলেছেন পাতার পর পাতা। ছেলে-মেয়েরা ঘিরে ধরেছে। স্বচ্ছ হাসি সর্বদা তাঁর মুখের উপর—সেই হাসি হাসতে হাসতে এগিয়ে দিলেন স্কেচগুলো। ওরা দেখছে, মুগ্ধ-বিস্ময়ে তাকাতাকি করছে পরস্পরের দিকে। হাতে হাতে ঘুরছে ছবি।

হঠাৎ দেখি, হোসেন সাহেবকে ছেড়ে আমার দিকে ধাওয়া করেছে। কৌশলটা তাঁরই—আমি এক লম্বা-চওড়া লেখক ইত্যাদি বলে থাকবেন। হাতে কলম, সিঁদের মুখে চোর-ধরার গতিক। ছেলে-মেয়ের দঙ্গল হটিয়ে দিয়ে হোসেন আবার কাজে মনোযোগ করেছেন। দু চোখে যা দেখেন, মহামূল্য মণিরত্নের মতো খাতার পাতায় তুলে নিতে চান।

কিন্তু আমার ছবি নয়, কলমের লেখা। তা-ও বাংলা অক্ষরে। এই দেখে বুঝবে কোন জন?

একটি মেয়ে তবু নাছোড়বান্দা।

কি লিখেছ পড়ো না একটুখানি!

তোমাদের কথা—

আমাদের নিয়ে আবার লেখা যায় নাকি?

ভাবীকালের মহাচীন তোমরা। তোমাদের জন্যেই চারিদিকের সকল আয়োজন। অবহেলার বস্তু তোমরা কিসে?

ঘাড় নেড়ে আবদারের সুরে বলল, বাজে কথা রাখো। নবেল আর গল্প লেখো, আমরা শুনেছি। কাদের নিয়ে তোমার গল্প বলো তাই।

ফুটন্ত ফুলের মতো মুখখানা দুই করতলে ন্যস্ত করে উৎসুক চোখে চেয়ে আছে। জবাব দিতেই হয়।

বাংলা দেশের মানুষ নিয়ে। তাদের হাসি-অশ্রু, ঘর-গৃহস্থালী, রাগ-অনুরাগের গল্প। আর আছে আমাদের স্বাধীনতার লড়াইয়ের কথা। কংগ্রেস আর দেশের মানুষ ইংরেজের সঙ্গে কতকাল ধরে অসম যুদ্ধ চালাল......শুনেছ কংগ্রেসের নাম?

কংগ্রেসের কথা অতি সামান্য জানে। বেশি শুনেছে নেহরুর নাম। আর

সব চেয়ে বেশি জানে টেগোর অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে। বিদেশী ভাষার ছাত্র-ছাত্রী বলেই সম্ভব।

বলছিলাম, আমাদের ছেলেমেয়েরা—তোমাদেরই মতো এমনি বয়স—হাসি-মুখে ফাঁসিকাঠে চড়েছে, গুলির মুখে প্রাণ দিয়েছে। ব্যক্তিজীবনের সুখদুঃখ কপালের ঘামের মতো তারা মুছে ফেলেছিল দেশের মুক্তির জন্য। তাদের কথা লিখেছি আমার বইয়ে—

চোখ ছলছলিয়ে উঠল, স্পষ্ট দেখলাম। হাজার-হাজার মাইল দূরে ভিন্ন দেশের মেয়ে—সেখানকার চাঁদ-সূর্যিও বুঝি আলাদা। আর সেই চলন্ত ট্রেনের মধ্যে ঐটুকু সময়ে আমাদের সর্বত্যাগীদের কি-ই বা বলতে পেরেছি! তবু কাঁদল। ধরা গলায় বলে, বলো আরও তাদের কথা। ভাল করে শুনি।

খাতা এগিয়ে দিই। তোমার নামটা লেখো এখানে।

চীনা অক্ষরে লিখল। পাশে ইংরেজি বানানে লিখল আবার। ওং-ঔন (Wong Oyun)। কয়েক ঘণ্টার সঙ্গিনী সমব্যথিনী মেয়েটার হাতের লেখা ঝিকমিক করছে আমার ছোট্ট খাতাখানায়।

পরে এক সময় জিজ্ঞাসা করি, কেঁদেছিলে কেন?

ওং-ঔন মুখ ফিরিয়ে নিল। অত স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ, তবু নজর তুলে কথার জবাব দিতে পারে না।

তোমার দেশেরও কত ছেলে-মেয়ে গেছে অমনি!

মেয়েটা বলে, অনেক—অনেক—আকাশের তারার মতো অগণ্য। কিন্তু তাদের জন্য কাঁদব কেন? তারা যা চেয়েছিল, সে তো পাওয়া যাচ্ছে—

স্বচ্ছন্দ শান্ত কণ্ঠে কথাগুলো বলল। স্তব্ধ হয়ে রইলাম। ফসল-ভরা মাঠের মধ্য দিয়ে গাড়ি ছুটছে। দিগ্‌ব্যাপ্ত সবুজ শীর্ষে আজকের জনমনের আনন্দোচ্ছ্বাস ঢেউ দিয়ে যাচ্ছে যেন। ওদের মানস-স্বপ্ন মঞ্জরিত হল এত দিনে?

হবে আমাদেরও। এ আমি একান্তভাবে জানি। বললাম সেই কথা। ইংরেজ তামাম জাতটাকে মজ্জাশূন্য করে রেখে গেছে। উঠে দাঁড়াতে কিছু সময় লাগবে। পড়ে থাকব না আর। দুঃখ-নিশার অন্তে স্বাধীন বিমুক্ত দুই পুরানো প্রতিবেশী আবার আজ নতুন করে পরিচয়-স্থাপনা করতে এসেছি।

লড়াই চলছে চীনের সীমান্তে—কোরিয়ায়—ইয়েলু নদী পার হয়ে গিয়ে। তাই বা কেন—ইয়েলুর এ-পারেও পড়েছে সাংঘাতিক বোমা। সে থাক গে, দেশে ফিরে গিয়ে অনেক সকালবেলা চায়ের বাটি ও খবরের কাগজ নিয়ে আলোচনা চালানো যেতে পারবে। আর এক বিষম লড়াই হচ্ছে সমস্ত চীন জুড়ে, এমন গ্রাম নেই যেখানে লড়াই না আছে। ঘরোয়া যুদ্ধ—বিস্তারিত ব্যাপারটা অনেক বিদেশির চোখ এড়িয়ে যায়, কিন্তু ফলাফল অতি প্রত্যক্ষ। রেলপথের দু-পাশে ঐ দেখতে দেখতে যাচ্ছি।

আচ্ছা, জ্ঞান হবার পর থেকেই যে-চীনে দুর্ভিক্ষের কথা শুনে আসছি, দুর্ভিক্ষের চাঁদাও দিয়েছি কতবার—হঠাৎ সে-দেশ আড়তদারি ফেঁদে বসল কিসে? চাল বিক্রি করছে। পিকিনে ভারতীয় দূতাবাসে দেখা করতে গেলাম, সে সময়টা তাঁরা ভারি ব্যস্ত। বললেন, কিছু চাল খরিদের তালে আছি এদের কাছ থেকে। পিকিন ছাড়বার মুখে আবার যখন গিয়েছি, চাল গস্ত করা হয়ে গেছে। বহুবিস্তীর্ণ দেশের সংখ্যাতীত মুখে ভাত জুগিয়ে আরও বিক্রি করে, এত চাল চীন পায় কোথায়?

ঐ যা বললাম—লড়াইয়ের ফল। লড়াইয়ে মানুষ সাফ হয়ে যায়, খাদ্যের আর প্রয়োজন থাকে না। এ লড়াইয়ে কিন্তু তা নয়। মানুষ বিষম জীবন্ত হয়ে উঠেছে, ভীষণ খাচ্ছে। এত খেয়েও ফুরোয় না, তাই বাজারে দিচ্ছে। সেই সচ্ছলতা আমরা দেখে এসেছি।

দেখুন—দেখুন না তাকিয়ে—

আঙুল দিয়ে দেখায় ওরা। ফসলের ক্ষেত রেলের পাটি ছোঁব-ছোঁব করছে। এক ছিটে জায়গা বাদ দিতে চায় না।

বললাম, দুই পাটির ফাঁকে ওখানেও তো কিছু আর্জানো যেত। গোল-আলু কি ব্যাঙের ছাতা? ওটুকু বাদ দিলে কেন? তা কি হয়েছে—রেলগাড়ি গড়গড় করে উপর দিয়ে চলে যেত! এ কিন্তু জমির অন্যায় অপচয়।

ঠাট্টা করে বললাম, কিন্তু গতিক এমনই বটে! পাগল হয়ে চাষে নেমেছে। খানাখন্দ ভরাট করছে। পাহাড়ের উপরে কেটে চৌরস করে সেখানেও চাষ। যে ফসল যেখানে ফলানো যায়।

চীনদেশের অফুরন্ত জমি, কিন্তু নিজের বলতে এক ছটাক জমি ছিল না অধিকাংশ লোকের। জমির মালিক জমিদার কিম্বা ধনী-চাষী—ঈশ্বর যেন তাদের ইজারা দিয়ে দিয়েছেন। চড়া খাজনায় জমি বন্দোবস্ত নিতে হত ওদের কাছ থেকে, কিম্বা মজুরি খাটত অন্যের ভূঁইয়ে। ঋণ করত মহাজনের কাছে

—সে ঋণ যথানিয়মে লাফিয়ে লাফিয়ে পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠত। মাটির সন্তানের দুর্ভোগে কুপিতা ভূমিলক্ষ্মী বিগড়ে গেলেন, রুগ্ন অশক্ত শিরদাঁড়া-ভাঙা চাষীর জমিতে ফসল ফলে না। দেশ জুড়ে নিরন্নের হাহাকার। সরকারি প্রচার-যন্ত্র হাঁকড়াচ্ছে—জনবৃদ্ধি ঘটেছে, অত খাদ্য আসবে কোত্থেকে? ধান-গম ছেড়ে ঘাসপাতা খাও বেশি করে। বিদেশির তুষ-ভুষি আনা হচ্ছে জাহাজ বোঝাই করে। উনিশ শ' পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের এই চীনের সঙ্গে আমাদেরও কয়েক বছর আগেকার অবস্থা দেখুন দিকি মিলিয়ে।

জমিদারের সঙ্গে চাষাভুষোর রোমহর্ষক নানা সর্ত—এ ব্যাপারে চীন আমাদের অনেক দূর ছাড়িয়ে ছিল। খাজনার উপরে এটা-ওটা দেওয়া, বেগার খাটা—ওসব তো ছিলই। আমাদের এখানে আছে, ওদেরও ছিল। আর যা ছিল, আমাদের লোকে শুনে কানে আঙুল দেবে। নতুন লাউ ফললে কি প্রথম গাই বিয়োলে মনিবের ভোগে দিতে হয়। নিজের স্ত্রী-কন্যার সম্পর্কেও অনেক ক্ষেত্রে ছিল অমনি বিধি।

কিন্তু এসব নিতান্ত অতীতের কথা। তিনটে বছরেই যেন অনেক পুরানো ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের মানুষ শিউরে ওঠে বিভীষিকার সে সব দিন মনে করতে গিয়ে। মুক্তির অবাধ আলো, নব জীবনের আনন্দ-স্বাদ! আর কি লড়াই, কি লড়াই! গ্রামে ঢুকছ—পথের মোড়ে ও নানা প্রকাশ্য জায়গায় দেখতে পাবে লড়াইয়ের বীরদের ছবি। কৃষক-বীর, শ্রমিক-বীর। ক্ষেতে দেড়া-ফসল ফলিয়েছে—চারিদিকে সেই বীরের জয়জয়কার। খবরের কাগজে ছবি উঠছে, নাম বেরুচ্ছে। সরকার থেকে পুরস্কার দিচ্ছে, আরামের প্রাসাদে পাঠাচ্ছে কিছুদিনের জন্য। রাজা-মহারাজা এবং বড় বড় ধনীরা ঐ সব প্রাসাদ বানিয়েছিলেন—স্ফূর্তির তুফান উঠত অহোরাত্রি। নিরন্ন নির্ধন গ্রাম্য চাষী, সর্ব অঙ্গে এখনো সেদিনের দারিদ্র্য-লাঞ্ছন—প্যালেসে গিয়ে এখন তারা গদিতে শুচ্ছে, কৌচে বসে তাস-দাবা খেলছে। শুধু বিলাস-সম্ভোগই নয়—কত ইজ্জত! চাষীরা তাই প্রাণপাত খাটে। আর, মা-লক্ষ্মী চুপিসাড়ে হিমালয় পার হয়ে গিয়ে ঐ নিরীশ্বর দেশে আঁচল বিছিয়ে বসেছেন। আমাদের ভাণ্ডে বুঝি মা ভবানী?

সন্ধ্যা হল। আকাশে মেঘের ঘন ঘটা। ক্যান্টনের আর দেরি নেই। পূর্ববর্তী শহরতলীর স্টেশনে গাড়ি থামল। জায়গাটার নাম—না, পড়বার

উপায় নেই—এখন শুধুমাত্র চীনা অক্ষরে। ইংরেজি পরিচারিকা বন্ধ চীনভূমিতে প্রবেশের পর থেকেই। স্টেশনের পাশে এক সাইজে-কাটা টুকরো কাঠ স্তূপীকৃত। দেশলাইয়ের কারখানা আছে তার জন্য। এরা যত দেশলাই জ্বালায়, আর যত সিগারেট পোড়ায়, সমস্ত স্বদেশে তৈরি। গাড়ি ধীরে ধীরে চলল ক্যান্টন অভিমুখে।

ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি নামল। গান কানে আসছে বৃষ্টি-বাদলার অবিরল আওয়াজ ছাপিয়ে। বহুকণ্ঠের সমবেত গান। সুর থেকে আন্দাজ পাচ্ছি, এ গান শুনেছি সঙ্গীদের মুখে। ট্রেনে তাদের গান করতে বলা হল, তারাও পাল্টা ভারতীয় গান শুনতে চাইল। উভয় তরফের গান হয়েছিল কয়েকটা। তার মধ্যে এই গানও শুনেছি। গানের মানে বুঝিয়ে দিয়েছিল—আমার খাতায় লিখেও দিয়েছে ইংরেজি বানানে। 'পৃথিবীর মানুষ এক হও, এক হও। সকল মানুষের একটি মাত্র হৃদয়—'

থামল গাড়ি। সম্বর্ধনার অপরূপ ব্যবস্থা। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে—বছর বারো-চোদ্দ বয়স—সারবন্দি প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে। পরিচ্ছন্ন বেশ, গলায় লাল রুমাল বাঁধা, সাদা কামিজ, কালো হাফ-প্যান্ট। হাস্যবিম্বিত মুখ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা। ইয়ং-পায়োনিয়র এরা। এক একজন আমরা কামরা থেকে নামছি, ওদের এক একটি এগিয়ে এসে প্রায় ব্রতচারী কায়দায় হাত তুলে অভিনন্দন জানাচ্ছে। ফুলের মালা নয়, তোড়া দেওয়ার রীতি। তোড়া হাতে দিয়ে তারপর ডান হাত জড়িয়ে ধরল। এগিয়ে চলেছি। আমার পিছনে যিনি নামলেন, তিনিও ঠিক এমনি। তাঁর পিছনে যিনি তিনিও।

ছবিটা কল্পনা করুন। সন্ধ্যার আঁধার ঘনতর হয়েছে মেঘছায়ায়। বৃষ্টি পড়ছে। চারিদিক বিমন্দ্রিত শত শত কণ্ঠের ঐক্য-সঙ্গীতে। হাত ধরে নিয়ে চলেছে প্রবীণ কর্তাব্যক্তিরা কেউ নয়—এই শিশুরা, ভাবী দিনের চীন। মিছিল করে চলেছি। উপহার-পাওয়া ফুলের তোড়া বুকের উপর, ডান হাতখানা কোমল মুঠির মধ্যে নিয়ে চীনভূমিতে পথ দেখিয়ে চলেছে—সে-ও পরম শুচি ফুল একটি। বিশিষ্টেরাও এসেছেন অবশ্য স্টেশনে—আপাতত তাঁরা অবান্তর। ছেলে-মেয়েদের দক্ষিণে ঐ দূরে দূরে চলেছেন তাঁরা, দরকার মতো দুটো-একটা কথার জোগান দিচ্ছেন।

আরও এগিয়ে আসতে হাততালি উঠল। হাততালি দিয়ে ক্যান্টনের মানুষ আবাহন করছে। গানও চলছে। আলো দিয়ে সাজিয়েছে সারা স্টেশন আর রাস্তার অনেক দূর অবধি। সৈন্যদল সারবন্দি দূরে দাঁড়িয়ে গান করছে।

সৈন্যেরা শুধু বন্দুক মারে না, গানও গায় তা হলে! গান গেয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা করতে স্টেশনে জমায়েত হয়েছে। গান গাইছে ছাত্র-ছাত্রী, ফ্যাক্টরির কর্মী, ক্যান্টনের অগণ্য নাগরিকদল। গম্ভীর স্বস্তি-মন্ত্র। পৃথিবীর মানুষ এক হও সকলে, মানুষের দুঃখ বিদূরিত হোক, কল্যাণ আসুক সর্বত্র...'

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ভুলে গেলাম, বিদেশে এসেছি কয়েক হাজার মাইল দূরবর্তী বাংলা দেশ থেকে। এ-ও আমার আপন ভূমি, চারিপাশের এই সব মানুষ আমার আপনার। মহাচীনকে ভালবেসে ফেললাম সেই মুহূর্তে, আমাদের চিরকালের সম্পর্ক নতুন করে চেতনায় এলো। মনের সমস্ত আকুতি দিয়ে কামনা করলাম, কোন অমঙ্গল কখনো যেন স্পর্শ না করে এই শিশুদের! বোমা না পড়ে এদের মাথায়, রক্ত না ঝরে মাটির উপর। পরিপূর্ণ রূপে বিকশিত হোক—সূর্যের আলোর মতো এদের এই সোনার হাসি ছড়াক দিগ্‌দিগন্তে।

আমার হাত ধরে যাচ্ছে মেয়েটি—দোভাষিকে দিয়ে তার নাম জিজ্ঞাসা করলাম। ওয়াই-মিংয়া। ডাকলাম নাম ধরে। ওয়াই-মিংয়া, তুমি ওয়াই-মিংয়া? সরল নিষ্পাপ মুখ তুলে সে মধুর হাসি হাসল।

স্টেশনেই জলযোগের ব্যবস্থা। তা-বড় তা-বড় যাঁরা এসেছেন, এতক্ষণে তাঁদের পরিচয় পেলাম। শহরের মেয়র, ডেপুটি মেয়র, শান্তি কমিটির প্রেসিডেন্ট, বড় বড় ব্যবসাদার ইত্যাদি। বেশভূষায় কিন্তু ঠাহর করবার উপায় নেই —মামুলি গলাবন্ধ-কোট ও প্যান্ট।

অপেক্ষমান মোটর স্টেশনের বাইরে। ছোট্ট সঙ্গিনীর হাতে হাত দিয়ে এসেছি, এইবার বিচ্ছিন্ন হব। হাত ঝাঁকাচ্ছে, বারম্বার ঝাঁকাচ্ছে—কচি তুলতুলে হাতটুকুতে যত জোর আছে সমস্ত দিয়ে সেকহ্যান্ড করছে। ছাড়বে না —ছাড়তে কিছুতে চায় না। তারপর মোটরে উঠে বসলাম। জীবনে আর কোনদিন চোখে দেখব না ওয়াই-মিংয়াকে। নামটা রয়েছে খাতায়।

গাড়ি হোটেলে নিয়ে চলল। পার্ল নদীর উত্তর তীরে আই-চুং হোটেল। ১৯৩৭ অব্দে তৈরি, পনের তলা প্রকান্ড বাড়ি। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল এবার—প্রবল ধারাবর্ষণের মধ্যে ভিজতে ভিজতে অবিচল জনতা তখনো গাইছে। গান ক্রমশ দূরবর্তী হয়ে একসময়ে মিলিয়ে গেল। হোটেলের ঘরে গভীর রাত্রি অবধি মনে তার অনুরণন শুনছি। এক হও, একপ্রাণ হও সমস্ত মানুষ......

আশ্চর্য মেয়ে পেরিন। ক্ষীণ দেহ কিন্তু অসীম কর্মোদ্যম। প্রস্তুতি-কমিটির ডেপুটি সেক্রেটারি-জেনারেল রমেশচন্দ্রের সঙ্গে বিয়ে হয়ে পেরিণ-রমেশচন্দ্র হয়েছেন। সে ভদ্রলোক তো আগেভাগে পিকিনে গিয়ে সম্মেলনের কাজে মেতে আছেন। পেরিন চলেছেন আমাদের সঙ্গে। কিম্বা বলতে পারি, আমাদেরই নিয়ে চলেছেন সঙ্গে করে। যাত্রা-পথে অজান্তে কোন সময় সকলের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

হোটেলে এসেই পেরিন বললেন, ঘরে গিয়ে দেখুন—মালপত্র ঠিকমতো পৌঁছেছে কিনা। সকালবেলা প্লেন—ওগুলো এক্ষুণি আবার ওজন হবে।

পিকিন প্রায় দেড় হাজার মাইল ক্যাণ্টন থেকে। ঠিক ছিল না, ট্রেনে যাওয়া হবে কি প্লেনে। স্টেশনেও ওখানকার কর্তারা সঠিক বলতে পারেন নি। এখন খবর হল, প্লেন পৌঁছে গেছে অতিথিদের নিয়ে যাবার জন্য। কালকের কয়েকজন পড়ে আছেন ত্রিশঙ্কুর অবস্থায়, তাঁরাও যাবেন। কিন্তু এত মানুষ-মাল একটা প্লেন একসঙ্গে বইতে পারবে না—আজকের কেউ কেউ তাই থেকে যাবেন। তাঁদের নিয়ে যাবে পরশু। কপাল ভালো, আমায় কালকের দলে ফেলেছে।

কিন্তু কপাল মন্দ যে প্লেনের ব্যবস্থা হল। ট্রেনে গেলে কত দেশ দেখতে দেখতে কত মানুষের সঙ্গে পরিচয় করে তিন-চার দিন ধরে খুশমেজাজে যাওয়া চলত। এ-পথে সাধারণের জন্য বিমান-চলাচলের ব্যবস্থা নেই। হয়ে ওঠে নি, প্লেনের ঘাটতি আছে, মনে হয়। এই দিক দিয়ে ভারতীয় আমরা জিতে আছি। জিত আরো কত! শীতে চামড়া চৌচির হলেও ওদের এক-আঙুল ক্রিম জোটে না—আর আমাদের মেয়েগুলো, অহরহ দেখতে পাচ্ছেন, কটকটে কালো মুখে পক্ব আপেলের আভা ধরাচ্ছে।

বাজে কথা থাক। সারাদিন ধকল গেছে, স্নান করে ঠাণ্ডা হই আগে। আমি আর পট্টনায়ক—দু'জনের কোণের ঘরে জায়গা। বাথরুমে তাকের উপর আনকোরা নতুন টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, চুলে মাখবার ভেসিলিন এবং ভেবেছিলাম গন্ধতেল— তা নয়, অডিকলোনের শিশি। সমস্ত দু-দফা করে। দরজার কাছে ঘাসের সুরম্য চটি দু-জোড়া। পায়ে দিয়ে ঘর-বারান্দায় ঘুর ঘুর করে বেড়ান—এই আর কি! মাত্র একটা রাতের মামলা—সকালেই কাঁহা-কাঁহা মুলুক চলে যাচ্ছি। তারই জন্য এত! ভেবেছে কি বলুন তো? একেবারে ন্যাড়া হাত-

পা নিয়ে ওদের মুলুকে এসেছি? দুই ব্যক্তি আমরা—অতএব দু-সেট করে প্রতিটি জিনিস। কিন্তু টুথপেস্টটাও কি এক টিউব থেকে নেওয়া চলত না? অডিকলোন দু-শিশিরই বা প্রয়োজন কিসে?

আতিথ্যের এই ব্যবস্থা শুধু মাত্র ক্যান্টনে নয়, চীনের সর্বত্র। যে হোটেলে গিয়েছি সেখানেই। পিকিন ছাড়া তিন-চার দিনের বেশি থাকতে হয়নি কোথাও। ও-সব জিনিস স্পর্শ করিনি, নিজেদের সঙ্গে ছিল—সামান্য ক্ষণের জন্য নষ্ট করে আসব কেন ওদের জিনিস?

বুদ্ধিমান করিৎকর্মা ব্যক্তিও ছিলেন অবশ্য। একদা একজনের ব্যাগ থেকে চিঠির কাগজ বের করতে গিয়ে চীনা-অক্ষর মুদ্রিত টুথব্রাশ বেরিয়ে পড়ল। হোটেলের মাল ভ্রমবশত তাঁর ব্যাগে ঢুকে পড়েছে। সে ভদ্রলোক কিন্তু ভারতীয় নন, দিব্যি করে বলছি। নিজেদের গালমন্দ করি—কিন্তু আমাদের লজ্জা দিতে পারেন এমন বহুতর ধুরন্ধর আছেন ভুবনে।

স্নানের মধ্যেই শুনতে পাচ্ছি, হাঙ্গামাগুলো তাড়াতাড়ি চুকিয়ে নেবার জোর তাগিদ। অতিথিদের সম্মাননায় ভোজের আয়োজন—সময় হয়ে গেছে, ভোজের আসরে যেতে হবে এখনই।

আবার শুনছি, পট্টনায়কের কাছে কে-একজন প্রশ্ন করছেন আমার নাম ধরে। ক্যান্টন শহরে অপরিচিত কণ্ঠে আমার নাম—তাই তো, কেও-কেটা ব্যক্তি আমি তো তবে!

খালি গা, ভিজে কাপড়-চোপড়—সেই অবস্থায় বেরিয়ে এলাম। কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি—খাস বাংলা জবানে বললেন, আপনিই? পরিচয় করতে এলাম—আমি ক্ষিতীশ বোস। গান গাই। কাল থেকে আটক হয়ে আছি হোটেলে। আপনাদের সঙ্গে এক প্লেনে যাবো।

পরের দিন থেকে ক্ষিতীশ চীন-ভ্রমণে আমার নিত্যসঙ্গী। এক ঘরে থেকেছি পিকিন, সাংহাই, হ্যাংচাউ—প্রায় সর্বত্র। ছাড়াছাড়ি দমদমা এরোড্রোমে ফিরে এসে।

ধুতি পরে গায়ে ধোপদস্ত পাঞ্জাবি ঢুকিয়ে কাঁধের উপর শাল চাপিয়ে ভোজ-সভার মধ্যে জাঁকিয়ে বসা গেল। ভদ্রতা বজায় রেখে আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে সকলে আজব পোশাক দেখছে। পাশের চেয়ারে ক্যান্টন শান্তি-কমিটির সেক্রেটারি। নিজের কাপড়-চোপড়ের দিকে একবার নজর বুলিয়ে

সগর্বে বললাম, আমাদের জাতীয় পোশাক।

কিন্তু ভারতীয় মানুষ আরো তো দেখেছি। তাঁদের এ সজ্জা নয়—

দৃষ্টির হুল সইতে পারেন না বলে কড়া কোট-পাৎলুনে তাঁরা অঙ্গ ঢেকে বেড়ান। লেখক মানুষ আমি—লোক না পোক—মানুষ গ্রাহ্য করি নে। তা হলে কি আজব আজব গল্প ছাপার অক্ষরে ছাড়তে পারতাম?

খাঁটি চীনা পদ্ধতির ভোজ, খৃস্টপূর্ব আমল থেকে ধারা চলে আসছে। সাজানো উপকরণ দেখেই উদর আঁৎকে ওঠে। পঁচিশ-ত্রিশ পদ তো হবেই—ভাজাভুজিগুলো আবার হিসাবে ধরা হয় না। বিশ্বসংসারে হেন বস্তু নেই, ভোজের টেবিলে যা একবার দেখা না দেবে! নিরামিষের মধ্যে প্রধান হল ব্যাঙের ছাতা ও বাঁশের কোড়। আছে সুবৃহৎ পাত্রে চার-পাঁচ সেরা এক একটা অখণ্ড ভেটকি বা ঐ জাতীয় মাছ। দৃষ্টিপাতেই রোমাঞ্চ হয়। জন চারেক মিলে চক্ষের পলকে ঐ বিশাল বস্তু শেষ করে ফেলছে। এহ বাহ্য, আসলে পেঁছিন নি কিন্তু এখনো। বন্ধুরা আমাকে হরবখত প্রশ্ন করেন, চীনাদের মূল-খাদ্য কি—চাল না গম? উঁহু, কোনটাই নয়—আসল হল মাংস। ভাত-রুটি ওগুলো ভোজন-শেষে মুখশুদ্ধির উপকরণ।

ভূচর খেচর জলচর—জীবব্রহ্মের সর্ব স্বরূপে এদের সমান আসক্তি। ব্যাং-আরশুলা সাপ-শুয়োর থেকে ইস্তক মা-ভগবতী। এক হাতে দুটি মাত্র শলাকার সাহায্যে কঠিন তরল যাবতীয় বস্তু অবিরত মুখের গহ্বরে চালান করছে। এ-ও এক তাজ্জব দৃশ্য! খাওয়া দেখতে দেখতে ম্যাজিক দেখার স্ফূর্তি পাওয়া যায়। আমাদের কেউ কেউ এ ব্যাপারে রপ্ত হয়ে উঠলেন দিন কয়েকের মধ্যে। ভারতীয় প্রতিভা যে কত উচ্চগ্রামের, তার একটি পরিচয়।

অসমর্থের জন্য অনুকল্প ব্যবস্থাও আছে—কাঁটা-চামচে। দু-পাঁচ দিন শলাকা-চালনার পাঠ নিয়েছি অনেকেই আমরা। মুখে নির্বিকার হাসি—যেন ভারি একটা রসিকতা হচ্ছে। আমাদের সেই কার্তিক—মনে আছে তো? ফড়িঙে পোকা ধরার মতো দুই কাঠিতে মুরগির ঠ্যাং সাপটে ফেলেছে মিনিট কয়েক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর। চতুর্দিকে একবার তাকিয়ে নিল—অর্থাৎ দেখুন একবার সর্বজনে চক্ষু মেলে। তুলেছেও মুখের কাছাকাছি—হাঁ করছে—হা ঈশ্বর! মাংসের টুকরো ছিটকে গিয়ে পড়বি তো পড়—তার সুবিখ্যাত আঠারো ডলারের ট্রাউসারের উপর।

সে যাই হোক, ধরা-বাঁধা কিছু নেই—কেউ মাথার দিব্যি দিচ্ছে না, ঐ প্রণালীতে খেতেই হবে। উপকরণ সম্পর্কেও তাই। পচা গজালমাছ কি হাঙরের কাঁটার ঝোল যদি বাদ দাও, জেলে-ফাঁসে যেতে হবে না। মারাত্মক বিপদ হল, ভোজপর্ব সমাধা হতে নিদেনপক্ষে ঘণ্টা তিনেকের ধাক্কা। আরম্ভ হয় ভদ্রতাসংগত মৃদু ভাবে, রাশ ক্রমশ আলগা হয়ে আসে। চীন-ভারত মৈত্রীর নামে এক পেগ শেষ হল—ভরে দিয়ে গেল সংগে সংগে। তিলেকের তরে গেলাস খালি থাকতে দেওয়া যেন অপরাধ। ওরা ভরে ভরে দিচ্ছে, আপনি অবিশ্রাম শেষ করে যান। বিশ্বশান্তির নামে খান এক পাত্র, খান অতিথিদের সম্মাননায়। উদ্যোক্তারাই বা বাদ যাবেন কেন, তাঁদের সমৃদ্ধি কামনা করে অতিথিপক্ষ থেকে প্রস্তাব করুন টোস্ট। চলেছে তো চলেছে—অন্তহীন প্রবাহ। এ হেন ভোজের অনুষ্ঠান হামেশাই ঘটে না, এই বাঁচোয়া। কোন নতুন জায়গায় গিয়ে পেঁছিলে অথবা বিশেষ কোন ব্যাপার ঘটলে। ভাতের সংগে আমরা ডাল খাই, ভোজের সংগে সুরাও তেমনি ওদের কাছে। খাচ্ছে সেটা কিছু নয়, কেউ খাচ্ছে না—সেটাই পরমাশ্চর্য ব্যাপার। তেমন নাকি নেশাও হয় না ঐ বস্তুতে। স্বীকার করছি, আমি কাপুরুষ ব্যক্তি—যাচাই করে দেখবার সাহস হয় নি। এর জন্য ঝঞ্ঝাট কম পোহাতে হয়েছে! মদের বদলে গেলাসে অরেঞ্জ-স্কোয়াশ ঢেলে স্বাস্থ্য ও সৌভাগ্য পান করতাম। আমাদের দলপতি ডক্টর কিচলুও। রক্ষা এই, এই প্রকার কমবখ্‌ৎ নিতান্ত গোণাগুণতি। সামান্য কয়েকটি মানুষে রসভংগের কারণ ঘটত না।

রান্না বহু বিচিত্র রকমের। আধেক তৈরি করে অতিথিদের ভোজে বসিয়ে দেয়—তার পর এক-একটা তরকারি শেষ করে গরমা-গরম নিয়ে আসে। অত্যুষ্ণ এক বস্তু বড় পাত্রে করে টেবিলে এনে রাখল; পিছনে আর একজন আসে কড়াই ভরতি ফুটন্ত ঝোল নিয়ে। ঝোল ঢেলে দিল পাত্রের উপর। ছাঁৎ করে ঐ টেবিলের উপরই ফুটে উঠল একটুখানি। আমাদের ব্যঞ্জন সম্বরা দেওয়া আর কি! চামচে কেটে এবারে নিজ হাতে নিয়ে নিন যতটা প্রয়োজন।

বড় বড় ভোজ, চার পাঁচশ' মানুষ এক সংগে খাচ্ছে, সেখানেও এই রীতি। কত লোক খাটছে না জানি, কি পদ্ধতিতে রান্নাবান্না করছে—ইচ্ছে করত রান্না-ঘরে উঁকিঝুঁকি দিতে। কিন্তু বিদেশের মহামান্য অতিথি—লজ্জায় বাধে।

পরে একদিনের কথা। এক ভোজে খুব দেমাক করছিলাম, যে যা-ই করুক—আমি বেছেগুছে সাত্ত্বিক খাওয়া খেয়ে এসেছি বরাবর। মেষ কিম্বা মুরগি—তার ওদিকে যাই নি।

অধ্যাপক হুয়া (যতদূর মনে পড়ে, পিকিন য়্যুনিভার্সিটির অধ্যাপক এই ভদ্রলোক) খুব হাসতে লাগলেন।

কোন চিজ কখন রসনা বেয়ে উদরে ঢুকেছে, সব কি টের পেয়েছ ভায়া? এই ধরো, ভাজা-আরশুলার গুঁড়ো অতি উপাদেয় মশলা; ঐ গুঁড়ো ব্যঞ্জনে দু'চার টিপ ছড়িয়ে দিলে সেই স্বাদ ইহজন্মে জিভ থেকে মোছে না। এমন বস্তু থেকে মান্য অতিথিদের বঞ্চিত করেছি, এই কি হতে পারে কখনো?

বলেন কি?

গোঁড়ামি আছে নাকি?

সত্যি কিম্বা রসিকতা ঠিক ধরতে পারলাম না। আমতা-আমতা করে জবাব দিই, তা নয়। অত্যন্ত যদি ভাল লেগে যায়, দেশে ফিরে কোথায় পাবো বলুন আরশুলা-চূর্ণ, কেউটের কাটলেট, অথবা হাঙরের সুপ? ঐ ভয়ে এগুতে ভরসা পাই নি।

ওরা কিন্তু লজ্জিত নয় কিছুমাত্র। বাহাদুরি দেখায়, আজেবাজে আরও দশটা হাস্যকর খাদ্যের মিছামিছি নাম করে।

বলে, সব খাই আমরা। বিষটিষ না হয়, আর চিবানো গেলেই হল। কোন কিছু অকারনে নষ্ট হতে দেওয়া সামাজিক পাপ। তা সে মানুষ-পশু-পাখি কীট-পতঙ্গ যা-ই হোক না কেন। সকলেরই মূল্য আছে।

তাই। চোর-ডাকাত, খুনি-গুণ্ডা—ওরা বলে, তৈরি করে নিতে পারলে সকলেই অতি-প্রয়োজনীয় সমাজের পক্ষে। জন্মপাপী কেউ নেই। গায়ে কালি লাগার মতো—চেষ্টা করে ধুয়ে-মুছে সাফসাফাই হওয়া যায়। তাই মৃত্যুদণ্ড দিয়েও মেরে ফেলে না সঙ্গে সঙ্গে। থাকো জেলের মধ্যে এক বছর দু-বছর। ভাল ভাল লোক যাচ্ছে তাদের কাছে, শিক্ষা দিচ্ছে, হিতকথা আলোচনা করছে। রিপোর্ট নিচ্ছে দণ্ডিতের মনোভাব সম্পর্কে। শোধরাচ্ছে যদি বোঝা যায়, আরও সময় দেবে—প্রাণদণ্ড মকুব হয়ে দীর্ঘ কারাবাস। তারও মিয়াদ কমবে নৈতিক উন্নতির অনুপাত-ক্রমে। আহা, জীবন নিলে সবই তো চুকেবুকে গেল—সমাজের কাজে লাগতে পারে বেঁচেবর্তে থাকলে। দেখাই যাক না চেষ্টা করে।

এমনি সকল ক্ষেত্রে। কুয়োমিনটাঙের সঙ্গে মারাত্মক লড়াই করে তবে দেশের দখল পেয়েছে। কোন ইতর কাজে পিছপাও হয়নি কুয়ামিনটাং অধিকার বজায় রাখবার জন্য। বিদেশিরা যা করেছে, স্বদেশীয় শত্রুদের অপরাধ তার চেয়ে বেশিই। রেল-রাস্তা উপড়েছে, পুল ভেঙেছে, কয়লার খনিতে

কাদামাটি পুরে নষ্ট করে গেছে চলে যাবার সময়। কিছু কিছু তার নিদর্শনও আমাদের দেখাল। এত যারা ক্ষতি করেছে, সে দলের বহুতর পান্ডা আজ বড় বড় সরকারি চাকরে—অনেক জরুরি বিভাগের অধিনায়ক। নতুন-চীন গড়ে তোলবার কাজে তাদের উদ্যম ও আন্তরিকতা কারো চেয়ে কম নয়। একদা ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে যাদের উৎকট শত্রু বলে ভেবেছিল, আজকে অভেদাত্মা তাদের সঙ্গে। তিন বছরে মহাচীন তাই বিশ্বজনের তাক লাগিয়ে দিয়েছে। সবাই এসো, আন্তরিকতার সঙ্গে দেশ গড়তে লেগে যাও—সকলের কাছে সে আহ্বান পাঠিয়েছে।

প্রথম এই চীনের সামাজিক ভোজে বসেছি। বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এ-পাশে বিশিষ্ট কেউ, ও-পাশে দোভাষি; মাঝখানে আমরা এক এক জন। অবিরত সওয়াল-জবাব চলেছে। ফৌজদারি আদালত হার মেনে যায়। থাকব সামান্য কয়েকটা দিন—মহাচীনের যতদূর জেনে যেতে পারি তার মধ্যে। সাঁইত্রিশটা দেশের পৌনে চার শ' মানুষ মাসাধিক কাল জেরা করে বেড়িয়েছি। খাওয়ার টেবিলেও বিরাম নেই, খেতে খেতেই খাতা বের করে টুকছি। দেশস্থ বুদ্ধিমানেরা তবু খেদোক্তি করেন, কিচ্ছু জানতে দেয়নি রে—অভিনয় করে বোকা বুঝিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে খাওয়া শেষ করে রাতদুপুরে ঘরে এলাম। সকাল বেলা চলে যাচ্ছি। আর নয়, শুয়ে পড়ো। ঘুমিয়ে পড়ো তাড়াতাড়ি। নতুন-চীনের প্রথম রাত্রি। সারাদিন আনন্দ-ভাসিত যত মুখ দেখেছি, অন্ধকারে সকলে যেন ঝিলিক হানছে। আরও আছে। বইয়ে পড়েছি আর শুনেছি যাদের কাহিনী। নামহীন যে শত-সহস্রের শবস্তূপ সিঁড়ি হয়েছে আজকের এ দিনে পৌঁছবার...

পুরানো কথা কিঞ্চিৎ অবধান করুন।

সাত সমুদ্র পারে ইউরোপের বন্দরে বন্দরে ফিরিঙ্গিরা বহর সাজাচ্ছে। রাজা-রাণীর কাছে দরখাস্ত করে, হুকুম দাও—ব্যাপার-বাণিজ্য করে আসি। তা পরের দেশে চরে খেয়ে বেড়াবে, বেশ তো, ভালই তো—এতে আর আপত্তির কি? ছাড়পত্র মিলল। রে-রে করে ছড়িয়ে পড়ে বণিকেরা নানান দেশে। বিশেষ করে এশিয়ার নির্বিরোধী সমৃদ্ধ সুপ্রাচীন দেশগুলোর উপর।

রেশম আর পোর্সিলেনের লোভে এসে পড়ল চীনে। চারু চিত্র-আঁকা যে

কাগজ এঁটে ইউরোপ দেয়ালের বাহার করত, তা-ও এখানকার। চীন তার বদলে কিনত ঘড়ি, টুকিটাকি শৌখিন জিনিস। কিন্তু ঘড়ি আর কত কেনা যায় বলুন? প্রাচীন সভ্যতা ও শিল্পের দেশ চীন—বিদেশি ব্যাপারির কাছ থেকে কিনবার মতন জিনিস কি আছে?

অতএব রুপো খরচ করতে হবে চীন থেকে যদি কিছু কিনতে চাও। রুপোর ভান্ডার চলে যাচ্ছে চীনে, রুপো দিয়ে দিয়ে য়ুরোপ গরিব হয়ে যাচ্ছে। এ কেমনধারা ব্যবসা? খোঁজো কোন বস্তু, যা বদলা বদলি চলে। পুঁজি ভাঙতে হয় না যাতে।

বৃটিশরা অবশেষে পেয়ে গেল তেমনি বস্তু—আফিং। আফিঙের মৌতাতে ঝিমোক পড়ে পড়ে চীন—চীনের মালে ভরা সাজিয়ে ব্যাপারি-জাহাজ ততক্ষণ দেশ-দেশান্তর পাড়ি দেবে। হাওয়া ঘুরে গেল। আগে অজস্র রুপো চীনে আসছিল, এখন তামাম জিনিসপত্র দিয়েও আফিঙের দাম শোধ হয় না। স্রোতের জলের মতো রুপো চলে যাচ্ছে বাইরে।

তখন টনক নড়ল। নেশায় পড়ে গোল্লায় যায় এত বড় একটা জাত! দুই কোটি আফিংখোর দেশের মধ্যে—দু-পাঁচ শ' নয়। আফিঙের আমদানি নিষিদ্ধ হল।

কিন্তু ও বললে কে শোনে? ইংরেজ ইতিমধ্যে ভারতের আফিং এক-চেটিয়া করে বসেছে। তোমার না থাক, গরজ যে আমাদের! জবরদস্তি করে কেনাবো। আইনে না হোক, বে-আইনি চলবে আফিঙের আমদানি।

আরও এক ব্যাপার। ভারতবর্ষ মুঠোয় পুরে টাকার কুমির হয়ে পড়েছে ইংরেজ। কলকারখানায় বিলাত ভরে ফেলেছে; পাহাড় জমেছে তৈরি জিনিস-পত্রে। খদ্দের চাই—পৃথিবী ঢুঁড়ছে খদ্দেরের চেষ্টায়। এত বড় চীনদেশ—আয়তনে গোটা য়ুরোপের চেয়ে বড়। ঢুঁ মারল সেখানে। চীন, তোমায় খদ্দের হতে হবে।

চীনের কবুল জবাব। সবই তো মোটামুটি আছে আমাদের—আমরা কিনব না।

তাই বললে কি হয়—ছি! অত বড় দেশ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, মাল নিয়ে আমরা তবে যাই কোথায়?

মিশনের পর মিশন আসছে। কখনো নরম সুর, কখনো গরম। শেষ মিশনের কর্তা লর্ড নেপিয়ারের প্রায় অর্ধচন্দ্র-প্রাপ্তি ক্যান্টন থেকে। ওদিকে আফিং আর আফিং—চোরাই আফিঙের ঠেলায় দেশ উৎসন্নে যাবার জোগাড়।

১৮৩১। বিশ হাজার আফিঙের বাক্স চুরমার করে দেওয়া হল এইখানে—ঐতিহাসিক এই ক্যাণ্টন বন্দরে। চোরাকারবারিরা বৃটিশ ও আমেরিকার মানুষ—স্বদেশীয় সরকারের কাছে তারা হায়-হায় করে পড়ল। কি অন্যায়, কি অন্যায়!

বেশ, ভাল কথায় শুনছ না—কামানের মুখেই তবে রফানিষ্পত্তি! বৃটিশ যুদ্ধঘোষণা করল, আমেরিকা সহায়। যুদ্ধান্তে নানকিনের সন্ধি। হংকং নিয়ে নিল বৃটিশ। অবাধ-ব্যবসায়ের পত্তন হল ক্যাণ্টন সাংহাই ইত্যাদি বন্দরে। যুদ্ধের যাবতীয় খরচ চীনকে দিতে হবে। এই হল আফিং-যুদ্ধ। চীনের দরজা খুলে দেওয়া হল দেশ-বিদেশের লুঠেরার সামনে।

মাঞ্চু-রাজারা দেশের মালিক। লড়াইয়ে হেরে তাদের ইজ্জত গিয়েছে। লোকের তেমন আস্থা বা আতঙ্ক নেই রাজার সম্পর্কে। সর্বনাশ, সাধারণ মানুষ শেষটা ক্ষমতা পেয়ে যাবে নাকি? রাজরাজড়ারা সময়-বিশেষে অল্প-স্বল্প বীরত্ব দেখালেও আসলে তাঁরা লোক ভালো, শেষ পর্যন্ত সামলে যান। তখন বিদেশিরাই আবার নিজ স্বার্থে মাঞ্চু-রাজার পিঠ চাপড়ায়। তোমার পিছনে আছি আমরা, আর আমাদের কামান-বন্দুক। এমন ধাতানি জুড়ে দাও, যেন একটা মানুষ কোন দিকে মাথা তুলতে না পারে।

তবু চাষীদের মাঝ থেকে বিদ্রোহ উঠল। তাইপিং বিদ্রোহ। নেতাকে সকলে বলে 'স্বর্গের রাজপুত্র'। জোয়ান অব আর্কের মতোই চাষীর ছেলে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ পেয়েছেন। 'শান্তির রাজত্ব' বানাবেন তিনি। সাদামাঠা অতি-সরল তাঁর বক্তব্য—সকলে খাবে পরবে, জমি ও টাকাকড়ি সকলের হবে, সব মানুষ সমান। আজকের মাও সে-তুঙের কথা এরই রকমফের কি না, দেখুন ভেবে।

রাজশক্তি বিপন্ন—রাজার সঙ্গে যত দহরম-মহরম থাক, এমন মওকা বিদেশিরা ছেড়ে দেবে কেন? এটা দাও, ওটা দাও—রাজার কাছ থেকে নানা সুবিধা আদায় করে নিচ্ছে। এরই মধ্যে একবার পিকিন শহরটা লুঠপাট করে কিঞ্চিৎ নগদ মুনাফাও হল। তারপর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সকলে দাঁড়াল তাইপিং গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে। খৃস্টভক্ত মহাধার্মিক মিশনরিরা আগে থেকেই তাইপিঙের আতিথ্যে আছেন। খুব খাচ্ছেন দাচ্ছেন, তোয়াজে আছেন। তাঁরা গোপনে খবরাখবর জোগান। তাইপিং দল যত অতিথিবৎসলই হোক, চাষা ভুষো তো বটে! তারা রাজ্যপাট চালাবে, এটা কেমনে সহ্য হয়? দেশময় রক্তবন্যা। কৃষক-নেতা সেই স্বর্গের রাজপুত্র আত্মহত্যা করে বাঁচলেন তো তাঁর

শিশুপুত্রকে কেটে রাগের শোধ নিল। পরিবারসুদ্ধ খতম—বংশে বাতি দিতে কেউ রইল না।

ঊনিশ শতকের শেষ গণ-অভ্যুত্থান—বক্সা-বিদ্রোহ। সাহিত্যিক দাদামশায় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই বিদ্রোহ-দমন ব্যাপারে ইংরেজ সরকার চীনে পাঠিয়েছিল। রাজা হলেন বিদেশিদের যো-হুকুম তাঁবেদার, ভাল ভাল বন্দর বিদেশিরা নিয়ে নিয়েছে, রাজকরের বেশির ভাগ বিদেশির ট্যাঁকে যাচ্ছে লড়াইয়ের খরচের বাবদ। বন্যার জলে জমিজিরেত ঘরবাড়ি ভাসছে, ট্যাক্সের দায়ে মাথা বিক্রি। মানুষের দুঃখের অবধি নেই।

প্রতিকার চাই। প্রতিরোধ করতেই হবে। গুপ্ত সমিতি চারিদিকে। শাসন-নীতির সামান্যতম বিরুদ্ধতা প্রকাশ্যে করবার জো ছিল না। বিশেষত চাষীর তরফ থেকে। এরা চাইল রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ তো বটেই—বিদেশিরও নির্বাসন। পশ্চিমি বণিক আর মাঞ্চু-রাজা সবাই ওরা এক জাতের।

রাজার তরফ থেকে তখন বিষম এক চাল চালল। চীনের আসল দুশমন হল বিদেশিরা—আমরা এই মাঞ্চু-রাজা নই। বিদেশি আপদগুলোই যত দুঃখ-কষ্টের কারণ, ওদের তাড়াবার জন্যে রাজশক্তি সকল রকম সাহায্য করবে। এক হয়ে লড়বে রাজা ও প্রজা।

রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে আক্রোশ, সেটাও এমনিভাবে চালান করে দেওয়া হল বিদেশির অভিমুখে। মোট আটটা বিদেশি শক্তি—সকলে একত্র হল। হেরে গেল চীন। দেশ-শাসনের পুরোপুরি দায়িত্ব তবু তারা নিল না। নলচে আড়াল দিয়ে তামাক খাওয়ার মতো রাজাকে খাড়া রাখতে হবে সামনে। বুড়ি রাণীকে বাতিল করে তাঁর দু-বছর বয়সের হামাগুড়ি-দেওয়া ছেলেকে রাজতক্তে বসাল। হেনরি পিউ-ই তার নাম—শেষ মাঞ্চু-সম্রাট।

রাজতন্ত্র খতম হল আরও পরে—১৯১২ অব্দে, সান-ইয়াৎ-সেন যখন সর্বমান্য দেশনেতা।

(৬)

রাত আছে তখনো। কড়া নাড়ছে। ঘুম ভেঙে চমকে উঠি।

কে ?

দরজা খুললাম। পেরিন ঘুমোন নি। জাগিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন ঘরে ঘরে।

উঠে সকলে তৈরি হও। রওনা হতে হবে।

আর যেই দরজা খোলা পেয়েছে, একজন সঙ্গে সঙ্গে ঢুকল চা এবং ফলমূল ইত্যাদি নিয়ে। সেবা করুন কিঞ্চিৎ। পেট খালি থাকলে ধকল সামলাবেন কি করে?

পট্টনায়ককে ডেকে দিলাম।

লেগে যাও ভাই। শেষ রাত্রে সাজিয়ে এনেছে—ফেলে গেলে ওরা দুঃখ করবে।

দু-ঢোক চা গিলে তাড়াতাড়ি আমি স্যুটকেশ খুলে বসলাম। ছোট-স্যুট-কেশের অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বড়টায় ভরে হালকা করে নেবো। কাল বেশ ভোগান্তি হয়েছে আলস্যের দরুন।

কাজ সেরে বাথরুমে যাচ্ছি স্নানাদি সমাপনের জন্য। হবার জো আছে? পুনশ্চ তলব, চলে আসুন—

কোথায় গো?

ব্রেকফাস্ট তৈরি—কিছু খেয়ে যান।

আর এই যে—এটা কি হল? এখন অবধি সাপটে ওঠা যায়নি—

বিছানার খাওয়া—এই আবার ধর্তব্যের মধ্যে নাকি? অনেক দূরের পথ। মনোরম ভাবে ঠেসে খেয়ে নিন, নইলে কিন্তু কষ্ট হবে।

অতএব ব্রেকফাস্টে গিয়ে বসলাম। সে পর্ব সমাধা করে লাউঞ্জে এসেছি—

বসবেন না আর। দরজায় গাড়ি, একেবারে গাড়িতে উঠে জুত করে বসুন।

ঘরে যাবো যে একবার। ছোট-স্যুটকেশ হাতে নিয়ে নেবো।

সে কি আর আছে? এরোড্রোমে পৌঁছে গেল এতক্ষণ।

চাই যে আমার সেটা। পথের দরকারি জিনিস তার ভিতর।

লিফটে উঠে পড়লাম। এক পাশে আলাদা রাখা ছিল, স্বচক্ষে দেখে আসি। না, কিছুই নেই। সমস্ত নিয়ে গেছে। ঘর খাঁ-খাঁ করছে।

নন্দীকে ধরলাম। এ বড় মুশকিল হল! লোকগুলো যেন মানুষ নয়, ঘড়ির কাঁটা। ওদের সঙ্গে তাল রাখি কেমন করে?

নন্দী অভয় দিলেন, পিকিন গিয়ে পেয়ে যাবেন। ভাবনা নেই।

আমার খাতাপত্তোর যে ওর মধ্যে। এতখানি পথ হাই তুলে কাটিয়ে শেষটা হাতির মুণ্ড হয়তো গণেশের ধড়ে চাপাবো ভ্রমণ-কথা লিখবার সময়।

আচ্ছা—এরোড্রোমে চলুন। দেবো বের করে আপনার স্যুটকেশ।

নিশ্চিন্ত হলাম। নন্দী হলেন দলের একজন সেক্রেটারি—দস্তুরমতো

ক্ষমতা ধরেন, আমাদের মতো হেলাফেলার মানুষ নন। ও'দেরই তাঁবে আছি—উঠতে বললে উঠি, শুতে বললে শুই। চুপি-চুপি নিবেদন করি, একুনে কত জন সেক্রেটারি—সেটা জিজ্ঞাসা করলে বিপদ। চেষ্টা করেছি, কিন্তু গুণে কূল পাইনি। এক-এক জন উদয় হয়ে হুকুম ঝাড়ছেন। কে বটেন ঐ মহাশয়? সেক্রেটারি। পিকিনে পৌঁছে হপ্তাখানেক কেটে গেল সেক্রেটারিবর্গের মুখ চিনতে। পাঞ্জাব-বঙ্গ-গুর্জর-মহরাষ্ট্র সকল দেশেরই আছেন। পুরুষ আছেন, মেয়ে আছেন। তবে এটা বলা যায়, সেক্রেটারির সংখ্যা প্রতিনিধির চেয়ে কম। বেশি হলেও দোষ ছিল না। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি হতে পারে তো এতে আর আপত্তি কিসের?

এরোড্রোম শহর থেকে খানিকটা দূরে পাহাড়তলি জায়গায়। ঘাসবন হয়ে আছে গ্যাংওয়ের উপর। আকাশ-চারণ খুব যে চালু এমত মনে হয় না। গাড়ি থেকে নামিয়ে ওরা সমাদরে টেবিলের সামনে বসাল। সেই এক ব্যাপার। ফলের গাদা, চা-কফি, স্যাণ্ডুইচ, নানাবিধ শীতল পানীয়।

এবং সকরুণ মিনতি। সেবা করুন। দূরের পথ পিকিন—কখন পৌঁচচ্ছেন ঠিক নেই—

ছাড়বে কখন বলো তো?

তা-ও বলা যাচ্ছে না। কি করবেন বসে বসে—খেতে থাকুন।

নন্দী প্রতিশ্রুতি ভোলেন নি। একে বলছেন, ওর কাছে দরবার করছেন—শেষটা হতাশ হয়ে এসে বললেন, জিনিসপত্তোর প্লেনে উঠে গেছে। পিকিনের আগে উপায় নেই।

সর্বনাশ! আমি কি করি তা হলে?

লেখার প্যাড থেকে তিনি খানকয়েক পাতা ছিঁড়ে দিলেন। এতেই যা-হোক করে চালিয়ে নিন আপাতত।

চীনা বন্ধু একজন ছিলেন পাশে। হেসে উঠে তিনি বলেন, কী মুখ বেজার করছেন! খান।

হায় ভগবান, পাকস্থলীর সঙ্গে একটা অতিরিক্ত থলি দিতে যদি! উটের যেমন আছে। তাহলে নিদেন পক্ষে বছরের খাদ্য আকণ্ঠ বোঝাই করে দেশে ফিরতাম। কত আঙুর-আপেল পচিয়ে এসেছি, ভাবতে গিয়ে এখন রসনা লালায়িত হয়ে ওঠে।

আর কি বলব—আমাকে নিয়েই কি যত গোলমাল!

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছি হোটেল থেকে। ভাবলাম, সময় তো অঢেল—

নতুন ঝকঝকে বাথরুম, চান-টানগুলো সেরে নেওয়া যাক এই ফাঁকে।

বেশিক্ষণ যাইনি। এরই মধ্যে কেমন মনে হল, বসবার ঘরটা নিঃশব্দ হয়ে গেছে, মানুষজনের সাড়া নেই। বেরিয়ে এসে—যা ভেবেছি তাই—এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। কা কস্য পরিবেদনা! প্লেন ছাড়া অবশ্য চাট্টিখানি কথা নয়, আগে অনেক রকম পায়তারা ভাঁজতে হয়। আরও এগিয়ে উঁকিঝুঁকি দিতে এরোড্রোমের এক জনের সঙ্গে দেখা।

সবাই উঠে গেছে, আপনি পড়ে আছেন যে!

সগর্জনে প্রপেলার ঘুরছে। আমাকে ফেলে প্লেন চলল তবে তো সত্যিই! দৌড়চ্ছি। আমার আগে আগে সেই লোকও দৌড়চ্ছেন। চিৎকার করছেন, রোখো—রোখো। কেউ শুনছে, তেমন লক্ষণ নেই। প্লেনের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে তিনি প্রচুর হাত-পা ছুঁড়তে লাগলেন পাইলটের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। তারপর আমার দিকে ফিরে হাতের ইঙ্গিতে দৌড়তে নিষেধ করলেন। অর্থাৎ ওরা দেখতে পেয়েছে, আর ভয় নেই। জোর কমতে কমতে প্রপেলার বন্ধ হয়ে গেল। প্লেনের দরজা বন্ধ, সিঁড়ি সরিয়ে নিয়েছে, মিনিট খানেকের মধ্যেই ছুটতে সুরু করত। আবার সিঁড়ি লাগিয়ে দেওয়া হল। দস্তুরমতো শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তখন আমার। একটা সিটে ধপাস করে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগলাম।

তারপর সামলে নিয়ে অভিমান ভরে পাশের ব্যক্তিকে বললাম, বেশ কিন্তু আপনারা! একটা লোক তেপান্তরে পড়ে রইল, কারো তা হুঁশ হল না? পথের উপর মারা পড়লে পায়ের ধাক্কায় মড়া ঠেলে এগিয়ে চলে যাবেন, সেই রকম দেখছি।

আকাশলোকে উড়তে উড়তে নন্দীর দেওয়া চিঠির কাগজে যা লিখেছিলাম, কতকটা তার অবিকল তুলে দিচ্ছি। একটা কথারও এদিক-ওদিক করিনি—

২৩শে সেপ্টেম্বর '৫২, বেলা ১০টা। দূরের পাল্লা, ট্রেনে যেতে দিন তিনেক লাগে। তাই উড়ে চলেছি। পার্ল নদী পার হয়ে ছুটেছি উত্তর মুখো। মহাচীন, সুপ্রাচীন কাল থেকে আমার ভারতবর্ষের কত মহাজন দিন মাস বৎসর ধরে তোমার ভূমির উপর পথ অতিবাহন করেছেন। আমরা নূতন কালের যাত্রী—তোমার দিগন্তপ্রসার আকাশের উপরে উড়ে চলেছি।

উপরে, কত উপরে! নিচের কিছু দেখা যায় না। কলঙ্কলেশহীন সাদা মেঘপুঞ্জ—সেই শ্বেত সমুদ্রে ভেসে ভেসে চলেছি। আমার বাম দিকে সূর্য ম্লান রৌদ্রের কর-বিস্তার করছে—আর এদিকে-ওদিকে যতদূর তাকাই অনন্ত অপার মেঘসমুদ্র। ঈষৎ তরঙ্গ উঠছে সেই সমুদ্রে। আবার মনে হচ্ছে, দুধ-সাগর—দুধ ঢেলে দিয়েছে সমস্ত অন্তরীক্ষে, দুধেরই ফেনা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। ভাসমান হিমশিলার মতো ঐ কয়েকটি মেঘস্তূপ। দুধসাগর ফুঁড়ে ক্ষীরের পাহাড় উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে নাকি? আকাশপথে কত ঘুরেছি, কিন্তু এমনটা দেখিনি কখনো। উত্তর-মেরুর অভিমুখে চলেছি—তুষারে লুপ্ত মেরুলোকের কথা কেতাবে পড়া যায়, এ যেন প্রায় সেই বস্তু।

তন্দ্রামতো এসেছিল। অপরাধ নেই, কাল রাতে ভোজ খেয়ে সাড়ে-এগারোটায় শয্যা নিয়েছি। রাত থাকতে উঠে গোছগাছ করতে হয়েছে। ওরই মধ্যে চা এবং ফল ইত্যাদি এনে দিয়েছে কামরায়। আবার ব্রেকফাস্ট সাড়ে-ছ'টায়। এরোড্রোমেও ব্যবস্থা ছিল, একাধিকবার গলাধঃকরণ করতে হয়েছে। প্লেনের মেয়েটি এখানেও নিবেদন করছে, কিঞ্চিৎ চলবে কিনা? পরের দেশে এসে পর-খাদ্য পেয়ে ক্ষিধে অসম্ভব রকম বেড়েছে দেখছি অনেক জনের। আমি ঐ মহাশয়দের পদনখের যোগ্য নই। খেয়েই যাচ্ছেন তাঁরা—প্রাণপণ প্রয়াসে খাচ্ছেন। সাধ্য কি, পাল্লা চালাতে পারি! আপোষে হার মেনে বসে আছি।

মেয়েটা বারম্বার বলছে। কফি খেয়ে তার মান রক্ষা করলাম। চিত্র-বিচিত্র গেলাসে কফি এনে দিল। কাগজের গেলাস—খাওয়ার পর ফেলে দিতে হয়। কিন্তু এমন মনোরম ছবি ঐ স্বল্পস্থায়ী জিনিসে যে গেলাসটা সযত্নে মোড়ক করে বাক্সে তুলতে ইচ্ছে করে।

চারিদিক এখন রোদে বিভাসিত। স্বচ্ছ সুন্দর আকাশ। আবার চোখ বুজেছি। হঠাৎ এক অপরূপ অনুভূতি—চোখ মেলে দেখি, মেয়েটা এক পাতলা কম্বল আমার পায়ের উপর দিয়ে চারিপাশ পরম যত্নে মুড়ে দিচ্ছে। আর ইতিমধ্যেই কোন সময় চেয়ারের ঠেশান নামিয়ে আরামে ঘুমের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অনেক দিন আগে, মা যখন ছিলেন—ঘুমন্ত ছেলে এমনি যত্ন পেত। আজকে এই ভিন্ন দেশে তুমি কোন মমতাময়ী এমন আমাদের স্নেহ দিচ্ছ! শুধুই সামাজিক কর্তব্য—তার বেশি নয়? ভাবতে মন চাচ্ছে না।

পাইলটের ঘর থেকে স্লিপ এলো—কুনাং প্রদেশ, চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙের দেশের উপর দিয়ে যাচ্ছি। বিচিত্র নিসর্গ-দৃশ্য। প্লেন যাচ্ছিল দশ হাজার

ফুট উঁচু দিয়ে—নেমে নিচুতে এল। নিঃসীম সবুজ পাহাড়—আঁকাবাঁকা নদীরেখা—সবুজের মধ্যে সাদার ঝিকিমিকি। সুদীর্ঘ অজগরগুলো ঘুমুচ্ছে যেন পাহাড়ের কোলে রোদ পোহাতে পোহাতে। ধোঁয়ার মতো এক দমক মেঘ এসে দৃশ্যটা ঢেকে দিল একবার। মেঘ সরে গেল—খণ্ড খণ্ড মেঘ পেঁজাতুলোর-মতো বিচ্ছিন্ন ভেসে বেড়াচ্ছে আমাদের অনেক নিচে। সামনে আবার দুস্তর মেঘসমুদ্র। হয়তো তারই মধ্যে গিয়ে পড়ব এখনই...

স্লিপ এলো, ১১-১৭ মিনিটে হ্যাঙকাউ পৌঁচচ্ছি। আবহাওয়া সুন্দর। এরোড্রোমটা উ-চ্যাং নামক জায়গায়; সেটা হ্যাঙকাউ-এর আড়পার।

সওদাগর ছোকরাটি প্লেনে উঠেই চোখ বুজেছেন, এবং অনন্তনিদ্রা দিচ্ছেন। তাঁর কোন দিকে লক্ষ্য নেই। ট্রেনেও দেখেছি এই ব্যাপার—গাড়িতে ওঠা মাত্র ঘুমিয়ে পড়েন। আর খাওয়ার আহবান এলে চোখ মেলে অগোণে খেতে শুরু করে দেন। সাতে-পাঁচে কোন তালে নেই। এক বন্ধু বলছিলেন, আপনারা নানান বড় বড় কথা বলেন, তার মধ্যে উনি থই পান না। অতএব ঘুমিয়ে থাকাই নিরাপদ। ঘুম না এলেও চোখ বুজে নিঃসাড়ে থাকেন।

ক্ষিতীশ ধরে পড়ল, বাংলা গান সে গাইবে—তার ইংরেজি অনুবাদ করে দিতে হবে। নইলে বুঝবে কে? অন্যে পরে কা কথা—আমাদের অবাঙালিরাও তো হাঁ করে চেয়ে থাকবেন। আরে দূর, এখন এই প্লেনের মধ্যে হয় নাকি? পিকিনে গিয়ে বসি আগে জুত করে। কিন্তু নাছোড়বান্দা ক্ষিতীশ।

সরস্বতী মুখাগ্রে এলেন সহসা। গানের এক এক পদ শুনছি, আর গড়-গড় করে ইংরেজি বলে যাচ্ছি। আড়াই মিনিটে খতম। তার মানে, নিরঙ্কুশ অবস্থা—বাংলা আর ইংরেজি পাশাপাশি মিলিয়ে কে দেখতে যাচ্ছে বলুন? বিদ্যে ধরা পড়বার ভয় নেই—অনুবাদটা শ্রুতিসুখকর এবং মূলের সঙ্গে তার ভাসা-ভাসা মিল থাকলেই হল।......

চীনের বৃহত্তম নদী ইয়াংসি। তারই তীরে হ্যাঙকাউ। প্লেন যেখানটায় নামল, সে এক মাঠ—উলুঘাসে ভরা। এরোড্রোম কে বলবে তাকে? মাঠের মধ্যে খানিকটা জায়গা সাফসাফাই করে নিয়েছে। ভাঙাচোরা গ্যাংওয়ে—কোন গতিকে অতি-সাবধানে ওঠানামা করতে হয়। বিশ্বযুদ্ধের সময় দায়ে পড়ে তাড়াহুড়োর মধ্যে তৈরি। তারপরে—শুনতে পেলাম, কুয়োমিনটাং চলে যাবার

সময় নষ্ট করে দিয়েছিল। এমন একটা নয়—অনেক জিনিসই। সমস্ত আবার নতুন করে গড়তে হচ্ছে। শান্তি-সম্মেলনের ব্যাপারে ক্যান্টন-পিকিন বিশেষ প্লেনের গতায়াত চলছে, বিমানঘাঁটির কর্মতৎপরতা তাই বেড়েছে এই ক'দিন।

অনেকগুলো মোটরগাড়ি। প্লেন নামবার সময় লক্ষ্য করেছি। ভূতলে পা দিতেই যথারীতি ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা। প্রচুর হাততালি।

একজন বা দু-জন এক এক মোটরে। শহরে নিয়ে যাবে নাকি? নদীর দু-পারেই শহর, প্লেন থেকে দেখেছি। কিন্তু দূর অনেকটা যে এখান থেকে! তা নিয়ে যাও যেখানে তোমাদের খুশি। শুধু মাঝপথে আবার খাবার গিলতে বসিও না, দোহাই!

সিকি মাইলও হবে না—মোটরগুলো মাঠের সীমানায় গিয়ে থামল। নতুন বাড়ি তুলেছে, আরও তুলছে। এয়ার-অফিস ও লোকজনের বসবার জায়গা। স্বচ্ছন্দে এটুকু হেঁটে আসতে পারতাম, কিন্তু অতিথির পা মাটির উপর উঠবে পড়বে, এ কেমন কথা! আর যা আশঙ্কা করেছিলাম—ঘরের মধ্যে নিয়ে বসাল, সামনে টেবিল, টেবিলের উপর খাদ্যসম্ভার।

করজোড়ে নিবেদন করলাম, নিতান্ত অক্ষম, নিরুপায়—মাপ করতে হবে।

তাই হয় নাকি? শান্তির সৈনিক আপনারা—নারাজ হলে চলবে কেন? সময় নেই যে একটা দিন আটকে রেখে দেখিয়ে শুনিয়ে দিই, মন খুলে দুটো কথা বলি। এর উপরে একটু কিছু মুখে না দিয়ে যদি চলে যান, আমাদের ভারি দুঃখ হবে।

ভদ্রতার মামুলি বুকনি নয়, প্রতিটি কথা আন্তরিকতায় স্নিগ্ধ। নির্গত হচ্ছে মুখ থেকে নয়, অন্তর থেকে। এমন নিবিড় আতিথ্য একান্তরূপে আমাদের প্রাচ্যের। পথে প্রান্তরে অচেনা আত্মীয়েরা বাৎসল্য বিছিয়ে আহ্বান করেন।

সময় বেশি নেই, প্লেন ছাড়বে আবার এখনই। ক্ষিতীশ গান ধরল। সুদূর-বিস্তৃত ইয়াংসির শীতল হাওয়ায় সুরতরঙ্গ খেলে বেড়াচ্ছে। শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শুনছে। শেষ হল গান। ইংরেজিতে আমি গানের মর্ম বললাম। দোভাষি ছেলেটি চীনা ভাষায় বুঝিয়ে দিল সকলকে। করতালি-ধ্বনি।

আর একটা—

নিরলস ক্ষিতীশ। গানে তার আপত্তি নেই। শেষ হয়ে গেলে ওদের একজন হাত ধরে টানে।

আর নয়, এবারে রওনা—

মোটরগাড়ি নিয়ে গেল প্লেনের পাশটিতে। আকাশে উঠলাম আবার। এক পাক ঘুরে ইয়াংসি-মহানদীর উপর। বিপুল বহুব্যাপ্ত জলরাশি। সমস্ত সুস্পষ্ট দেখছি। বাঁধ দিয়ে নদীর বন্যারোধ করা হয়েছে। দিগ্‌ব্যাপ্ত চর। চরের এখানে-ওখানে ক্ষেত, সরু নদী মাঝে মাঝে চর কেটে বেরিয়ে গেছে। শস্যশ্যামায়িত রূপ দেখে দু-চোখ প্রসন্ন হয়। ঘরবাড়িতে ভরা এক-একটা জায়গা—গ্রাম ওগুলো। কতগুলো গ্রাম ঐ নদীচরে, কে গণে বলবে?

দালানকোঠার ছাত নজরে পড়ছে। অতএব সমৃদ্ধিমান জনপদ। সুদীর্ঘ রাজপথ গেছে গ্রামগুলি সংযুক্ত করে। টুকরো কাগজে বর্ণনা লিখে রাখলাম—কোন একদিন এই লেখা পড়তে পড়তে চরভূমির পরিপূর্ণ ছবি মনে ভাসবে।

ইয়াংসি আর দেখা যায় না, পাহাড়ের আড়ালে পড়ে গেছে। চলেছি, চলেছি......কত দূর আর পিকিনের! লাঞ্চের সময়টা এবারে আর কোন ওজর গ্রাহ্য হল না। মুরগির ঠ্যাং, আর কিসের মাংস, ডিম, কাঁকড়ার একটা উপাদেয় তরকারি, নানা রকম ফল। খাওয়া শেষ করে কাচের জানলায় অলস দৃষ্টি বিসারিত করে বসলাম......

বেলা পড়ে এসেছে। ঘণ্টা বাজল, চীনা লেখা ফুটে উঠেছে সামনের দেয়ালে। অর্থাৎ পেটি বাঁধো, পিকিন নিকটবর্তী, প্লেন নামবে। বড় নদীর উপর দিয়ে যাচ্ছে। গেরুয়া বালুবেলা, ঘোলা জল। শহর দেখা যাচ্ছে। রেললাইন, নদীর উপরে পুল, জল-স্রোত দুর্বার বেগে চলেছে......

(৭)

পিকিনে নামলাম, তখন সন্ধ্যা আসন্ন। ফুলের তোড়া-সহ তেমনি শিশুরা। বিশিষ্টেরা অনতিদূরে। ভারত-দূতাবাস থেকে এসেছেন শ্রীযুত পরাঞ্জপে। মারাঠি যুবা—সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও কর্মিষ্ঠ। চীনকে ভালবাসেন মনে প্রাণে, তার সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি পরম প্রীতিপর। পিকিনে বছর পাঁচেক আছেন, দূতাবাসের চাকরি সম্প্রতি পেয়েছেন। আমাদের এক তরুণ বন্ধু সতীরঞ্জন সেন শান্তিনিকেতন থেকে চীনে গিয়েছিলেন—এঁরা দুজনে সতীর্থ। সতীরঞ্জন আমার সম্পর্কে খান কয়েক চিঠি দিয়েছিলেন, পরাঞ্জপের

নামেও ছিল। কিন্তু বিমান-ঘাঁটির ব্যস্ততার মধ্যে পরিচয় এখন সম্ভব হল না।

ভারতীয় দলের অনেকে আগে গিয়ে পেঁচেছেন—তাঁরাও এই বিমানঘাঁটি অবধি এসেছেন। পরিচয়ের দু-চারটে কথার পরে সেই ব্যাপার—খেতে বসে যাও এবার—

শ্রীমতী আচার্য এগিয়ে এসে আপত্তি জানান। আর সবাই থাক, ক্ষিতীশের খেলে চলবে না। দলের মধ্যে সবে-ধন ঐ একটি গায়ক। ক'দিন আগে এসে ওঁরা মহা বিপদে পড়েছেন। চীনা মেয়েগুলো অস্থির করে মারছে। গান শোনাও তোমরা—ভারতের গান। গানের পর গান তারাই গাইছে, ভারতীয়েরা মুখ ভোঁতা করে আছেন। কিন্তু কেন? গান গায় না, হেন মানুষ নেই। ম্যালেরিয়া জ্বর, প্রেমোদয় কিম্বা ভূতের ভয় হলে গেয়ে থাকেন না আপনারা গান? তারই দু-একখানা ছাড়লেই হত! খামকো হার স্বীকার করার মানে হয় না।

আমরা তো খাওয়ার টেবিলে জাঁকিয়ে বসেছি, আর ওদিকটায় নাচ-গান। বাংলা গান ও চীনা গানে রেশামেশি, ভারত ও চীনের ছেলেমেয়ে হাত-ধরাধরি করে নাচছে। ওরা চীনা গান ধরেছে, এরা তখন হুঁ-হাঁ করে গলা মেলাচ্ছে সেই সঙ্গে; আবার বাংলা গানের সময় ওদেরও সেই ব্যাপার। তাই দেখলাম —ভাষার পার্থক্য কিছুই নয়, ভূমির ব্যবধানও মিলনের বাধা হয় না। মন একমুখী হলে নিমেষে মিল হয়ে যায়।

চেয়ে চেয়ে দেখি, অজ পাড়াগাঁর চেহারা—শহরের নিশানা নেই কোন দিকে। তরিতরকারির ক্ষেত, ধানবন। কৃষকদের বাড়ি—মাঝে মাঝে টালি-ছাওয়া পাকাবাড়িও দেখা যাচ্ছে।

এমনি চলতে চলতে আমাদের বাস রেল-রাস্তা পার হয়ে বিশাল পাঁচিলের দরজায় এসে দাঁড়াল। বড্ড ভিড়। ভিড় কাটিয়ে ধীরে ধীরে ঢুকলাম ভিতরে। আসল পিকিন পাঁচিলের চৌহদ্দির মধ্যে; পাঁচিলের বাইরে শহরতলী বলা যায়। খুব বড় দরজা পাঁচিলে—বড় দরজার দু-পাশে দুটো ছোট দরজা। উপরে চৌকি—নগর-প্রহরার ব্যবস্থা সেখানে।

কি পাঁচিল রে বাবা! যেমন উঁচু, তেমনি চওড়া। কোন যুগে লয় পাবে না। ময়দানবেরা বানিয়েছে। হবে না কেন, সপ্ত আশ্চর্যের মধ্যে একটা হল মহাপ্রাচীর—সে তো এদেরই কীর্তি! স্থাপত্য-শিল্পে মহা ওস্তাদ। কোন শিল্পেই বা নয়? আর, দু-এক দিনের মধ্যেই টের পেলাম সেকালের ময়দানব

নতুন-চীনে আবার মাথা চাড়া দিয়েছে। বড় বড় ইমারত, রেল-লাইন, নদীর বাঁধ, পুল-রাস্তা যেন মন্ত্রবলে অবিশ্বাস্য রূপ কম সময়ে গড়ে তুলছে। যেমন একটা দেখলাম—শান্তি হোটেল। আটতলা বাড়ি, আধুনিক সকল রকম আরামের ব্যবস্থা বিশাল অট্টালিকায়। নবীনতম অলঙ্করণ ও রূপসজ্জা। মতলবটা উঠেছিল শান্তি-সম্মেলনের ব্যবস্থা উপলক্ষে। বাইরে থেকে বিস্তর অতিথি আসছেন, একমাত্র পিকিন-হোটেলে সকলেরই ঠাঁই হবে না। অতএব বানাও নতুন হোটেল-বাড়ি। তিন মাস সময় দেওয়া হল। কিসে লাগবে অত সময়—পচাত্তর দিনের মধ্যে সমস্ত শেষ।

মন্ত্রটা কি, জানতে চেয়েছি। বহু জনের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। বিশাল দেশের অগণ্য নরনারীর মধ্যে নতুন প্রাণের উন্মাদনা। দেশটা যে তাদেরই, সমস্ত সত্তা দিয়ে বুঝেছে। এতদিন খেটে এসেছে—খাটনির যা মজুরি, তার বেশি প্রত্যাশা ছিল না। আজকের প্রাপ্তি অনেক বেশি—শুধুমাত্র নিজের জন্য নয়, খাটছে নিজের দেশের জন্য। কাজ করে টাকা পাচ্ছে আর পাচ্ছে দেশ-সেবার আনন্দ। পরিশ্রম তাই দ্বিগুণ করেও কাতর হয় না।

যাক সে কথা। পাঁচিল পার হয়ে তো পিকিনে ঢুকলাম। পিকিন-মানুষের কথা পড়েছি—পাঁচ লক্ষ বছরের পুরানো কঙ্কাল। সেই কঙ্কালের সঙ্গে পাওয়া গেল পাথরের অস্ত্রশস্ত্র এবং অগ্নি-ব্যবহারের নিদর্শন। পিকিনের কিছু দূরে চৌকৌতিয়েন নামক জায়গায়। মানবিক সভ্যতা এবং চীনজাতি যে কত পুরানো—তার ধারণাতীত পরিচয় মিলল।

আদি শহর খৃস্ট-জন্মের সাড়ে-এগারো শ' বছর আগে তৈরি। তার পরে হাত-ফেরতা হয়েছে কত বার, কত রূপান্তরিত হয়েছে! নামও পালটেছে। রাজধানী এধারে-ওধারে সরেছে নানা শতাব্দীর রাষ্ট্র-বিপর্যয়ের সঙ্গে। মিলে মিশে সমস্ত এখন এক হয়েছে, পিকিন তাই এত বড়।

পাঁচিল ঘিরে তবু ঠেকানো যায় নি আততায়ীদের। এই সেদিনের ব্যাপার, ১৯০০ অব্দ। ইংরেজ, আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স, রুশ, জার্মেনি, ইটালি, অস্ট্রিয়া—আট জাত মিলে শহর লুঠ করল। জাপানিরা লড়াই চালাল এই জায়গায় ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ অবধি। আরও কত দুর্যোগ এমনি। অধি-বাসীরাও রুখে দাঁড়িয়েছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে। রক্ত দিয়েছে। বেদনা ও গৌরবের অপরূপ স্মৃতি-রঞ্জিত মহাপ্রাচীন নগর এই পিকিন।

টানা দেয়াল চলেছে রাস্তার এক দিকে। চলেছে তো চলেইছে।

কি ওটা? কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলাম।

নিষিদ্ধ শহর (Forbidden Ciy)। ওর মধ্যে অগণ্য প্রাসাদ, প্রমোদ-উদ্যান, কৃত্রিম পাহাড়, লেক—পৃথিবীর যাবতীয় নিসর্গ-বৈচিত্র্য সযত্নে বিরচিত হয়েছে। রাজারা থাকতেন, আর থাকত তাঁদের অগুন্তি পত্নী ও উপপত্নী। রাজার প্রাসাদধন্য ভাগ্যবতীরা প্রথম তারুণ্যে আমোদ-উৎসবের মধ্যে একদিন এই রহস্যপ্রাচীরের অন্তরালবর্তী হত, বাইরে আসা ঘটত না জীবনে আর কোন দিন। মরার পরেও নয়—ওরই মধ্যে গোরস্থান। আমাদের বনেদি বধূর একটু-খানি তবু সুবিধা, মড়া পোড়াবার বাবদে নদীকূলে নিয়ে আসে—খোলা হাওয়া গায়ে লাগে সেই সময়। চীনা রাজবধূদের মরেও ছাড়ান নেই। বিশ্বের যাবতীয় শোভা-সৌন্দর্যের নমুনা তাই নিষিদ্ধ শহরের ভিতরে। সুন্দরী ধরিত্রী দেখার সুখ করে নাও জায়গাটুকুর মধ্যে বিচরণ করে।

জনসাধারণ ঢুকতে পেতো নিষিদ্ধ শহরের বাইরের দিকে সামান্য দূর অবধি। পিকিন শহরের ভিতর দেয়াল-ঘেরা আর এক শহর।

আজকে দিন পালটেছে। অবাধ গতি সেখানে সকলের। মিউজিয়াম, লাইব্রেরি, সান-ইয়াত-সেন পার্ক, শ্রমিকদের আরাম-প্রাসাদ—অসংখ্য রকমের প্রতিষ্ঠান। নতুন-চীনের কলহাস্য মুখরিত সেকালের নিষিদ্ধ শহর।

বিচিত্র বৃহৎ ফটক। মাও-সে-তুঙের প্রকাণ্ড ছবি সেখানে। স্বর্গীয় শান্তির দ্বার (Gate of Heavenly Peace); চীনা নাম—তিয়েন-আন-মেন। পিকিনের কেন্দ্রভূমি। দেয়াল ফুঁড়ে পাঁচটা ফটক পাশাপাশি। ফটকের উপর-তলায় হল, সুপ্রশস্ত অলিন্দ। সামনে পরিখা, পরিখার বড় কবিত্বভরা নাম—সোনালি জলের নদী। মার্বেল পাথরের পাঁচটা সেতু পাঁচ দরজার সামনা-সামনি। লোহার খুঁটির উপর পাঁচতারার নিশান—মাও-সে-তুঙ ঐ নিশান টাঙিয়েছিলেন ১লা অক্টোবর, ১৯৪৯। আরও এক নতুন স্তম্ভ তৈরি হচ্ছে মুক্তি-সংগ্রামে যারা মারা গেল তাদের স্মৃতিতে।

সামনে পার্ক। এটাও ছিল নিষিদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে। রাজার দেহরক্ষীরা থাকত। এখন বিমুক্ত। বহু রক্তাক্ত ইতিহাস আছে এই জায়গার।

তিয়েন-আন-মেনে নতুন করে রঙ ধরাচ্ছে, ১লা অক্টোবর সমারোহ হবে, তার জন্য। ঐ বিশাল অলিন্দের ওপর দাঁড়াবেন নতুন-চীনের নায়কবৃন্দ—দাঁড়িয়ে জনগণের উল্লাস দেখবেন, অভিবাদন গ্রহণ করবেন।

আর অদূরে সাত-তলা আকাশচুম্বী অট্টালিকা—ঐ হল পিকিন-হোটেল। আমাদের জায়গা ওখানে।

ডক্টর কিচলু কোথায়—আমাদের দলপতি ?

হোটেলে পা দিয়েই খোঁজ করছি। বাতের ব্যথায় তিনি শয্যাশায়ী—ঘরে আছেন।

সুইচ টিপতে আলো জ্বলে ঘর বিভাসিত হল।

দূর থেকে দেখেছি তাঁকে কয়েক বার। আর আশৈশব জেনে এসেছি, অনেক উঁচুর মানুষ। পাঞ্জাব-কংগ্রেস বলতে সেকালে ছিল দু'টি মানুষ—সত্যপাল আর কিচলু। ইংরেজ তাঁদের গ্রেপ্তার করল (৯ই এপ্রিল, ১৯১৯); অমৃতসরে হরতাল—একটা বিড়ির দোকান অবধি খোলা নেই। বটে, ইংরেজের কামানে মরচে ধরে নি—মজা বোঝ তবে! ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের কুয়া ভরতি মড়ার গাদায়, রক্তের ধারায় তৃণভূমি রাঙা। তারপর আহিমাচল-কুমারিকা মেতে উঠল গান্ধিজীর নেতৃত্বে।

আইন-ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে কিচলু ঝাঁপিয়ে পড়লেন আন্দোলনে। যাবজ্জীবন কারাগার। কিন্তু আটকে রাখা গেল না অত কাল একটানা; জন-দাবিতে ছেড়ে দিতে হল। তা একবারে না হল তো ছয় বারে। দশ বছর জেলে কাটালেন মোটমাট। তারপর এলো পাকিস্তানের আন্দোলন। দেশ-বিভাগ তিনি স্বীকার করলেন না, তাই খুন করতে গেল। অমৃতসর থেকে তখন দিল্লিতে আস্তানা। সেখানে হাঙ্গামা তো কাশ্মীরে। প্রাণভয়ে মত বদলান নি, অর্থ ও নেতৃত্ব প্রলুব্ধ করেনি কখনো। সেই কিচলু। মানুষের হিতে অতন্দ্রিত-সাধনা। এতবার জেল, এত নির্যাতন! আত্মীয়, বন্ধু, সহকর্মী—প্রায় সকলে পরিত্যাগ করল—নিন্দা-লাঞ্ছনার অন্ত নেই—নির্বিকার ডক্টর কিচলু। যৌবন-প্রৌঢ়ত্ব থেকে একটিমাত্র পথ ধরে বার্ধক্যে উত্তীর্ণ হয়ে এলেন—কংগ্রেসের পথ।

ভারতের শান্তি-আন্দোলনে সকলের পুরোভাগে তিনি। নিঃসংশয়ে জেনে রেখেছেন, রাজনীতি-পঙ্কের উপর এই স্ফুট কমল। সকল মানুষ শান্তি ও সম্প্রীতিতে থাকবে, প্রভু বুদ্ধ থেকে মহাত্মা গান্ধি—একই জীবন-সাধনা সকলের।

বয়স ও শরীরের গ্লানি অবহেলা করে কিচলু চলে এসেছেন এতদূর এই পিকিনে। শয্যার উপর উঠে বসে সোল্লাসে বললেন, এসো, এসো—

এসো বাচ্চা—বলে আহ্বান করলেন। এমন ভাল লাগে কথার মাঝে 'মাই

চাইল্ড' আদরের সম্ভাষণ! তারুণ্য কবে পার হয়ে এসেছি, মা-বাপ ওপারে, এমন ডাক ডাকবার মানুষ কই? আজ সন্ধ্যায় সুদূর পিকিন শহরে কিচলুর কণ্ঠে যেন অতীত গুরুজনেরা কথা বলে উঠলেন।

পেরিনকে বললেন, লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি পথের উপরে—আর একজনের এদিকে যে ঘুম ছিল না!

কটাক্ষ হল রমেশচন্দ্রের দিকে। নবোঢ়া দু'টি ছেলেমেয়ে বিচ্ছেদের পর মিলিত হয়েছে—ভাবখানা এমনি। বৃহৎ কাজের ফাঁকে ফাঁকে স্নেহমধুর এমনি রহস্যালাপ চলে।

ঘুম নেই রমেশচন্দ্রের, কথাটা কিন্তু মিথ্যা নয়। সাঁইত্রিশটা দেশের প্রতিনিধি আসছেন আসন্ন সম্মেলনে—ইতিহাসে অশ্রুতপূর্ব। সেই দায়িত্ব কাঁধে চেপে রয়েছে, দু-চোখ এক হয়ে ঘুমোবার ভরসা পাবে কি করে?

আমার হাত জড়িয়ে ধরে কিচলু বলতে লাগলেন, তুমি বাঙালি—বাংলার মানুষ পেলে আমার বড় আনন্দ হয়। ভারতকে পথ দেখিয়েছে বাংলাদেশ।

সকলের মুখে একবার নজর বুলিয়ে বললেন, বাংলাই আমার রাজনীতিক অনুপ্রেরণা দিয়েছে। বাংলার কাছে ঋণের অন্ত নেই।

তাজ্জব লাগল। ঋণ অনেকেরই অনেক রকম থাকে, বেমালুম চেপে যাওয়াই তো রীতি। মলিন মুখে এক ব্যক্তি 'তা বটে! তা বটে!' গোছের হাসি হাসছেন। ভদ্রলোকের মনোবেদনা বুঝতে পারছি—কিন্তু মুখ চেপে ধরে দলপতিকে থামানো যায় বা কি করে?

প্রসঙ্গ পালটাল অবশেষে।

কিচলু বললেন, ভারতীয়দের সম্পর্কে সকলের বড্ড আশা। সব চেয়ে বড় দল আমাদের, সম্মেলনেও তেমনি কিন্তু বিশেষ স্থান নিতে হবে।

গোলমেলে কথা এসে পড়ছে—খাওয়া-দাওয়া, দেখাশুনো এবং আমোদ-স্ফূর্তি মাত্র নয়, পৃথিবীর সকল জাতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে দায়িত্বের কাজও করতে হবে অনেক কিছু।

সে যাক, পরের কথা পরে হবে। নমস্কার সেরে এইবার কেটে পড়া উচিত। খাওয়ার ঘরে যাই চলো, সময় হয়ে গেছে। কোন্ দিকে?

কি রকম খাবে, সেইটে ঠিক করো—

কি চাও? নৈকষ্য বিলাতি খানায় রুচি থাকে তো সাততলার উপর।

চক্ষু বুজে লিফটে উঠে পড়ো, সেখানে নিয়ে তুলবে। বিরাট ভোজনশালা, টেবিলগুলো সরিয়ে দিয়ে অক্লেশে ফুটবল খেলার গড়ের-মাঠ বানানো যায়। এমন ঘরেও না কুলায় তো পাশে আর একটি আছে। পানশালা ওদিকে— মাল টানো ও বিলিয়ার্ড খেলো। যতক্ষণ দমে কুলোয় খাও, এবং খেলে যাও— দাম দেবার হাঙ্গামা নেই। অথবা প্রশস্ত ফাঁকা ছাদের উপর দাঁড়িয়ে স্মরণাতীত কাল থেকে গড়ে-ওঠা সুপ্রাচীন নগর নিরীক্ষণ করো। রঙিন টালিতে ছাওয়া চৈনিক পদ্ধতির সংখ্যাতীত ঘরবাড়ি, মন্দিরের উঁচু চূড়া, পেই-হাই পার্কে তিব্বতী লামার সমাধির উপর আকাশভেদী চৈত্য আর হালফিলের ঐ একটি বৃহৎ ব্যাপার—পীস হোটেল। রাত্রিবেলা ছাদ থেকে ভারি বাহার পিকিন শহরের—আকাশের তারার মালা যেন চারিদিকে ছিটকে পড়েছে, মাটির উপরে ঝিকমিক করে তারা জ্বলছে।

চীনা মতে যদি খেতে যাও, নেমে পড়ো সর্বনিম্নতলে—সুপ্রশস্ত ড্রইং-রুম অতিক্রম করে। কোন বেলা কোথায় ইচ্ছা করবে, পূর্বাহ্নে কাউকে বলতে হবে না—কিছুই তোমার করণীয় নেই। যথা ইচ্ছা ঢুকে টেবিলে বসে পড়ো, হুকুম করো যত এবং যে রকম খুশি। খাওয়ার পরে একটা বিল নিয়ে আসবে— কিসের কত দাম কিছু তুমি জানো না। জানার প্রয়োজনও নেই। এক লক্ষ দেড় লক্ষ যা-হোক একটা অঙ্কপাত করে এনেছে—নীচে সই মেরে খালাস। নিজে না পারো, যে কেউ পেন্সিল নিয়ে একটু হিজিবিজি করে দিক।

এমন দরাজ ব্যবস্থা আমার দেশে কেন চালু হয় না রে! মহাশ্রদ্ধেয় মহাদেব-দার গল্প শুনেছি—খবরের কাগজে কাজ করতেন, সেই সুবাদে ডাইং-ক্লিনিঙেও মাংনা কাপড় কাচতেন। নয়তো—রোস বেটা, লিখব তোর নামে এক কলম। কিন্তু হোটেলে যদৃচ্ছা খেয়ে একটি মাত্র নাম-সইর ওয়াস্তা—এ ব্যাপার সম্ভবে সত্যযুগে। আর ঐ দেখে এলাম নতুন-চীনে।

কিন্তু কথাটা উঠল যা নিয়ে—এক বেলায় এক টেবিলে বসে এক লক্ষ দেড় লক্ষ ইয়ুয়ান উদরস্থ করছি। এর উপর শোনা গেল, সেক্রেটারি-জেনারেলের কাছে নগদ হাতখরচাও গুঁজে দিয়ে গেছে—প্রতি জনের দশ লক্ষ হিসাবে। কোন সুলগ্নে যাত্রা গো—চীনের মাটিতে পা দিতে না দিতেই (লক্ষপতি বলে গালি দেবেন না) অনেক লক্ষের অধিকারী। আমাদের দেশে হয়েছে যেন চড়ুইপাখির খড়কুটো-সংগ্রহ—দু-টাকা সাত আনা রোজগার, সাত সিকে খরচ; সারা জীবনে একত্র করলাম দু-শ' সাতান্ন টাকা চোদ্দ আনা তিন পাই। আর ওখানে দশ-বিশ হাজারের নিচে কথাই নেই। সওয়া মাসে যা খরচ করে এসেছি, ইনকামট্যাক্স-

কর্তাদের মাথা ঘুরে যাবে সেই টাকার অঙ্ক শুনলে।

হয়তো বাজারে যাচ্ছি কয়েক জনে মিলে খেয়ালমাফিক সওদা করতে।

এই যাঃ, মনিব্যাগ ফেলে এসেছি। টাকা বেশি আছে তোমার কাছে?

কোথায়! দু-আড়াই লাখ হবে বড় জোর—তাতে কি হবে? আড়াই লাখের বাজার ভদ্রলোকে আবার কি করবে! ক্ষুণ্ণ মনে ফিরতে হল অর্ধপথ থেকে।

দাম লিখে জিনিসের গায়ে সেঁটে রাখবার নিয়ম ও-দেশে—তার উপরে কানাকড়ির দরদস্তুর চলে না। ওয়ান-টু ইত্যাকার আন্তর্জাতিক সংখ্যায় লেখা দাম—দেশি বিদেশি কারো বুঝতে আটকায় না। আমিও এটা-ওটা কিনে এনেছিলাম বন্ধুবান্ধবদের জন্য। দামের কাগজ আঁটাই ছিল জিনিসের গায়ে, ছিঁড়ে ফেলতে যেন ভুলে গিয়েছি। বন্ধুরা চমকে ওঠেন—কি কাণ্ড, দশ হাজার এটার দাম? এত খরচ করে নিয়ে এলে?

প্রেম-গদগদ কণ্ঠে বলি, তা কি হবে—তুমি তো পর নও! চীনের একটা স্মরণ-চিহ্ন—জীবনে হয় তো আর যাবো না—টাকার মায়া করলে চলবে কেন?

চুপি-চুপি বলছি, দশ হাজারের ঐ মহার্ঘ বস্তুর আমাদের হিসাবে দাম দাঁড়িয়েছে দু-টাকা এক আনার মতো। আটচল্লিশ শ' চীনা ইয়ুয়ানে এক টাকা। কিন্তু চেপে যান—খবরদার, যেন চাউর হয়ে না পড়ে আমার বন্ধুজনের মধ্যে। পশার ভেস্তে যাবে।

চীন থেকে ফেরার মুখে সাংহাই ও ক্যান্টনে দু হাতে বাজার করছি। নিজে করছি, ওখানকার তরুণ বন্ধুরাও করে দিচ্ছেন। চীনা ইয়ুয়ান শেষ করে ফেলতে হবে। শেষ অবধি হাজার ছয়ে ঠেকে গেল। ওরা বলে, এতে আর কি-ই বা পাওয়া যাবে—রেখে দিন। হাজার দুয়েক ওর থেকে ঔদার্যবশে দিয়ে দিলাম ক্ষিতীশকে। হাজার চারেক আছে এখনো। অর্ধেক কিম্বা সিকি পরিমাণ টাকায় নিয়ে নিন না কেন (ভারতের টাকা অবশ্য)! কত সস্তায় যাচ্ছে—কিনবেন? আর কিনেছেন! বোকার মতো আগেই ফাঁস করে দিয়ে বসে আছি।

আমাদের তো এই। আগের খবর কিঞ্চিৎ শুনুন। সতীরঞ্জন সেনের কথা বলেছি—তাঁরা অনেক বেশি ভাগ্যবান। ১৯৪৭ অব্দে ভারত-গবর্নমেন্ট পাঠিয়েছিলেন তাঁদের। দশ জন ছাত্র গিয়ে পৌঁছলেন তো সাংহাইয়ে। হাত-

খরচা ইত্যাদির জন্য প্রত্যেকে দশটা করে টাকা দিলেন চীনা ইয়ুয়ানে ভাঙিয়ে আনবার জন্য। লোক গেছে তো গেছেই—অনেকক্ষণ পরে রিক্সায় ফিরে এল বিশাল এক বস্তা নিয়ে। বস্তাবন্দি নোট। কাঁধে বয়ে আনতে পারেনি, রিক্সা করে আনতে হল। বস্তা খুলে সর্বাগ্রে রিক্সা ভাড়া তো চুকিয়ে দিলেন কোটি-খানেক। তার পরে ঐ নোটের গাদা গুণে মিলিয়ে নেওয়া। সে কি বিপদ! দশ জনে ভাগে ভাগে গুণছেন—কোটি কোটির ব্যাপার—প্রতি বারে আলাদা এক এক রকম হয়। ঘণ্টা কয়েক ধস্তাধস্তি করে তাঁরা হাল ছেড়ে দিলেন। ব্যাঙ্ক থেকে যা লিখে দিয়েছে, তাই ধরে নেওয়া গেল। আমাদের অতটা ভাগ্য হয়নি। কোটি কোটি নয়, তবে কোটির কাছাকাছি নাড়াচাড়া করে এসেছি বটে!

গালগল্প বলে ঠেকছে। কিন্তু সতীরঞ্জনের মুখে স্বকর্ণে শুনে তবে লিখছি। আন্দাজ করুন অবস্থার ভয়াবহতা। সাধারণের ক্রয়শক্তি একেবারে লোপ পেয়েছে—কিনতে পারে, আঙুলে গণা যায় এমনি কয়েকটি ভাগ্যবান। আর খরচ চালাবার জন্য সরকারি ছাপাখানায় দেদার নোট ছেপে যাচ্ছে। গতিক এমনি, ছেলেপেলে হাতের লেখার কাগজ পায় না, নোট ছাপানোয় কাগজের এমনি টান পড়েছে। নতুন-চীন খতিয়ে দেখেছে, কুয়োমিনটাং যুদ্ধপূর্ব আমলের চেয়ে ১,৭৬৮,০০০,০০০,০০০ গুণ বেশি নোট চালু করে গেছে। তাড়া খেয়ে পালিয়ে যাবার মুখেও তারা বগল বাজাচ্ছিল, বিজীর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর ক'দিন চলবে গণতন্ত্রী সরকার? মাও-সে-তুঙকেও পাততাড়ি গুটোতে হবে।

সতীরঞ্জনেরই আর একটা গল্প। ওঁরা পিকিনে তখন। কুয়োমিনটাঙের টলমল অবস্থা—মুক্তি-সৈন্য আসছে ঝড়ের বেগে। পাওয়ার-হাউসে বিশৃঙ্খলা —বিদ্যুৎ-সরবরাহ যে কোন মুহূর্তে বন্ধ হবে। সতীরঞ্জন গিয়েছেন দুর্দিনের জন্য এক টিন কেরোসিন কিনে রাখবেন বলে। এক দোকানে দর নিলেন। যাচাই করতে তারপর আর এক দোকানে গিয়ে দেখলেন, সেখানকার দর অনেক বেশি। প্রথম দোকানে এলেন আবার। এবার এরা যে দর হাঁকল, সেটা দ্বিতীয় দোকানকে ছাড়িয়ে গেল।

আধ ঘণ্টাও হয়নি মশায়, তখন যে এই দাম বলেছিলেন—

দোকানি বলল, কিনতে হয় তো এক্ষুণি নিয়ে যান। সাড়ে-দশটায় এখন এই দর। দশ মিনিট পরে শুনবেন আর এক রকম।

এমনি কাণ্ড। চীনা মুদ্রার উপর লোকের এক তিল আস্থা নেই। হেন ইনফ্লেশন পৃথিবীর কোন রাজ্যে কখনো ঘটেনি। এক গৃহস্থের কথা শুনলাম।

ভদ্রলোক মিতব্যয়ী। কায়ক্লেশে খরচাপত্র চালিয়ে যৎসামান্য সঞ্চয় করে এসেছেন বছর বছর। বুড়ো হয়ে পড়েছেন, জীবনের বাকি কয়টা দিন পুঁজি ভেঙে ভেঙে খাবেন। কুয়োমিনটাঙের শেষ সময় তখন। মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন তিনি। হিসেব করে দেখা গেল, সারা জীবনের সঞ্চয় একটা মুরগির আণ্ডা কিনতেই খতম হয়ে যায়। আজকে বিলকুল সামলে নিয়েছে। সামলাতে পেরেছে, তাই চীন বেঁচে গেল। আর এত বড় অসাধ্য-সাধন যারা করতে পারে, তামাম বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জোট পাকিয়েও তাদের মারতে পারবে না।

ইনফ্লেশন দমনের পদ্ধতি শুনুন তবে কিছু কিছু। সে আমলের যা হয়েছিল, আর এঁরা যা করেছেন। অবস্থা এমন, মাইনে হাতে পাওয়া মাত্রই লোকে জিনিস কিনে ফেলবে। দরকারে লাগবে কিনা, সে বিবেচনা করতে গেলে হবে না। চাল মিলল না তো কিনে ফেলুন বিশ গ্রোস ইস্ক্রুপ, নয় তো কাপড়-কাচা সাবান দু-পেটি। মোটের উপর টাকা হাতে রাখবেন না—তাহলে সর্বনাশ—হু-হু করে নেমে যাচ্ছে টাকার ক্রয়মূল্য। কাল হয়তো দেখবেন, সাবান এক পেটি মাত্র পাওয়া যাচ্ছে ঐ টাকায়।

অথবা কিনে রাখুন সোনা-রুপো। রুপোর মুদ্রা বাজারে নেই, মানুষে সিন্দুকে পুরেছে। কালে ভদ্রে দুটো-পাঁচটা বেরুলো তো তার পিলে-চমকানো দর। বাজারে যা সগৌরবে চলছে সে হল আমেরিকান ডলার। নামে চীন দেশ এবং স্বাধীনও বটে, কিন্তু টাকার বাজারে আধিপত্য আমেরিকার। এক্সচেঞ্জের একটা সরকারি হার নির্দিষ্ট আছে—কিন্তু সে হল ঐ পাঠ্য বইয়ে থাকে 'সদা সত্য কথা কহিবে' তারই মতন এক নীতিকথা। কেউ মানে না, জানেও না বড় বেশি লোকে। আমেরিকান ডলারও কাগজ বটে—কিন্তু তার অশেষ ইজ্জত, রীতিমতো দরদস্তুর করে কিনতে হয় সে বস্তু। শহরে গ্রামে সর্বত্র তাই সংখ্যাতীত মজুতদার। সাধারণের দুঃখকষ্ট সীমাহীন হয়ে পড়ল। ব্যাঙ্ক অথবা জাতীয় ধনাগারে লক্ষ্মী নয়—তাঁর পেঁচার বসতি। পেঁচার স্তূপীকৃত ঝরা-পাখনা—ছাপা-নোটের হিমালয় পর্বত।

তেড়ে ফুড়ে কুয়োমিনটাং আইন করল, সোনারুপো আটকে রাখা বে-আইনি—ভিন দেশের মুদ্রাও চলবে না। ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দাও। এ আইন অমান্য করা দেশদ্রোহিতা—চরম দণ্ড হবে অপরাধীর।

কা কস্য পরিবেদনা! বাজার এত গরম—কে যাচ্ছে ঐ সরকারি বাঁধা দামে জমা দিতে? ফাঁসিতেও লটকানো হল দু-একটাকে। কিছুতে কিছু হয় না। শুধু আইনে দায় খালাস হয় না, আইন লোকে মানতে পারে এমন অবস্থার সৃষ্টি

করতে হয়। সোনা-রূপো এবং আমেরিকান ডলার ভাঙিয়ে ধরুন বিশ কোটি ইয়ুয়ান নিয়ে এলাম। সেই বিশকোটি আগামী কাল তো বিশ লক্ষের দামে নেমে যাবে। তখন?

নতুন-চীনের পদ্ধতি শুনুন এবার। সোনা-রূপো এবং আমেরিকান ডলার সরকারি ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দাও। ব্যাঙ্কের দর দেওয়া হল কালোবাজারের চেয়ে কিছু বেশিই। একটা জিনিস তবু বাকি থেকে যায়। আজকে আমার নামে যে পরিমাণ চীনা ইয়ুয়ান জমা পড়ল, কাল যদি তার দাম কমে যায়? অর্থাৎ জিনিসপত্রের দাম চড়ে, কম জিনিস পাওয়া যায় ঐ মুদ্রায়? সে ব্যবস্থাও হল। জমা দেবার সময় টাকার অঙ্কের পাশে ঐ তারিখের চাল-কাপড়-তেলের দামও লেখা রইল। ব্যাংক থেকে যেদিন টাকা তুলবে, জিনিসের দর যদি ডবল হয়ে থাকে, তোমার জমা টাকাও ডবল হয়ে গেছে, এই রকম গণ্য হবে। তার উপরে নিয়মমাফিক সুদ তো আছেই।

মাসের পর মাস চলল এই নিয়মে। কালোবাজার অচল। লোকের অবস্থা ফিরে এলো জাতীয় অর্থনীতির উপর। নতুন-চীন ইনফ্লেশন পুরোপুরি সামলে নিয়েছে, দরের এখন উঠানামা নেই। কনট্রোলের আবশ্যক নেই কোনখানে। সেদিনের পরম দুর্গতির একটুখানি স্মরণচিহ্ন রয়েছে—নোটের উপর ছাপা মোটা মোটা অঙ্ক। ব্যস, আর কিছু নয়।

সতীরঞ্জন প্রভৃতির কাছে শোনা কাহিনী। সুনিশ্চিত ধ্বংস থেকে জাতি বেঁচে গেল এমনি নানা কৌশল ও বিচক্ষণতায়। শাপে বর হল। সোনা-রূপো আটক পড়ে গিয়ে, এবং বিদেশি মুদ্রা চালু হয়ে একদা চীনের সর্বনাশ ঘটাচ্ছিল—এখন সমস্ত গবর্নমেন্টের হাতে এসে গেছে। বাইরের বাজারে নতুন-চীনের তাই ইজ্জত হয়েছে। দেশ-পরিগঠনের জন্যে বিদেশি যন্ত্রপাতি ও মালপত্র কিনবার কোন রকম আর দারিদ্র নেই।

কিন্তু কি কথায় কতদূর এসে পড়লাম! দু-লাখ পাঁচ-লাখ অহরহ পকেটে নিয়ে ঘুরেছি—আর এখন? কাজ নেই, গুমর ফাঁক হয়ে যাবে।

(৯)

পিকিনের সেই প্রথম সন্ধ্যা। শ্যাম রাখি না কুল রাখি—অর্থাৎ সাত তলার উপর বিলাতি মতে অথবা একতলায় চীনা পদ্ধতিতে সেবা গ্রহণ করব, সে

সমস্যা আজকের দিনটা নয়। নতুন এসেছি, অতএব নিয়মমাফিক ভোজ খেতে হল। ভোজ-পর্ব সমাধা করে বেরিয়ে পড়লাম ক'জনে।

হোটেলের প্রাঙ্গণে কত যে মোটর, তার সীমাসংখ্যা নেই। মোটরের সংখ্যা কমই এখানে। একজনে রসিকতা করে বললেন, যে ক'টা আছে সব বুঝি অতিথি-পরিচর্যায় এনে মজুত করেছে!

জন চার-পাঁচ হাঁ হাঁ করে এসে পড়ল।

যাবেন কোথাও?

উঁহু, এই সামনের দিকে একটুখানি পায়চারি করছি।

এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে ফাঁক বুঝে একসময় রাস্তায় নেমে পড়লাম। হাঁটতে চাই। কিন্তু টের পেলাম রক্ষা নেই, মোটরের ব্যূহে ঘিরে ফেলবে।

একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বেশ ঠান্ডা। খান তিন-চার-বাড়ির পরে অপেরা-হাউস। উঁকিঝুঁকি দিচ্ছি সেখানে। কর্মচারী একজন দরজা আটকে কি বলল।

জানি রে বাপু, টিকিট না হলে ঢোকা যায় না। ঢুকে বসবার মন-মেজাজ এখন নেই। রাতের পিকিন দেখে বেড়াব।

এক ভদ্রলোক, দেখি তাড়া করেছেন আমাদের। নতুন জায়গা, গতিক বুঝি নে—কোন রকম দোষ-ঘাট হল নাকি? ইংরেজি বলেন তিনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলার মতো। আমাদেরই সমগোত্রীয়, শুনে অতএব উল্লাস বোধ করি।

টিকিট চেয়েছিল আপনাদের কাছে। ঐটে নিয়ম কি না! তা আসুন আপনারা—টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

আজকে দেখব না—

সকরুণ মিনতি করে তিনি বলেন, বিলক্ষণ! আমাদের দোরগোড়া অবধি এলেন—সে কি হয় কখনো?

মাপ করুন, আর হবে না এমনটি। কেও-কেটা ব্যক্তি এখন, বুঝতে পেরেছি। চলাফেরা অতঃপর মাপজোপ করে হবে।

অনেক কষ্টে হাত ছাড়ানো গেল। দোকান-পাট বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু দরজা খোলা। ১লা অক্টোবর জাতীয় উৎসব—তিন বছর আগে মাও-সে-তুং ঐ দিন মুক্তির পতাকা তুলেছিলেন, নিপীড়িত চীন সকল কালিমা মুছে পাঁচ-তারার আলোয় মাথা তুলে দাঁড়াল। সেই আয়োজনের ধুম লেগেছে। মানুষ জন মহাব্যস্ত। আমাদের অবোধ্য চীনা-অক্ষরে কত কি লিখছে কাপড়ের উপর, পিচবোর্ড কেটে তার উপর রং করে হাজার হাজার শান্তির কপোত বানাচ্ছে।

নানা রঙের কাগজ কেটে স্তূপীকৃত করছে, ফুল হবে নানান রকমের। উৎসব-দিনের অনেক বাকি, কিন্তু মানুষ মেতে উঠেছে এখন থেকেই।

এক ঘরে তিন জন আমরা—আমি, ক্ষিতীশ আর মীরাটের এক জাঁদরেল উকিল ব্রজরাজ কিশোর। উকিল বাবুটি ফর্শা লম্বা, মাথায় টাক—চোস্ত ইংরেজি বলেন। দু-জনের ঘরে কিছু অতিরিক্ত আসবাব ঢুকিয়ে তিনের জায়গা হয়েছে। কি করবে, নতুন তৈরি শান্তি-হোটেলও ভরাট হয়ে গেছে—এত অতিথির জায়গা কোথা ? জানলার কাছে নিরিবিলি দিকটা আমি দখল করে নিলাম। জানালা হলেও—ওদিকের ঘরে আটকা—আলো বড়-একটা আসে না। হোটেলের সব চেয়ে খারাপ ঘর—সেইটেই আমাদের কপালে পড়ে গেল।

তা হোক, ঘাবড়াবার কি আছে, ঘরে থাকি আর কতটুকু ? ওখানে চলো, এটা দেখ, ঐ কনফারেন্সে যাও—লেগেই আছে একটা-না-একটা। আমি এসেছি নতুন-চীন দেখতে—এই কম সময়ের মধ্যে দেখে-শুনে যথাসম্ভব আলাপ-পরিচয় করে যাবো। হাত-পা মেলে জিরোতে এবং খেতে যাঁরা এসেছেন, উৎকৃষ্ট ঘরে বহাল-তবিয়তে শুয়ে শুয়ে তাঁরা আরাম করুন গে।

ঘরের সুখটা শুনুন এবারে। শয্যার পাশে ফোন। শুয়ে-শুয়েই তামাম পিকিন শহরের সঙ্গে মোলাকাত করুন। শিয়রে সুইচ—শীতের দেশে পাখার চল নেই—এন্তার আলো জ্বালুন আর আলো নেবান। আর আছে বোতাম সুইচের পাশে। বোতামে আঙুল ছোঁয়ানো মাত্র দরজায় টোকা পড়বে, মৃদু কণ্ঠস্বর শুনতে পাবেন, আসতে পারি ?

তার পরে যা খুশি লোকটাকে ফরমাশ করুন আকাশের চাঁদ, বাঘের দুধ—এই জাতীয় কয়েকটা বস্তু বাদ দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে এনে হাজির করবে। সূচ-সূতা-বোতাম আঠা-খাম-কাগজ ইস্তক সাণ্ডুইচ-কফি-আইসক্রিম—রাত দুপুরে মুরগির কাটলেট অবধি। সোফা ও নিচু-টেবিল ঘরের কেন্দ্রদেশে। সেই টেবিল অহরহ, দেখবেন, ফলের গাদা নানা জাতীয় কেক চকোলেট সিগারেট ইত্যাদি। অব্যবহারে বাসি হয়ে গেল তো বদল করে আবার টাটকা এনে দিচ্ছে। এক রকম আঙুর—রক্তাভ রং, সুমিষ্ট ও চমৎকার গন্ধ, টকের লেশমাত্র নেই। উত্তর-চীনের কোন কোন অংশে ফলে। ঐ আঙুর এক চালান এসেছিল হোটেলে। তার পরে আর কোন আঙুর মুখে রোচে না। ঐ লাল আঙুর যদি আনতে পারো বাপু, তা হলে গোটা কয়েক দাঁতে কাটতে পারি।

শোনা মাত্র শশব্যস্তে বেরিয়ে যায়। সে কালের বর্ষীয়সীরা গুরুঠাকুর সম্পর্কে এমনি তটস্থ হতেন জানি—গুরু চটলে পরকালের দরজায় তালা পড়বে। এখানে প্রায় তাই। অতিথি আমরা, শান্তি-সৈনিক—সর্বোপরি ভারতীয়। ত্র্যহস্পর্শ ঘটেছে। খুঁজে খুঁজে অতএব থোলো দুই লাল আঙুর জোগাড় করে আনল। কাতর হয়ে বলে, আর মিলছে না এখন। কালকে দিনমানে...

কত যেন অপরাধ করে বসেছে, লজ্জার সীমা-পরিসীমা নেই—মুখচোখের ভাব এমনিধারা। অতএব ক্ষমা করে ফেলে ঐ দু-থোলো অর্থাৎ আধসের খানেক আঙুরে মুখশুদ্ধি করে নেওয়া যাক, কি বলেন? রাগ করে থাকাটা কিছু নয়।

হোটেলের এই কর্মীদের সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে, সত্যি, শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে। চাকর বলতে সরম লাগে—নতুন-চীন পরিগঠনে তারাও মহা-কর্মী। আর বাড়িয়ে বলছি নে—আপনার আমার চেয়ে ঢের ঢের উঁচু দরের মানুষ। নানা দেশবাসী ও নানান মেজাজের অতগুলো অতিথির কি সেবাই করেছে! হাসি ছাড়া মুখ দেখিনি কখনো। যেন ওরা আঁধার মুখ করতে জানে না।

সকালবেলা ঘর থেকে বেরিয়ে করিডর অতিক্রম করে লিফ্‌টে যাচ্ছি। হাসি-মুখের অভিবাদন আসছে এদিক-ওদিক থেকে। লিফ্‌টম্যান প্রসন্ন হাস্যে বলে, গুড মর্নিং। দূর-আকাশে সূর্য হাসছে, এদের মুখেও সেই ঝিকিমিকি।

ঐ যে বললাম—বিশ্রাম ছিল না একটুও। সারা দিনমান এবং রাত দুপুর অবধি এটা-ওটা লেগেই আছে। ঠাসা প্রোগ্রাম—তুরকি-নাচন নাচিয়ে ছাড়ছে। বঙ্গদেশের কিঞ্চিৎ আয়েশি মানুষ আমরা, হতভাগারা বুঝবে না তা কিছুতে। চল্লিশটা দিনে চল্লিশ মাসের দেখা দেখিয়ে দিয়েছে। ছিমছাম থাকা বরদাস্ত করতে পারিনে—কেমন যেন পালিশ-করা কাঠের পুতুলের মতো মনে হয় নিজেকে। জামা-কাপড় বই-কাগজ বিছানা-পত্র মহানন্দে হাণ্ডুল-পাণ্ডুল করব, নইলে জীবন-ধারণের সুখ কি? ঘর ছেড়ে যখন বাইরে চলে যাই, মনে হবে—গজ-কচ্ছপের লড়াই হয়ে গেছে এইখানে একটু আগে। মনিব্যাগ এবং বিশ-ত্রিশ-চল্লিশ হাজারের নোটও ছড়িয়ে রয়েছে অনেকদিন। ফিরে এসে অবাক হয়ে যেতাম। যেন পাল্লা চলেছে—আমরা কত ছড়াতে পারি, আর ওরা কত

গোছাতে পারে! কত যে ফুলের তোড়া পেতাম—একটা ছাগল থাকলে খেয়ে খেয়ে মুটিয়ে স্বচ্ছন্দে মোষ হতে পারত। অবহেলার সেই সব ফুলের তোড়া, ওরা করত কি—কোত্থেকে ফুলদানি জোগাড় করে টেবিলের উপর পরম যত্নে সাজিয়ে রেখে দিত। বিছানায় সদ্য-পাটভাঙা চাদর, বাথরুমে নতুন সাবান, নতুন একদফা তোয়ালে। কতক্ষণ ছিলাম না—সযত্ন পরিমার্জনায় ঘরের যেন নতুন রূপ খুলে দিয়েছে!

বিদেশি মানুষগুলো কয়েকটা দিন ছিল তোমাদের আশ্রয়ে। আর কোন-দিন দেখা হবে না জীবনে। এমন করে আপন করে নিলে, এত দূরে বসে আজ নিশিরাত্রে এই কাহিনী লিখতে লিখতে মন স্নেহসিক্ত হয়ে উঠছে...

যেদিন পিকিন-হোটেল ছেড়ে চলে যাব, সকলে উসখুস করছি—কি দেওয়া যায় ওদের? কয়েক লক্ষ ইয়ুয়ান কিম্বা ভারত থেকে নিয়ে-যাওয়া কোন জিনিস? উঁহু—কিছুই নয়, ওতে নাকি নীতিহীনতা দেখা দিতে পারে, প্রাপ্তির লোভে সেবার হয়তো মানুষ বিশেষে কম-বেশি হবে ভবিষ্যতে। আর ওরাও প্রত্যাশা করে না। দিয়ে দেখুন, স্পর্শ করবে না উপহারের জিনিস—কথায় বোঝাতে পারে না তো, এক অদ্ভুত ধরনের হাসি হাসবে।

অথচ—পিছিয়ে যান দিকি কয়েকটা বছর—ঐ চীনেরই রণক্ষেত্রে সৈন্য আহত হয়ে আর্তনাদ করছে, বিনা বকশিসে কেউ তাকে ছোঁবে না। ছুটছে—যে-লোকের কাছে মোটা রকম প্রত্যাশা আছে। এ আমার মনগড়া কথা নয়—শতেক দৃষ্টান্ত রয়েছে, ছাপা বইয়েও রয়েছে এবম্বিধ বিস্তর কাহিনী। আর পশ্চিম ইউরোপীয় অঞ্চলে একটু দৃষ্টিপাত করুন—এবং তাদের তল্পিবাহক আমাদের দেশি হোটেলগুলোর দিকেও। এক টাকা খাওয়ার চার্জ ধরল তো টীপস লাগবে অন্যূন অষ্টগণ্ডা।

না—নতুন-চীনে এ সমস্ত একেবারে নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু ভালবাসা, হাতে-হাতে স্নেহস্পর্শ, আলিঙ্গন? তাদের এক-একজনকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে আমরা ঋণ স্বীকার করে এসেছি।

(১০)

প্রাতরাশের পর চিঠিপত্র লেখা শেষ করতে দশটা। আমাদের জন্য আলাদা পোস্টাপিস বসিয়েছে নিচের তলায় ড্রয়িং-রুমের এক পাশে। গাদা গাদা

কাগজ-খাম ঘরের টেবিলে। তাতে না কুলায়, পোস্টাপিসে এসে হাত পাতলে যত খুশি পেয়ে যাবেন। দেদার লিখে যান—যদৃচ্ছা লিখে দিয়ে দিন পোস্টাপিস-ওয়ালাদের কাছে, মালপত্র পাঠাতে পারেন দু-সেরি পাঁচ-সেরি প্যাকেট বেঁধে বেঁধে। হিজিবিজি-লেখা একটা স্লিপ ওঁরা এগিয়ে দেবেন, খানাঘরের মতন এখানেও স্লিপের উপর সই মেরে ছুটি। তারও করা যায়—খরচ পড়ে শুনলাম কথা প্রতি টাকা পাঁচেক (ভারতীয় টাকা, ওঁদের ইয়ুয়ান নয়)। তা সে যা-ই লাগুক, সে টাকাও গৌরী সেনের—অতএব আমাদের কি ভাবনা? কেব্‌ল্‌ (cable) করছেনও অনেকে, খবরাখবর পাঠাচ্ছেন। প্রেমপত্রাদি ছাড়ছেন না বোধহয়। ছাড়লেও ও-তরফ থেকে আপত্তি হবে না, চক্ষু বুজে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু অতিথিদের আক্কেল-বিবেচনা আছে তো!

দশটা বেজে গেল। বেরুনো হবে এবার। বাস অপেক্ষামান। দোভাষি ছেলেমেয়েরা ভাগ করে নিয়েছে কারা সামলাবে কোন দলকে। নতুন বয়স—অফুরন্ত তাদের অধ্যবসায়, সময় মতো ঠিক নিয়ে বের করবে। সময় মেপে প্রতিটি কাজ—প্রোগ্রামের একটু এদিক-ওদিক হতে দেবে না। সাগর-পাহাড় পার-হয়ে-আসা অবোধ মানুষগুলোর গার্জেন হয়ে পড়ে স্ফূর্তির আর অবধি নেই। এটা দেখায়, ওটা বোঝায়—নিজেরা যা বোঝে না, তা-ও বোঝাতে ছাড়ে না।

এ কোথায়—তোমাদের কেমনধারা য়ুনিভার্সিটি গো?

সংকীর্ণ লোহার গেট পার হয়ে এসে বাস ভিতরের প্রাঙ্গণে ঢুকল—যেন জেলের মধ্যে এনে পুরেছে। ব্যাপার তাই বটে! চিয়াং-কাই-শেকের আমলে কম্যান্ডার-ইন-চীফ থাকত এখানে, আর তার প্রধান দলবল। তাই এত উঁচু পাঁচিল—এমন উদ্ধত লৌহদ্বার। বড় এক পুকুর—বরফ-পড়া রাত্রে কত কম্যুনিস্টকে ঐ পুকুরে চুবিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করেছে!

হেসে হেসে দেখাচ্ছে আমায় সুইং-ইঞ-মিং। নতুন গ্রাজুয়েট হয়েছে মেয়েটা—গোলালো মুখ, চোখে নিকেলের চশমা, মিষ্টি হাসে কথায় কথায়। আজকে নবীন কালের ছেলেমেয়ের হাস্যোল্লাসে পুরানো কলঙ্ক ধুয়ে মুছে গেছে। এ যেন আর এক জায়গা, এরা সব আর এক মানুষ।

পিপল্‌স্‌ য়ুনিভার্সিটি। শুধু কেতাবি বিদ্যা নয়, দেশ গড়ে তোলার শিক্ষা দেওয়া হয় এখানে। ফ্যাক্টরিতে কাজ করছ, কৃতিত্ব দেখাচ্ছ কোন এক

বিষয়ে—এসে থেকে যাও এখানে মাস তিনেক। খুব ভাল করে শিখে যাও তোমার সেই জিনিসটা। বছরে এমনি এসে এসে পাকাপোক্ত কর্মী হয়ে যায়। মাইনেপত্তোর দেয় ফ্যাক্টরি থেকে।

আনকোরা প্রতিষ্ঠান—১৯৫০ অব্দে তৈরি। কলকাতা পুরাতন ইলিসিয়াম রো'র বাড়িটায় গান্ধি-আশ্রম প্রতিষ্ঠা হলে যা হত—সেই ব্যাপার আর কি! ইস্কুল, নার্সারি-ইস্কুল, কলেজ, য়ুনিভার্সিটিতে সারা দেশ ছেয়ে দিচ্ছে এরা এই নতুন আমলে। এক পিকিন শহরেই গোটা চারেক য়ুনিভার্সিটির খবর পেলাম।

লম্বা টেবিলের এদিকে-ওদিকে সকলে বসেছি। য়ুনিভার্সিটির কর্তারা আছেন। আছেন কয়েক জন শ্রমিক-বীর—ফ্যাক্টরির কাজে দেশের ধনোৎপাদনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে চ্যান্সেলার, ভাইস-চ্যান্সেলার প্রভৃতির সমতুল্য আসন ঐ বীরবর্গের। চা ইত্যাদি যথারীতি সম্মুখ ভাগে। পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এক-একজন উঠে দাঁড়াই, সেক্রেটারি নাম-ধাম ও ক্রিয়াকর্ম শুনিয়ে দেন। আর হাততালি।

একটি ভারতীয় মেয়ে—চক্রেশ জৈন। আমাদের দলের সে নয়, পিকিনে থাকে। বাপ জগদীশ জৈন পিকিন-বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দির অধ্যাপক। ভারত থেকে অধ্যাপক মশায়কে নিয়ে গেছে। মেয়ে গেছে বাপের সঙ্গে। সে-ও হিন্দি পড়ায়, আর বাপের খবরদারি করে। দূর বিদেশে অধ্যাপক জৈনের মা হয়ে বসেছে।

জৈনকে চিনলেন তো? সে-আমলে কাগজে পড়েছিলেন, বেশ খানিকটা হৈ-চৈ হয়েছিল ব্যাপারটা নিয়ে। গান্ধিজীকে হত্যার ষড়যন্ত্র দৈবক্রমে ইনি কিছু জানতে পারেন। পুলিশকে জানিয়েওছিলেন সে কথা। পুলিশ তেমন আমলের মধ্যে আনেনি, এত বড় সর্বনাশ ঘটে গেল তাই। এই নিয়ে অধ্যাপক জৈন বই লিখেছিলেন, আই কুড নট সেভ বাপুজি—বাপুকে বাঁচাতে পারলাম না।

এতগুলো দেশের মানুষ পেয়ে বর্তে গেছে চক্রেশ। চোখে-মুখে কথা বলে মেয়েটা—কথার তুবড়ি ফোটাচ্ছে। মাস ছয়েক ধরে জমে-ওঠা সমস্ত কথা এক-সঙ্গে বলে ফেলতে চায়। ইংরেজি বলছে সুপ্রচুর, চীনা বলে, হিন্দীও বলছে। আর ছটফটে এমন—একটা মিনিট স্থির হয়ে বসা তার কুষ্ঠিতে লেখে না।

নিয়মমাফিক বক্তৃতা দিয়ে শুরু। চ্যান্সেলার সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক—লিখিত-বক্তৃতায় ঢালাও ধন্যবাদ দিলেন সকলকে। বললেন নতুন য়ুনিভার্সিটি-স্থাপনার যাবতীয় ইতিহাস ও কাজকর্মের কথা। তার পরে ভাইস-চ্যান্সেলার।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন আমাদের তরফ থেকে। কত ছাত্র, কতগুলো ক্লাস, শিক্ষণীয় বিষয় কি কি ? তাবৎ ব্যবস্থা বুঝে নিতে চাই ঐ এক চেয়ারে বসে বসে।

এবারে নিয়ে চললেন একজিবিসন-ঘরে। নতুন-চীনের কর্মোৎসাহের পরিচয় থরে থরে সাজানো। একটা ঘরে চীন-বিপ্লবের জ্বলন্ত ও সুবিস্তৃত ইতিহাস। দরজা দিয়ে ঢুকে পায়ে পায়ে এগোচ্ছি, এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়। কত ছবি, কাহিনী, কত রকমের কাগজপত্র! মুক্তি-ফৌজ ঝোড়ো রাতে নিঃসীম নদী পার হয়ে যাচ্ছে—তার ভয়াবহ ছবি। যে শহীদেরা প্রাণ দিল তাদের কতজনের ছবি, টুকিটাকি তাদের ব্যবহারের জিনিসপত্র। এ সমস্ত অভিভূত করে আমাকে, আমাদের সর্বত্যাগী ছেলে-মেয়েদের কথা পাশাপাশি মনে পড়ে যায়।

ভারতীয় দলের পরামর্শ-সভা বিকালবেলা। এ সভা লেগেই আছে—পথের কষ্টে কাল বড় ক্লান্ত ছিলাম, আমাদের ক'জনকে রেহাই দিয়েছিল তাই। হোটেলের প্রশস্ত একটা ঘরে একসঙ্গে মিলেছি।

শান্তি-সম্মেলন পঁচিশে অর্থাৎ আগামী কাল থেকে বসবার কথা। ক'দিন চলবার পরে ১লা অক্টোবর বন্ধ থাকত ওদের জাতীয় উৎসবের দরুন। উৎসব অন্তে আবার চলত।

বানচাল হচ্ছে এই ব্যবস্থা। কত দেশের কত মানুষ একত্র জমবে—বহু জনে এখনো পথে পড়ে, এসে পেঁছিতে পারেনি। আসছে তারা অনেক কষ্ট করে। কাছাকাছি এই জাপানের কথা ধরুন। ছাড়পত্র অনেকেরই ভাগ্যে হয়নি, কয়েক জনে শুধু পেয়েছে। মানুষগুলোও নাছোড়বান্দা—সমুদ্রটুকুর ও-পারে অপরূপ আনন্দ-সমাবেশ—ছাড়পত্র দিলে না, তা বলে কি পড়ে থাকবে দ্বীপের চৌহদ্দির মধ্যে? সমুদ্র সাঁতরে পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়—কি কৌশলে বন্দুক-বেয়নেটের সতর্ক পাহারা এড়িয়ে এ-তটে এসে পেঁছিবে, খোদায় মালুম। গবর্নমেন্ট খুব নাকি তড়পাচ্ছে—দেশে ফিরতে হবে না? দেখে নেবে আবার ওদের যখন খপ্পরের মধ্যে পাবে।

আরও আসছে—বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েটনাম, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা অঞ্চল থেকে। আগে তো ভাবা যায়নি, শান্তি-সম্মেলনের মতো এমন নিরীহ অনুষ্ঠান সম্পর্কেও কর্তাদের এতখানি দ্বিধা-সন্দেহ। পথ তবু কিছুতে রুখতে পারল না—আসছে তারা, এসে পড়ল বলে। নদী-সমুদ্র পাহাড়-জঙ্গল

পার হয়ে পায়ে হেঁটে আসছে—তারিখ মতো তাই এসে পেঁছিতে পারছে না। ছাড়পত্রধারী ভাগ্যবানদের মারফতে খবর পাঠিয়েছে—যাচ্ছি গো, সবুর করো কয়েকটা দিন ভাই। এত কষ্টে হাজির হয়ে শেষটা না দেখতে হয়, শলা-পরামর্শ অন্তে যে যার কোটে ফিরে গেছে।

তাই তারিখ পেছুল। জাতীয় উৎসব চুকে যাক, সম্মেলন তার পরের দিন থেকে চলবে। অবিচ্ছেদ আট-দশ দিন ধরে চলতে পারবে, মাঝে কোন বিরতির দরকার হবে না। ২রা অক্টোবর তারিখটা ভারতীয় পঞ্জিকার নির্ঘন্ট মতে পরম শুভও বটে—মহাত্মা গান্ধির জন্মদিন। অধুনাতন পৃথিবীতে শান্তির সাধনায় প্রাণপাত করেছেন অমন আর কে? এই ভাল হল—গান্ধিজী ধরায় এলেন, সেই পুণ্য দিনে শান্তি-সম্মেলনের আরম্ভ।

আবার এক মতলব হচ্ছে—

কার্তিক কানে কানে খবরটা দিল। এত দেশের এত মানুষ জুটেছে—বলুন দিকি, আমাদেরই কি মাথা মোটা সকলের চেয়ে? তারা তো রা কাড়ে না, নোটের বান্ডিলে পকেট মোটা করে দিব্যি গোঁফে তা দিয়ে বেড়াচ্ছে।

সাব্যস্ত হয়েছে, দশ লক্ষ করে ঐ যে সকলকে হাতখরচা দিয়েছে, ভারতীয় দল ও-টাকা নেবে না। অন্তর্যামীর মতো মনের কথা বুঝে নিয়ে অবিরত জিনিসপত্রের যোগান দিচ্ছ, হাতখরচ করব—তার ফাঁক রেখেছ কোথা?

শুনে ও-পক্ষ তো হাঁ-হাঁ করে ওঠেন।

আমাদের চিরকালের প্রথা—অতিথি এলে খাওয়া-দাওয়া শুধু নয়, সম্মান-দক্ষিণা দিতে হয়। হাজার বছর ধরে হয়ে আসছে। ভারতেও আছে নিশ্চয় এমনি-কিছু। থাকতেই হবে। প্রাচ্য আতিথ্যের রীতি এই।

কুয়োমিনটাং আমলে ছিল না—ছেড়ে দিন মশায়, সে কথা। সকল পাঠ উঠে গিয়েছিল সে দুর্দিনে। যখন দিন পেয়েছি, রীতিপর্ব একে একে সমস্ত বহাল হবে। নতুন-চীনে দেশ-বিদেশের মানুষ প্রথম এই একসঙ্গে পায়ের ধুলো দিলেন, কিছুই তো করা হল না—অতি-সামান্য এতটুকুও যদি গ্রহণ না করেন, আমরা মরমে মরে যাবো।

এর উপর তর্ক চলে না। নেওয়া হল টাকা, বাটোয়ারা হল। চুপিচুপি ঠিক রইল, হজম করা হবে না—ফেরত দিতে হবে কয়েকটা দিন পরে কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে।

হল তাই। সকলে অবশ্য পুরোপুরি দিতে পারেননি, খরচ হয়ে গিয়েছিল কিছু কিছু। সমস্ত একত্র করে দান করা হল শিশুমঙ্গল সমিতিতে। কেমন! তোমাদের নিয়েছি যখন, আমাদের এ দানও নিতে হবে। নইলে মর্মাহত হতে জানি আমরাও।

হাতখরচের টাকা ফেরত দেওয়া হল এমনি ভাবে। সাইত্রিশটা দেশের মধ্যে ভারতীয়েরাই দিল শুধু। ঐ যেমন কার্তিক বলল—অন্য সবাই উচ্চবাচ্য না করে পকেটস্থ করলেন।

(১১)

পরের দিন, অর্থাৎ পঁচিশে। সম্মেলন যখন হচ্ছে না, দেখাশুনো করে বেড়াও। ঘরে পড়ে থাকবে কেন—চীনকে দেখে বুঝে নাও, প্রাচীন সম্পর্কটা ঝালিয়ে নাও পরস্পরের মধ্যে। এটাও কাজ সকলের—

আমি বলি, সকলের বড় কাজ।

গ্রীষ্মপ্রাসাদে (Summer Palace) যাচ্ছি। বরাবর ওখানে রাজরাজড়ারা গিয়েছেন সান-ইয়াৎ-সেনের অভ্যুদয়ের আগে পর্যন্ত। তাঁরা যেতেন ঘোড়ায় পালকিতে—আমরা বাসে। চারখানা ঝকঝকে নতুন বাসে মিছিল করে চলেছি। চানটান সেরে নিয়েছি, মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া ওখানে। আটশ' বছর ধরে যে ঘরে কেবল রাজা-রাণীরা খেয়ে এসেছেন, সেইখানে আজ আমাদের পাত পড়বে। বুঝুন। সারা দিনমান কাটবে ওখানে—সারাদিন ঘুরেও নাকি নমো-নমো করে দেখা হবে, এমনি বৃহৎ জায়গা।

শহরের বাইরে জায়গাটা—দূর কম নয়। বাসে ঘন্টাখানেক লাগল। সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় বলে উঠলেন, দেখছেন—একটা পাখী নেই কোনদিকে।

সত্যিই তো! এত পথ এলাম, এত গাছগাছালি—পাখী উড়তে দেখিনি কোথাও। আমার বাংলা দেশের মতো পাখীর ডাক ভেসে আসে না অলক্ষ্য থেকে।

সুবোধ বন্দ্যো—ব্যক্তিটিকে মালুম হচ্ছে তো? বিধান-সভার সভ্য—খবরের কাগজে হামেশাই যাঁর নাম পাচ্ছেন। চোখ ও মন খোলা—প্রতিটি জিনিস জেনে বুঝে নিতে অসীম চেষ্টাপর তিনি।

বেলা সওয়া-দশটা। বাস থেকে প্রাসাদদ্বারে নামলাম। ব্রোঞ্জের বিশাল সিংহ পাহারা দিচ্ছে। অদূরে 'দীর্ঘায়ু ও দয়ার হল'। ঘরবাড়ি, পথ-পাহাড়, অলিন্দ, দরজা, দ্বীপ—সকল বস্তুরই এক একটা বিচিত্র নাম। কয়েকটা ধাপ উঠে ভিতরে পেঁছতে হবে। রাজবাড়ি কি না—সিঁড়ি থেকেই অভিনবতা শুরু। ধাপ দু-পাশে—মাঝখানটা ঢালু হয়ে উঠেছে, বিশাল ড্রাগন খোদাই-করা সেখানে।

দু-পাশের সিঁড়ি দিয়ে সকলে উঠছেন। আমরা কয়েক জন মাঝের ঢালু পথে ড্রাগন-দেহের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে। নতুন কায়দায় উঠে যাওয়ার বাহাদুরি আর কি!

চক্রেশ এসেছে দলের সঙ্গে। সে বলল, আরে সর্বনাশ—মুণ্ড কাটা যাবে যে!

স্তম্ভিত হলাম। আর যাই হোক, কন্ধকাটা হয়ে দেশে ফিরব কোন্ লজ্জায়? মুণ্ড নেই দেখে বন্ধুসজ্জন বলবেন কি?

খিল-খিল করে তরঙ্গিত হাসি হাসতে লাগল চক্রেশ।

বলে, হাসছি বটে আজ। হাসি বেরিয়ে যেত সেই আমলের কেউ দেখতে পেলে। মাঝখানের ঐ জায়গা দিয়ে যাবে শুধু রাজশিবিকা। শিবিকায় রাজা থাকবেন—অপর কেউ নয়। অপরের পা ছোঁয়ালে তক্ষুণি গরদান। রাজার পথে চলবে, এত বড় আস্পর্ধা!

বাজে লোকের পথ হল দু-পাশের ঐ ধাপগুলো। বাজে মানে কি আপনি-আমি? রাণী, রাজপুত্র, মন্ত্রী, সেনাপতি—ওঁরাই সব। ভারি দরের মানুষ ছাড়া এখানে ঢুকবার জো ছিল না। কুয়োমিনটাং আমলেও—এই সেদিন অবধি। এখন খোলা দরজা। যে-কেউ এসে দেখ, শোন, ঘুরে বেড়াও।

মহারাণীর অফিসঘর। প্রাঙ্গণ ও অলিন্দে নানা জীব-জানোয়ার-ব্রোঞ্জ ও নানা ধাতুতে গড়া। ড্রাগন, ময়ূর, সু-নি নামক অবাস্তব পৌরাণিক জীব। বড় বড় পাত্র অগ্নি-ভয়ে জল রাখবার জন্য। ঘরের মাঝখানে সিংহাসন। দু-পাশে দুই হাঁসের মাথায় বাতিদান, ধূপদান। দশম শতাব্দীর তৈরি সিল্কের বিচিত্র কারুকর্ম। শান্ত সমাহিত প্রভু বুদ্ধের মূর্তি একটি প্রান্ত জুড়ে...

এই গ্রীষ্মপ্রাসাদ বাইরে থেকে সামান্য, প্রায়-সাধারণ—বোঝা যায় না, এত বস্তু আছে ভিতরে। পাথর-কাটা পথ অতিক্রম করে এসে হঠাৎ দেখি সুবিশাল লেক। জল সমুদ্রের মতো গাঢ় নীল—চোখ জুড়িয়ে যায়। তিন ভাগই জল

এখানে, একভাগ মাত্র ডাঙা। লেক ঐ তো হল—তা ছাড়া পদ্ম-ভরা কত পুকুর! খালও আছে—জেড-প্রস্রবণের জল লেকে নিয়ে আসা হয়েছে পাহাড়ের গোড়া থেকে খাল খুঁড়ে। উঁহু, খাল কেন হবে—নদী। নামটা শুনবেন? সোনালি জলের নদী।

যত এগোই, বিস্ময়ের পর বিস্ময় উন্মোচিত হতে থাকে। এত বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য ধারণায় আসে না। দূর-পাহাড়ের উপর ঘর-বাড়ি দেখা যায়—ওগুলোও গ্রীষ্মপ্রাসাদ এলাকার মধ্যে। নেই যে কোনটা! পাহাড়, দ্বীপ, সেতু, মণ্ডপ, জয়স্তম্ভ, কক্ষ, অলিন্দ, পার্ক, ছাতে-ঢাকা রাস্তা—এবং পাহাড়ের সব চেয়ে উঁচু জায়গায় বিশাল বুদ্ধ-মন্দির। না জানি কোন কবির নামকরণ! গোটা জায়গাটারই এক সময়ে নাম হয়েছিল—'স্বচ্ছ ঢেউয়ের পার্ক'; এক ফটকের নাম 'রঙীন মেঘের দরজা'; লেকের মধ্যে রয়েছে 'পরীদেশের দ্বীপ'; পাহাড়ের উপরে 'ভালোবাসার শিখর'। একটা ঘর 'সুবাসের বাস'—লতায় পাতায় ফুলে অপরূপ সাজানো; নাকে শুঁকতে হয় না—চোখের দৃষ্টিতেই বুঝি সুবাসের আঘ্রাণ পাওয়া যায়। লেকের কিনারায় পদ্মবনের পাশে 'বাসন্তী-মণ্ডপ' হাতছানি দিয়ে ডাকে বসন্তরাত্রে অলস বিশ্রামের জন্য।

পৃথিবীখ্যাত অপরূপ এই প্রমোদনগরী। আটশ' বছরে কত রাজা কত রাজবংশের বিলয় ঘটেছে, নগরী-রচনা অব্যাহত চলেছে তবু। আগুনে পুড়িয়েছে ইংরেজ আর ফরাসি, ভেঙে চুরমার করেছে আটটা দুশমন জাত একত্র হয়ে—আবার নতুন ইমারত গড়ে উঠেছে ভগ্নস্তূপের উপর। সর্বশেষ রাণী বিচিত্র ষড়যন্ত্র জাল বুনতেন এই প্রাসাদে বসে। কত পাপ, অন্যায়, কূট-কৌশল, বন্দীত্ব, বিষপান! এক-আধ দিন নয়—সাতচল্লিশ বছর নানান কৌশলে তিনি রাজত্ব করে গেলেন।

পদ্ম আর বাঁশবন দেখে ক্যান্টনের পথের কথা মনে পড়ে যায়। ব্যাপারও তাই। সেকালের এক দুঃসাহসী রাজা (চে-লুং) ইয়াংসি পার হয়ে গিয়েছিলেন দক্ষিণ-চীনে। সেখানকার নিসর্গ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে দক্ষিণের গাছপালা আমদানি করে এই উদ্যান সাজিয়েছেন। নানা জাতীয় বামনগাছ—পাঁচ-সাত শ' বছরের বাড়বৃদ্ধির কুল্যে হাত খানেক। জাপান ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও হেন বস্তু দেখা যায় না। এই গাছ-লালনের কৌশল এরাই শুধু জানে।

লেকের আগে অন্য নাম ছিল, এখন কুয়েনমিন লেক। ছোট ছিল, কেটে বড় করেছে। সেই মাটি পাহাড়ের গায়ে পড়ে পাহাড়েরও আয়তন বেড়েছে। জলের মাঝখানে 'পরীদেশের দ্বীপ'—ঘরবাড়ি ও গাছগাছালি মেশামিশি হয়ে

আছে বিচিত্র রূপে। মার্বেল পাথরের তৈরি সতের খিলানের সেতু—হুড়োহুড়ি করে সেতুর উপর দিয়ে ছুটলাম সকলে দ্বীপের দিকে। চার সিংহ সেতুমুখ পাহারা দিচ্ছে—ভয় নেই, ভয় নেই! পাথরের সিংহ।

লেকের উপর পাহাড়ের গায়ে মার্বেলের নৌকো। দু শ' বছর আগে তৈরি —তখন ছিল শুধুই নৌকো—বাড়িয়ে ও ঘষামাজা করে দোতলা জাহাজের রূপ দিয়েছে ১৮৯২ অব্দে। অযত্নে অবহেলায় পড়ে ছিল, নতুন আমলে পরিপাটি হয়েছে আবার।

পাহাড়ে উঠছি এবার—বুদ্ধমন্দিরে। উঠতে উঠতে ক্লান্ত হয়ে গেছি। পথ সংকীর্ণ। খানিকটা জায়গায় সিঁড়ির মতো—ফাঁকা-ফাঁকা টেরা-বাঁকা সিঁড়ি। মন্দিরের পথ বলেই বোধ হয় এমনি—অনায়াসপ্রাপ্তিতে পুণ্য নেই। আরে, হাত ধরতে আসে যে মেয়েগুলো! এক এক ফোঁটা কলেজের মেয়ে—পাহাড়ের এই দুরারোহ পথ—ভারি আস্পর্ধা বাপু তোমাদের! রাগ করে জোর পায়ে ওদের আগে গিয়ে উঠি। এই তো সেদিন অবধি পায়ে ছোট লোহার জুতো পরিয়ে রাখত, এতটুকু পা নিয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হয় যাতে। মেয়েমানুষ খোঁড়া হয়ে বেশ নাচের ঠমকে চলবে, সেই তো শোভা! সান-ইয়াৎ-সেন প্রাচীন বনেদি রীতি রহিত করে চিরকালের বামনদের মনে চাঁদ ছোঁয়ার স্বপ্ন জাগিয়ে দিলেন। তাই দেখুন, দুর্গম গিরিপথে দাপাদাপি করছে সাহসিকা-দল। আর কিনা হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, হাত ধরে আমাদের গিরিশীর্ষে নিয়ে তুলবে বলে!

উপরে মন্দিরের নিম্নদেশে আর এক মন্দির। নয় তলা ছিল—ইংরেজ ও ফরাসি ভেঙে দেয়। এখন চার তলা মাত্র। কপিলবাস্তুর রাজপুত্র সন্ন্যাসী বহু সহস্র ক্রোশ দূরে অটল মহিমায় দাঁড়িয়ে আছেন—দুই প্রধান শিষ্য দু-পাশে। মণিমাণিক্য হীরা-জহরতে সাজানো ছিল বিগ্রহ, ঠিক সামনে ঐখানটায় ছিল অতি-বৃহৎ আয়না—দেখুন, চেয়ে দেখুন, নিদর্শন রয়েছে তার। —তিক্তকণ্ঠে দোভাষী মেয়েটা বলে, সেই লুঠেরারা ভেঙে ফেলেছে আয়না, মণিমাণিক্য ডাকাতি করে নিয়ে গেছে। সারা দেশ জুড়ে বার বার এমনি অত্যাচারের ঢেউ বয়ে গেছে। বলতে পারেন, কেন এমন হয়?

বললাম, নির্লোভ নির্বিরোধী যে তোমরা! জানে যে, মরে গেলেও ওদের দেশে পালটা হানা দিতে পারবে না। আমাদেরও ঠিক ঐ অপরাধ। চীন ভারত দু-দেশেরই এক ইতিহাস, একই রকমের দুঃখভোগ।

বেলা গড়িয়ে আসে। দেখার শেষ নেই। পা টলমল করছে, তবু বসতে মন চায় না। দু-চোখ ভরে দেখে নিই আর যেটুকু সময় আছে। চিরজন্মের এই দেখা...

রাজার জন্মদিনে উৎসব হত এই ঘরটায়। ঐ চেয়ার আর ঐ টেবিল কাঠে তৈরি আয়তনও এমন-কিছু বড় নয়। নিয়ে যাও দিকি সরিয়ে। হেঁ-হেঁ, দশ-বিশের কর্ম নয়—সাত শ' মানুষ লাগাতে হবে, তবে নড়বে।

লুঠপাট হয়ে গিয়েও যা এখনো আছে, স্বদেশি বিদেশি সকলের চোখ ঠিকরে যায়। হাতির দাঁতের তৈরি একটা মাছ দেখুন কত বড়। দেখুন, প্রাচীন শিল্পী ফ্যান-আন-ইয়া'র অপরূপ চিত্রমালা। আর ওদিকে মাটির কাজ, গালার কাজ, চন্দনকাঠের কাজ। কারু-শোভিত আসবাবপত্র, অলঙ্কার, ছাত থেকে ঝুলানো রকমারি বাতিদান...কত আর লিখব! লিখতে গেলে দেখা হয় না, পেছিয়ে পড়ি। এই সব কক্ষ-অলিন্দ মণ্ডপ-চত্বরের গোলকধাঁধার মধ্যে রাজরাণী রাজমাতা রাজকন্যারা কোথায় যেন বেড়াতে বেরিয়েছেন—এক্ষুণি আসবেন ফিরে—তেমনি ভাবে চারিদিক পরিপাটি করে সাজানো। তাঁদের অনুপস্থিতিতে তাড়াতাড়ি চোখের দেখা দেখে নিচ্ছি আমরা।

শেষ রাণীর পোশাক বদলানোর ঘর। কত পোশাক রে বাপু—দেয়ালে দেয়ালে কত রকমের আয়না! চন্দনকাঠের অতিকায় পেঁটরা; মাছ রাখত, ফল রাখত, চন্দন পোড়াত—সেই সব নানা ধরনের পাত্র। সাতচল্লিশ বছরের রাজত্বে স্ফূর্তির চূড়ান্ত করে গেছে বটে! সব দেশের রাজরাজড়ার ঐ কত রীতি। আট-আটটা রান্নাবাড়ি রাণী সাহেবার—গুণে দেখলাম। মহারাণী যখন, তার কমে কুলাবে কেন? অমন দেড়-শ দু-শ রাঁধুনি ছিল—তারাও সামাল দিয়ে উঠতে পারত না। মারাঠি মেয়ে সরলা গুপ্তা হেসে বললেন, পোড়া কপাল আমাদের, একটা রাঁধুনি জোটে না—হাত পুড়িয়ে খেতে হয়।

রাণী হতে হবে, তবে তো দু'শ রাঁধুনির রান্না খাবেন! কেরাণী, চাকরাণী—এই তো সকলে। শুধু মাত্র রাণী কে আছেন, বলুন।

অপেরা-ঘর—তেতলা মঞ্চ। নাটকের পরী স্বর্গ অর্থাৎ উপরতলা থেকে এবং দৈত্যদানো পাতাল অর্থাৎ নিচের তলা থেকে আবির্ভূত হত মাঝের মঞ্চে। রাজ-পরিবার অভিনয় দেখতেন ঐ ঘরের ভিতর কাঠের ঝিলিমিলির অন্তরাল থেকে। এখন মিউজিয়াম—পুরানো শিল্পবস্তু সাজানো রয়েছে। একধারে বিশ্রামকক্ষ সারি সারি। আর বাজনা বাজে না, নাটক হয় না—গহনার শিঞ্জন নেই প্রেক্ষাকক্ষে। সিঁড়ির ধারে ছোট ঐ গাছটিতে অজস্র লাল ডালিম ফলে

নির্জন গৃহাঙ্গণ আলো করে রয়েছে।

না গো, নির্জন হবে কেন, সাড়াশব্দ পাই যে ভিতরে! বিছানা, কাপড়-চোপড়, থালাবাটি—উঁকি দিয়ে দেখি, মানুষও রয়েছে শুয়ে বসে। একজন দু'জন নয়—বিশ্রাম-ঘরগুলো সমস্ত ভর্তি! আমাদের দেখে বেরিয়ে এলো। হাততালি দিচ্ছে। সমবেতকণ্ঠে গলা মিলিয়ে বলছে—চীন-ভারত এক হও, হোপিন ওয়ানশোয়ে—শান্তি দীর্ঘজীবী হোক।

এরাই রাজা একালের। সর্বাঙ্গে দুঃখ-সংগ্রামের অগণিত ক্ষতচিহ্ন—মুখের প্রসন্ন হাসির সঙ্গে দেহের চেহারা একেবারে বেমানান। শ্রমিক-বীর এরা। কৃতিত্বের পুরস্কার—রাজকীয় প্রমোদ-নগরীতে দশটা দিন স্ফূর্তি করে যাবে। অতুল সম্মান—আবার যখন কাজে ফিরবে সম্ভ্রমদৃষ্টিতে তাকাবে সকলে। আট শতাব্দী ধরে গড়ে-তোলা গ্রীষ্ম-প্রাসাদের সেই অপরাহ্ণে নবীন কালের রাজা-মহারাজারা গভীর উল্লাসে হাত ঝাঁকিয়ে বিদেশি আগন্তুকদের সম্বর্ধনা জানাল...

কিন্তু আর নয়। দূতাবাসে যেতে হবে এখন। লেকের জলে নৌকো চড়া হল না—উপায় কি, দূতাবাসে হাজিরা দিতে হবে আজকের মধ্যেই।

ছুটল বাস। বেশ লাগে, এই সুদূর শহরে একটি বাড়ির মাথায় বিশাল ত্রিবর্ণ ভারতীয় পতাকা উড়ছে। কক্ষে কক্ষে মহাত্মা গান্ধীর ছবি। নাম সই করতে হল ওঁদের খাতায়, তারপর গল্পগুজব চলল। সরবত খাওয়ালেন ওঁরা। পরাঞ্জপে কোথায় কাজে বেরিয়েছেন, দেখা হল না তাঁর সঙ্গে।

(১২)

দোতলায় লিফটের সামনাসামনি একটা ঘরে ভারতীয় দলের অফিস। দরজার পাশে নোটিশবোর্ড। হরেক রকম নোটিশ বেরুচ্ছে দিনের মধ্যে অমন বিশ বার। উঠা-নামার মুখে বোর্ডে অতি-নিশ্চয় উঁকি দিয়ে জেনে যাবেন—কি আপনার করণীয় অতঃপর। সেক্রেটারি বিস্তর—লেখাজোখারও সেজন্য অবধি নেই। বহু সন্ন্যাসীর কর্মতৎপরতায় দরকারি জিনিষটাই অবশ্য বাদ পড়ে থাকে কখনো কখনো।

সোভিয়েট-ডেলিগেটরা নিমন্ত্রণ করেছেন, ব্যাঙ্কুয়েট-হলে সন্ধ্যার সময় খাওয়া—ফিরে এসে নোটিশবোর্ড থেকে অবগত হওয়া গেল। আর কুমুদিনী

মেহতা মুখে বললেন, জনকয়েক সাহিত্যিকের মধ্যে মোলাকাতের চেষ্টা করা যাচ্ছে। হয়তো বা এখনই। ঘরে থাকবেন, বেরিয়ে পড়বেন না।

চোরে চোরে মাসতুত ভাই—অমন আপন-জন বিদেশ-বিভূঁয়ে আর কে? চোখ ঠেরে কুশলাদি শুধাবো, খবর কি ভায়ারা? লেখনী-পেষণের কারবার চলে কেমন ওদিকে? খাতির পাও, সভায় ডাকে, বই-টই কিনে পড়ে তো সবাই—না মুফতে বাগাবার চেষ্টা?

চারতলার ঘরখানায় কবি-সাহিত্যিক গিজগিজ করছে। অর্থাৎ ডাক-সাঁইটে কতকগুলো মিথ্যুক আর অকর্মা জুটেছে এক জায়গায়। কথার সঙ্গে কথা জুড়ে বাজে কাজে বসে বসে তারা দিন কাটায়। শাস্ত্রের বচন—একশ'বার মিথ্যে কথা বলবে, কিন্তু মা লিখ, মা লিখ। আর এই দুর্বৃত্তেরা (আমি, আর আমার মতন যারা গল্প-উপন্যাস লেখে) মিথ্যে কথা হরদম লিখে দেশ-বিদেশে বুক ফুলিয়ে প্রচার করে।

জন ত্রিশেক হবো আমরা গুণতিতে। ধুরন্ধর রাজনীতিকদের স্থান নেই। অথবা তাঁরাই আসবেন না এই তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারে। আলোচনা বিশেষ ভাবে সোভিয়েট সাহিত্যিকদের সঙ্গে। তার মধ্যে আছেন তুর্কি-কবি নাজিম হিকমৎও। ভদ্রলোকের কবিতার গুঁতোয় তুর্কি-সরকার তেড়েফুড়ে শুধু মাত্র কবিতা নয়—কবিকেও বের করে দিয়েছেন দেশ থেকে। অগতির গতি রাশিয়ার আশ্রয়ে তিনি আছেন। মস্কোয় বসতি।

কি সব তাগড়া জোয়ান! কলমবাজিতে উদরপূর্তি করে এমনধারা চেহারা বাগিয়েছে—আমাদের কালোবাজারিরাও যে হার মেনে যায়। নাজিম হিক-মতের অনেক কবিতা বাংলায় পড়েছি—ভারি ঔৎসুক্য কবিকে দেখবার। এত বড় কবি—অতএব কিঞ্চিৎ ললনা-মোহন আহা-মরি গোছের ভাব থাকা উচিত। সে-সব একেবারে কিচ্ছু নয়, মুসড়ে গেলাম—ইয়া দশাসই জোয়ান, টকটকে ফর্শা রং। একটা পা খোঁড়া, লাঠি নিয়ে চলতে হয় সর্বদা।

ছোট ছোট হল হয়ে গেল তুলসুন, কোজেভনিকভ, হিকমৎ—এমনি এক একজনকে নিয়ে। আমরা দলের নেতা খোদ অ্যানিসিমভকে নিয়ে পড়লাম। মারি তো গণ্ডার, লুঠি তো ভাণ্ডার! সাহিত্যিক ও সাহিত্যের অধ্যাপক, তার উপরে সোভিয়েট-লিটারেচার সম্পাদনা করেন। দেহ-গৌরবেও হিমালয় পর্বতের বড় বেশি কম যান না। (সকলের হিংসা করে মরছি, এ অধমও অবশ্য হেলাফেলার বস্তু নন আয়তনের দিক দিয়ে।)

ব্যবস্থাপনা কুমুদিনী মেহতার—তিনি পরস্পরের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

দীর্ঘকাল বিলাতে ছিলেন, জলের মতো ইংরেজি বলেন। রাশিয়ায় গিয়েছিলেন, রুশ ভাষাতেও দিব্যি দখল। আসল দোভাষি হলেন পোপোভ—ইংরেজি-নবিশ, কাগজের সম্পাদক ইনিও। কথাবার্তার মধ্যে কুমুদিনী ফোড়ন দিচ্ছেন মাঝে মাঝে, দুর্বোধ্য এক একটা জিনিস সহজ করে বোঝাবার চেষ্টা করছেন।

গোড়ায় আমি একাই শুরু করেছিলাম। একটা সোফার এপাশে আমি, মাঝে অ্যানিসিমভ, ওপাশে পোপোভ। ইন্ডিয়ার উপন্যাসকার শুনে গভীর আন্তরিকতায় হাত জড়িয়ে ধরলেন আমার। আহা, টেগোরের দেশের লেখক তুমি, টেগোরের উত্তরাধিকারী!

মনে মনে প্রণতি জানাই গুরুদেবের উদ্দেশে। দেশে দেশে কত সম্মান ছড়িয়ে গেছ তুমি আমাদের জন্যে! আজ কতকাল পরে পিকিন হোটেলের চারতলার ঘরে মানুষগুলো ড্যাব-ড্যাব করে চেয়ে রইল—তোমার রেখে-আসা ইজ্জত সগৌরবে মাথায় তুলে নিলাম। তাই তো বলি, বাইরে না এলে দৃষ্টি খোলে না, বোঝা যায় না নিজেদের যথার্থ মূল্য। সঙ্কীর্ণ দেয়ালে মাথা খুঁড়ে বেড়াই, কূপের ভেকের মতো ভ্রান্ত অহমিকায় স্ফীতোদর হই। তোমার বিশ্বজনীনতা একদা সমালোচকের উপহাসের বস্তু হয়েছিল—বিশ্ব যে ক্রমে ঘরের মধ্যে এসে যাচ্ছে, উঁচু হয়ে দেয়ালের বাইরে নজর তুলে দেখে নি তারা একটিবার। বাইরে এসে উপলব্ধি হয় টেগোর-নেহরু-নেতাজির মহিমা।

ইতিমধ্যে আরও অনেকেই ঝুঁকেছেন এই দিকে। সোফায় জুত হয় না—তখন নিচের কার্পেটে গোল হয়ে বসি।

অ্যানিসিমভ বললেন, আমাদের সম্বন্ধে ধারণা কি তোমাদের দেশে? বিশেষ করে তোমাদের সাহিত্যিক মহলে? অনেক রকম ভুল ধারণা জন্মাবার চেষ্টা হয়—কি বলো? আচ্ছা, এই কিছুদিন আগে এক দল গিয়েছিলেন আমাদের দেশে। কেউ কিছু লিখলেন, খবর রাখো?

নজর বন্ধ রেখে চলি, অনেকেই অবশ্য আমরা। কতক অভ্যাসের বশে, কতক বা স্বার্থের খাতিরে। কিন্তু ওখানে তা ফাঁস করতে যাই কেন? বললাম, (আর তা মিথ্যাও বড় নয়) তোমাদের সম্পর্কে বড় আগ্রহ ভারতের মানুষের। রবীন্দ্রনাথ সেই যে 'রাশিয়ার চিঠি' লিখলেন, আগ্রহ সেই থেকে সর্বব্যাপ্ত হয়েছে। বলেছ ঠিকই—নরকের কীট বলে ঢাক বাজাবার ব্যবস্থাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু সমস্ত বিতর্ক ছেড়ে দিয়ে তোমরা যে মানব-সমাজ নিয়ে অতি আশ্চর্য এক্সপেরিমেন্ট করছ এবং বিস্ময়কর সাফল্যও পেয়েছ—শত চেষ্টাতেও এ সত্য লুকানো যাবে না। চিরাচরিত ভাবনার মূল ধরে নাড়া দিয়েছ তোমরা। শুধু

মাত্র থিয়োরি নয়—হাতে-কলমে তা রূপায়িত করে দেখিয়েছ। আরো দেখাবে।

রাশিয়া থেকে ফিরে হালে যা লেখা হয়েছে, তার মধ্যে সত্যেনদা'র বইটার কথা মনে ছিল। দরাজ ভাষায় তার পরিচয় দিলাম। অ্যানিসিমভ বললেন, কে লিখেছে বললে—মজুমদার ?

মজুমদার, মজুমদার বার কয়েক বলে লেখককে মনে আনবার চেষ্টা করছেন।

বললাম, রাশিয়া আর চীনের কথা লোকে বড় শুনতে চায়। ছেলেপুলের রূপকথায় যেমন কৌতূহল, তেমনি যেন কতকটা। সত্যেন বাবুর বইটা যে মাসিকপত্রে বেরিয়েছিল, তার সম্পাদক আমাকেও অনুরোধ করেছেন। ফিরে গিয়ে চীনের কথা ধারাবাহিক ভাবে লিখতে হবে।

অ্যানিসিমভ উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, লিখবে তুমি ? মানুষে মানুষে সত্য পরিচয় হোক, সব চেয়ে বড় কাম্য এটা। বিশ্বশান্তি এতেই আসবে। আর, রাজনীতিক নয়—সাহিত্যিকেরই এ কাজ প্রধানত।

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলি, আমিও ঠিক এমনি ভাবছি। মানুষই আসল। চীনের কথা যা লিখব তাতে থাকবে না সংখ্যাতত্ত্ব বা রাজনীতিক বিশ্লেষণ। ও সব বুঝিও নে। মানুষেরা থাকবে আমার কাহিনী জুড়ে। সামান্য আর মহৎ যত মানুষ দেখতে পাচ্ছি। তাদের এই সুবিপুল উল্লাস আর কঠিনতম সাধনা।

জমে উঠেছে আমাদেরই সব দলের চেয়ে বেশি। উমাশংকর যোশি আর অধ্যাপক শুকলা এলেন এই দিকে। এলেন কেরালার লেখক জোসেফ মুণ্ডে-শেরি। আর যাঁরা ছিলেন, মনে করতে পারছি নে।

সোভিয়েট সাহিত্য পড়ো তোমরা ? কোন কোন লেখক তোমাদের প্রিয়, জানতে ইচ্ছে হয়।

শুধু ঘাড় নেড়ে এবার নিস্তার নেই। তা আমরাও পিছপাও কিসে ? গড়-গড় করে কতকগুলো নাম বলা গেল। এ কালের শুধু নয়, সেকালেরও। আর উমাশংকরের, সত্যি, প্রচুর পড়াশোনা। কোন একটা ভাল বইয়ের পাতা ধরে যদি একজামিন করতে বসি, তা-ও বোধ করি তিনি হার মানবেন না।

টলস্টয়ের সম্বন্ধে বললাম, কৈশোর থেকে তাঁর লেখায় অনুপ্রেরণা পেয়ে আসছি। মহাত্মা গান্ধি আমাদের হৃদয়ের মানুষ—টলস্টয়ের আসনও দূরবর্তী নয়।

অ্যানিসিমভ উল্লসিত হলেন।

দেখ, আগামী বছর টলস্টয়ের একশ' পঁচিশ জন্মবার্ষিকী। জাঁকিয়ে উৎসব করতে চাই এই উপলক্ষে। আর বুঝতে পারছ—এ হল আসলে সাহিত্যিকদেরই অনুষ্ঠান, তাঁরা জমায়েত হবেন সব চেয়ে বেশি। ভারত থেকে অনেক সাহিত্যিককে আমরা চাই, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে তাঁরা জীবন্ত পরিচয় স্থাপন করবেন। এ ব্যাপারে, আশা করি, পুরোপুরি সহযোগিতা পাবো তোমাদের—

নিশ্চয়, নিশ্চয়—

ওরে পাগলা ভাত খাবি, না—হাত ধোব কোথায়? আমাদের হল সেই বৃত্তান্ত। কিন্তু চেপেচুপে মনোভাব প্রকাশ করতে হয়—হ্যাংলামি বেরিয়ে না পড়ে।

তার পর এক মোক্ষম প্রশ্ন উমাশঙ্করের। যে সন্দেহ অনেক মানুষের মনে। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা নেই নাকি সোভিয়েট-রাষ্ট্রে? চিন্তার প্রকাশ যথেচ্ছ করা চলে না। সাহিত্য ফরমাস মতন তৈরি হয়, চিত্তের স্বতস্ফূর্ততায় গড়ে ওঠে না। দায়িত্বশীল ব্যক্তি আপনি—আপনার মুখ থেকে ব্যাপারটা প্রাঞ্জল ভাবে জানতে চাই।

হ্যাঁ, এমনি রটনা হয় বটে! ভাল হল আপনাদের প্রশ্নটা পেয়ে।

ক্ষণকাল চুপ করে রইলেন আমাদের দিকে চেয়ে। মুখে মৃদু হাসি। বললেন, সত্য আমাদের দিকে। কিছু লুকোবার নেই কারো কাছে। পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা থাকা সম্ভব শুধুমাত্র সেইখানে, যেখানে যথার্থ গণতন্ত্র বর্তমান। সে আমাদের দেশেই।

দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, সোভিয়েটের পঁয়ত্রিশ বর্ষব্যাপী অস্তিত্বের মূলনীতি হল, যা-কিছু ভাল সমস্ত সর্বসাধারণের সম্পত্তি। লোক আর লেখকের মধ্যে সম্পর্ক অতি নিবিড়। লোকের চিন্তা-চেষ্টাই সাহিত্যের বাণী। সাহিত্য নিতান্তই জনমনের প্রতিধ্বনি। মায়ের যেমন সন্তান সম্পর্কে প্রত্যাশা—জনগণও ঠিক তেমনি আশা করে, লেখক কর্তব্যপর হবেন—লেখার ইষ্টানিষ্ট অনুধাবন করবেন।

অ্যানিসিমভের মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা। এক গণ্ডা কলম উদ্যত হয়ে আছে, চলছে একটি মাত্র—পোপোভের কলমটা। তিনি নোট নিচ্ছেন। বক্তা থামলে ঐ নোট দেখে তিনি ইংরেজিতে বুঝিয়ে দেবেন। তখন ছুটবে আমাদের কলমের পাল্লা। একটি কথা বাদ না পড়ে, এতটুকু হেরফের না হয়।

একটি কথা অ্যানিসিমভ বারম্বার উচ্চারণ করছেন—'নারোড'। ঝগড়া

বাড়াতে হলে আমরা 'নারদ, নারদ'—বলে কলহ-দেবতার আবাহন করি—সেই নামটা অবিকল। হাসি পায়, মজা লাগে। পোপোভের অনুবাদের সময় টের পাওয়া গেল, রুশীয় 'নারোড', হলেন জনগণ। ওটা কিন্তু আমাদের দেশের হলেই ঠিক হত। এত ঝগড়াঝাটি ও লাঠালাঠি পরস্পরের মধ্যে—তাঁরা যে নির্ভেজাল নারদ, অত্র সন্দেহ নাস্তি।

অ্যানিসিমভ বলছিলেন, জীবন বৈচিত্র্যময়। সাহিত্যে জীবন-সত্য রূপায়িত হয়, অতএব আলো-অন্ধকার নিশ্চয় থাকবে। লেখকের কর্তব্য হল সত্যের উদ্ঘাটন ও ব্যাখ্যা। এ বিষয়ে সোভিয়েট-লেখকদের চেয়ে বেশি বিমুক্ত কে?

জোর দিয়ে বললেন, সর্বাধিক মুক্ত আমাদের লেখকেরা। সোভিয়েট-কাঠামোর ফল এটা। কেউ যখন মিথ্যা রটায়, সোভিয়েট-লেখকের স্বাধীনতা নেই—আমরা হাসি। এসে বরঞ্চ নিজের চোখে দেখ, দেখে নিঃসংশয় হও।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে। প্রশ্নটা জনগণের দাবির সঙ্গে বিজড়িত। গণতান্ত্রিক সমাজে সব চেয়ে বড় শক্তি গণদাবি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মহিমময় লেখক (রবীন্দ্রনাথের নাম একাধিকবার উচ্চারণ করলেন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে। নাম করছেন আমার দিকে তাকিয়ে। আলাপনের গোড়ার দিকে বুক চিতিয়ে বলেছিলাম—বাংলার লেখক আমি, বাংলা ভাষায় লিখি—যে ভাষায় টেগোর লিখেছেন। অর্থাৎ বঙ্গ-সাহিত্য বলতে আপাতত দু'জনকে ও'রা জেনে রাখলেন—টেগোর এবং এই অধম) নিশ্চয় অবাধ সুযোগ পাবেন খুশিমতো লিখবার। কারণ তিনি জনগণের কাছাকাছি—লোকের শুভাশুভ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি প্রখর ও আবিলতাশূন্য। কিন্তু ব্যক্তিসর্বস্ব নৈরাশ্যবাদী লেখক—যিনি মানুষ চেনেন না, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ নেই যাঁর—তাঁর খেয়ালখুশি বাধা পাবে নিশ্চয়। রবীন্দ্রনাথের বই আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়ি—ভারতের আত্মার সন্ধান পাই সেখানে, ভারতের চিরকালের মানুষদের দেখি। তা বলে টি. এস. এলিয়াটের সম্পর্কে এ কথা খাটবে না। রবীন্দ্রনাথ একেবারে পৃথক মনোভঙ্গি নিয়ে লিখলেও সে রচনা আমাদের আদরণীয়।

আর নয়, গা তুলুন এবার। ঘোর হয়ে এলো। ভোজের আসর এখনই। এ'রা খাওয়াবেন আজ আমাদের। খাওয়া এবং বক্তৃতা আছে, কিন্তু সব চেয়ে

বড়ো জিনিস হাসি-রহস্য, গা এলিয়ে বসে আজেবাজে গল্পগুজব। কে বলবে, বিশ্বের এ-পাড়ায় আমাদের ঘর—আর ওরা হল ও-পাড়ার? সব বিভেদ ভুলে মেরেছি। একটা ঘরের মধ্যে এখন আমরা এক পরিবারের লোক।

না, খাওয়ার ফিরিস্তি আর নয়। বুঝতে পারছি, পাঠকবর্গের প্রতি নিষ্ঠুরতা হচ্ছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ উপমা দিতেন, পাঁজিতে দশ আড়া জল লেখে, পাঁজি নিংড়ে এক ফোঁটাও মেলে না। পিকিন-ডাকের (স্বর্গ-মর্ত্য-রসাতলে ঐ বস্তুর নাকি জুড়ি নেই) আধখানা ঠ্যাং-ও খাওয়াতে পারব না, কেন মিছে রসনা লালায়িত করা?

একদিন এক বিষম কাণ্ড হয়েছিল, তবে শুনুন।

খাওয়ার টেবিলে গল্পগুজবের মধ্যে অন্যমনস্ক ভাবে আমাদের একজন বললেন, জল—

গেলাস ভর্তি জল (ফোটানো জল অবশ্য) দেখে চমক ভাঙল, অ্যাঁ?

জলই তো চাইলেন—

ভুল করে চেয়ে বসেছি। জল বদলে লেমনেড বা অরেঞ্জস্কোয়াশ দাও ভাই—

চল্লিশ দিন চলেছে এই রকম। আদরের অতিথি—জল খাবো কেন—হ্যাঁ? আর যাই হোক, আমাদের দেশেঘরে ও-বস্তুর অভাব নেই। প্রচুর আছে।

ঘুরে ফিরে আবার ঐ খাওয়ার কথা। যাক গে, মোটামুটি একটা বিধি জেনে রাখুন শুধু। সকালে খাওয়া, দুপুরে খাওয়া, রাত্রে খাওয়া। আলোচনায় বসলে খাওয়া, ট্রেনের মধ্যে প্লেনের মধ্যে খাওয়া, যেখানে যাচ্ছি এবং যা-কিছু করছি সর্বক্ষেত্রেই সুবিধামতো খাওয়ার আয়োজন। খাওয়ার প্রসঙ্গ পারতপক্ষে আমি আর তুলবো না—কমা-সেমিকোলন-দাঁড়ির মতো আপনারা জায়গা বুঝে ঐ ব্যাপার মনে মনে বসিয়ে নেবেন।

রাত্রে ঘরে ঢুকবার সময় নোটিশ-বোর্ডে দেখে লাফিয়ে উঠলাম, সকালবেলা স্পেশ্যাল ট্রেনযোগে বেরুনো হবে মহাপ্রাচীর দেখতে।

(১৩)

মন উড়ল কত দিন-মাস-বছর পিছিয়ে, কত দেশদেশান্তর পার হয়ে। কোথায় এই পিকিন শহর, কোথায় বা সে-কালের নিতান্ত সাধারণ জনবিরল

একটি গ্রাম—ডোঙাঘাটা! মধ্য-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপের পাঠশালায় ঘিরে বসেছি প্রহ্লাদ মাস্টার মশাইকে। জগতের সপ্ত আশ্চর্যের গল্প বলছেন। শিশু-দলের চোখে মুখে আনন্দ-কৌতুক। কোন দেশে বিশালাকার রাক্ষুসে ঘণ্টা বাজছে ঢং-ঢং করে। সুনীল সমুদ্রে-ঘেরা সাইপ্রাস দ্বীপে পিতল মূর্তি দুই গিরি-চূড়ে দুই পা রেখে অনন্ত কাল দাঁড়িয়ে আছে, নৌকো-জাহাজ চলাচল করে নিচে দিয়ে। ব্যাবিলনের আকাশব্যাপ্ত সুবিশাল উদ্যান। আর ঐ মহা-প্রাচীর—"দ্বাদশটি অশ্বারোহী প্রাচীরের উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে ঘোড়া ছুটাইয়া যাইতে পারে—"। খটাখট খটাখট ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে—গিরি-নদী-কান্তার অতিক্রম করে ছুটেছে—গ্রামশিশুর দৃষ্টির উপর ঝিলিক দিয়ে যায় তারা, কানে বাজে অশ্বখুরের ধ্বনি!

সেই মহাপ্রাচীর চোখে দেখতে যাচ্ছি। মিলিয়ে দেখব, আমার শিশু-কল্পনার সঙ্গে কতখানি মেলে আসল বস্তু। তাই তো ভাবি, স্বপ্নেও মনে করতে পারিনি—এমনি কত কি পেলাম এই জীবনে! সত্য বলে ভাবতে ভরসা পাইনে, আমার জীবনে প্রাপ্তির এমন দুকূলব্যাপী প্রবাহ। ভাল করে চোখ কচলে সুস্পষ্ট চিত্তে দেখতে ভয়-ভয় করে, স্বপ্ন হয়ে মুছে যাবে বুঝি এ সমস্ত!

সকাল পৌনে ন'টায় পিকিন স্টেশনে। বাইরে ভিতরে অপরূপ সাজিয়েছে। শান্তির কপোত, পাতাকা, ফুল। আর টাঙিয়ে দিয়েছে—লাল সিল্কের কাপড়ে তৈরি একরকম উৎসব-মাল্য—নাম জেনে এসেছি সা-তেং (sa-teng)। লাউড-স্পীকারে গান হচ্ছে। ছেলেমেয়ের দল, সৈন্য ও মাতব্বরেরা বিদায় দিতে এসেছেন। হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, হাততালি দিচ্ছেন একতালে। সারা স্টেশন গমগম করছে।

শহর ঘিরে যে দৃঢ় অত্যুচ্চ পাঁচিল আছে, স্টেশন তার বাইরে—একেবারে পাঁচিলের লাগোয়া। প্লাটফরমের পশ্চিম দিক হচ্ছে পাঁচিল। পাঁচিল থেকে কতকটা দূর অবধি বাগান, রংবেরঙের ফুল ফুল আছে সেখানে।

স্পেশাল ট্রেন কিনা—নতুন রং-দেওয়া ঝকঝকে গাড়ি, চেয়ারে টেবিলে ধব-ধবে চাদর পাতা। প্রতি কামরার দরজার কাছে মাতব্বরদের এক একজন দাঁড়িয়ে। সেকহ্যান্ড করে সমাদরে গাড়িতে তুলে দিচ্ছেন।

আলোয় চীনা অক্ষর ফুটে আছে ল্যাভেটরির সামনে। তার মানে, খালি

আছে—এখন ব্যবহার করতে পারো। মানুষ ঢুকলে আলোর লেখা আর থাকবে না।

পাঁচিলের ধারে ধারে ট্রেন চলেছে। কঠিন বিশাল পাঁচিল—গিয়েছেও কত-দূর! এ বস্তুও কম আশ্চর্য নয়। লাইনের ওদিকে গড়খাই—তার ওপাশে ঘর-বাড়ি। রাজহাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে গড়খাইর জলে। একটা বিড়াল বসে আছে চুপচাপ। গরু-ছাগলের পাল। ছেলেমেয়ে কোলে গ্রাম-বৃদ্ধেরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আমাদের। দুটো স্টেশন ছাড়িয়ে এলাম, একটানা পাঁচিল তবু চলেছে আমাদের বাঁদিকে।

চেয়ারে হাতলের পাশে বোতাম টিপলে আংটির মতো জিনিস বেরিয়ে আসে। ঐখানে কাচের গেলাস বসিয়ে চা দিয়ে গেল। দুধ-চিনিবিহীন সোনার বর্ণ চা—খুব সুগন্ধ, ফুলের রেণু মেশায় ওরা চায়ের সঙ্গে।

আর একরকম আছে—সবুজ চা। জলে পাতা ফেললেই সবুজ রং হয়ে যায়। এই জাতীয় চায়ের—বিশেষ করে হ্যাংচাউ অঞ্চলে যা উৎপন্ন হয়—ভারি নামডাক।

চীনারা হল বনেদি চা-খোর। সময়-অসময় নেই, জায়গার বাছবিচার নেই—সর্বক্ষেত্রে চা। 'চা' কথাটাও খাঁটি চীনা। আমরা দুধ-চিনি মিশিয়ে খাই শুনে ওরা হেসে খুন। ওতে স্বাদ-গন্ধ থাকে কিছু? শুধু দুধ-চিনি খেলেই তো পারো তার মধ্যে চায়ের কয়েকটা পাতা না ফেলে! ওদের ঐ চা-ভেজানো জলে গোড়ায় তেমন মউজ হত না আমাদের। পরে মজা পেয়ে গেলাম। অবোধ অতিথিজন বলে করুণাপরবশ হয়ে যদি দুধ-চিনি দিতে আসত, আমরাই তখন না-না করে উঠতাম।

দেখ, দেখ—কত পাঁতিহাঁস একটা পুকুরে! যেন একরাশ শ্বেতকুসুম ফুটে আছে। পাখি নেই—কাল যে বলাবলি হচ্ছিল? কিচমিচ করে আমাদের জানান দিয়ে এক ঝাঁক উড়তে উড়তে সুদূর দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

লাউড-স্পীকারে বারম্বার মার্জনা চাইছে। সামনের স্টেশনে গাড়ি পাঁচ মিনিট থেমে থাকবে ইঞ্জিন বদলানোর জন্য। পাহাড় অঞ্চলের শুরু—গাড়ির গতি কমবে এবার থেকে।

বিনামূল্যে যদিচ—টিকিট দিয়েছিল আমাদের প্রত্যেককে, সেই টিকিট চেক করতে এলো। গটমট করে কাজ করে বেড়াচ্ছে—বাপরে বাপ, পোশাক-পরা যত সব জাঁদরেল কর্মচারী। কাছে এলে সন্দেহ হয়, ঠাহর করে দেখি। কে বট হে তুমি? অত লাবণ্য চাপা দেওয়া আছে রেলের টুপি ও কোটপ্যান্টে।

হাসলেই তখন ধরা পড়ে যায়। নতুন-চীনের কর্মচঞ্চলা মেয়েরা। রুপালি দাঁতের ঝিকমিকে সরল হাসি—অমন হাসতে ওরাই শুধু জানে। ড্রাইভার ছাড়া এ গাড়ির প্রতিটি কর্মচারী মেয়ে। মেয়ে-ড্রাইভারের গাড়িতেও চড়েছি এর পরে। এই বিপুল শক্তি ও মাধুর্য অন্ধকারে গুহায়িত হয়ে ছিল—এবারে ছাড়া পেয়েছে। তিন বছরের নতুন-চীনের তাই এমনতরো শক্তিমত্তা।

পাঁচ মিনিট তো অঢেল সময়—ট্রেন থামতে না থামতে হুড়মুড় করে নেমে পড়ল প্রায় সকলে। আমার দরজার সামনে দেখি, হাত বাড়িয়ে আছে কটা-চুল ঘোলা-চোখ লালমুখো এক সাহেব। আকারে বর্ণে পুরোপুরি সেই বস্তু—দেশে ঘরে এই সেদিন অবধি যাদের এক শ' হাত এড়িয়ে চলতাম। হাত জড়িয়ে ধরল সাহেবটা, কি-একটা নাম বলল, বাড়ি নিউজিল্যাণ্ডে। সাগর থেকে নতুন-ওঠা ভূমি—তাই নিউ সি-ল্যান্ড বা নিউজিল্যান্ড। এই ভৌগোলিক ব্যাখ্যা দিয়ে বললাম, নবীনতম আর প্রাচীনতম সুদূরবর্তী দু'টি ভূমিও বুঝি আজ ভালবাসায় বাঁধা পড়ল আমাদের নব সৌহার্দ্যের মধ্যে!

শুধু কি ঐ একজন? সবাই ঘুরছে ভাব করবার জন্য, যাকে পারছে পাকড়াও করছে। সে এক অভিনব ব্যাপার। সাদা আর কালো, এশিয়া আর ইউরোপ-আমেরিকা সেই স্টেশনের প্লাটফরমে প্রাণ খুলে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছে।

নতুন রেল বসাচ্ছে। মহা ব্যস্ততা সেদিকটায়। সময় নেই—দুর্যোগে অনেক পিছিয়ে রয়েছি, তাড়াতাড়ি সমস্ত শুধরে নিতে হবে—এমনি একটা ভাব সর্বত্র। যন্ত্রশক্তির তেমন তোড়জোড় নেই তো লাগাও মানুষ। শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে মানুষ হাতে কাজ করছে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলায়। একটুকু হৈ-চৈ নেই। কি করে হতে পারে, এ-ও এক দেখে নেওয়ার জিনিস। রেল-পথের ধারে টেলিগ্রাফ-লাইন—লম্বা লম্বা কাঠের গুঁড়ি পুঁতে পোস্ট বানিয়েছে। সিকি পয়সা ওরা অকারণ ব্যয় করবে না, অপব্যয়ের দিন এখন নয়—যা আছে তাতেই কাজ চালিয়ে নেবে।

স্টেশনের এই গ্রামটা বেশ বড়। খোলার বাড়ি বেশির ভাগ। আর দেখছি—খড় নয়, খোলাও নয়, বাঁশের বাখারির ছাউনি। ঘরবাড়ির ধাঁচ একেবারে আলাদা, যেমন ছবিতে দেখে থাকেন। আমাদের দেশের সঙ্গে মেলে না।

পাহাড় দেখা যায়, বিস্তর পাহাড়। দূরের পাহাড় কাছাকাছি আসছে। পাহাড় একেবারে ঘিরে ফেলেছে আমাদের।

ঐ—ঐ যে মহাপ্রাচীর!

গাড়ি ভরতি চলেছি আমরা পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের প্রায় সমস্ত দেশ ও জাতের মানুষ। মুহূর্তে সকলে শিশু হয়ে গেলাম। কৌতূহল-ঝলকিত চোখের দৃষ্টি। জানলার ধারে ভিড়, জানলার বাইরে মুখ বাড়িয়েছি।

একেবারে কাছে এসে গেছি। এমন বস্তু ধারণায় আনা যায় না। অতি-কায় এক অজগর সাপ এ'কে বে'কে ত্রিভুবন জুড়ে পড়ে রয়েছে যেন। উত্তুঙ্গ শিখরদেশে উঠেছে, নিচে নামতে নামতে চোখের আড়াল হয়ে গেছে আবার। ট্রেন কখনো প্রাচীরের পাশ দিয়ে, কখনো বা অতিক্রম করে চলেছে। চলতে চলতে কত টানেল, কত প্রস্রবণ, কত বাঁকাচোরা গিরিপথ পার হয়ে স্টেশনে নামলাম। স্টেশনের নাম ছিং-লুঙ-ছাও।

প্লাটফরমের উল্টো দিকে পাহাড়ের ছায়ায় পূর্ণাবয়ব এক বিশাল মূর্তি। ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তিনি, নাম—সেঙ-টিন-ইউ। এই দুর্গম অঞ্চলে তাঁরই কৃতিত্বে রেলগাড়ি এসেছে, রেলওয়ে সম্পর্কে বিস্তর উন্নতি-বিধান করেছেন তিনি। মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে অদূরবর্তী মহাপ্রাচীরের দিকে একবার নজর করে দেখে নিলাম। বিস্ময় লাগে। ভাবতে পেরেছি, কোন একদিন প্রাচীরের পদতলে এসে দাঁড়াবো চূড়ায় উঠবার আয়োজনে ?

জন দশেকে এক একটি দল, সঙ্গে দোভাষি এক চীনা বন্ধু। চলে বেড়ানোরই ব্যাপার—চড়াই ভাঙতে ভাঙতে খুশ মেজাজে কথাবার্তা চলে না, সেজন্য আজকে দোভাষি বেশি নেই। তবু মেয়েরা আছে দলের মধ্যে। পাহাড়ে ওঠা-নামা চাট্টিখানি কথা নয়—ভয় দেখিয়ে তাদের নিরস্ত করবার চেষ্টা হয়েছিল। তা শুনছে তারা! ছেলেরা পারে তো মেয়েরাই বা কম কিসে!

বীরত্ব দেখাবার প্রয়াসে তারাই আগে আগে পথ দেখিয়ে ছুটেছে। আর ছুটেছেন আমাদের দলের রোহিণী ভাটে। মারাঠি মেয়ে, নাচেন অতি চমৎকার। পিকিনে জমিয়েছিলেন ভারতীয় নাচ দেখিয়ে। লঘু শরীর—নাচতে নাচতেই যেন পাহাড়ে উঠছেন। অথবা পাখীর পাখার মতো বাতাসে আঁচল ফুলিয়ে উড়তে উড়তে যাচ্ছেন। কঠিন পাথরে পা ছোঁয় না ছোঁয়, ঝুপসি-ঝুপসি জঙ্গল গায়ে ঠেকে না ঠেকে—আলগোছে কেমন যেন আকাশে উঠে যাচ্ছেন!

চলেছেন গান্ধি-টুপি মাথায় রবিশঙ্কর মহারাজ। খালি পায়ে এসেছিলেন প্রচণ্ড এই শীতরাজ্যে। পশমের মোজা ও জুতোর আবরণেও আমাদের পা

কনকন করে—মহারাজ এক জোড়া স্যাণ্ডেল ধারণ করেছেন শেষ পর্যন্ত। পলিত-কেশগুম্ফ সত্তর বছরের যুবাব্যক্তিটি—পিছনে তাকাবার অভ্যাস নেই, ধীর পায়ে চলেছেন। হেসে ছাড়া কথা বলেন না, গুজরাটি এবং সামান্য হিন্দি মাত্র বলতে পারেন। সামনে-পিছে সর্বক্ষণের দুই অনুচর—অধ্যাপক শুকলা ও উমাশঙ্কর যোশি। আমাদের কথা শুনে নিয়ে এঁরা মহারাজকে বুঝিয়ে দেন, কথা বুঝে স্মিতহাস্যে মহারাজ আনন্দ জ্ঞাপন করেন।

চলেছেন সর্দার পৃথ্বী সিং। গান্ধিজী সর্দার বলে আহ্বান করেছিলেন; আর নামের সঙ্গে আজাদ জুড়ে জন্মভূমি পাঞ্জাব তাঁর বীর্যবত্তার পরিচয় দিত। গান্ধিজীর উপাধিটা নিয়েছেন তিনি, কিন্তু আজাদ নাম বাতিল। দীর্ঘ দেহ —বয়স হয়েছে, তা তিনি মানেন না। মানেন কী-ই বা! অমিত-শক্তি ইংরেজের প্রতাপ মেনেছেন কোন দিন? মেনেছেন সিপাহিশান্ত্রী-ঘেরা কারাগারের কঠিন শাসন? ডিটেকটিভ উপন্যাসকে হার মানিয়ে দেয় এই মানুষটির জীবন। আন্দামানে চির-নির্বাসনে ছিলেন—বারীন্দ্র, উপেন্দ্র বন্দ্যো প্রমুখ পুরানো বিপ্লবীদের সঙ্গে বিশেষ জানাশোনা। একদিন অকস্মাৎ উধাও আন্দামান থেকে। বৃটিশ-সরকারের হুলিয়া ছুটল দেশ-দেশান্তরে—পুলিশের মুঠো থেকে পৃথ্বী সিং পিছলে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছেন। স্থিতি হল রাশিয়ায় গিয়ে। অনেক দিন পরে ফিরলেন আবার দেশে—ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন, পুলিশ পাত্তা পায় না। গান্ধিজীর সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন আত্মসমর্পণ করতে। তার পরে—ঠিক মনে পড়ছে না—আটকে রেখেছিল বোধ করি কিছু দিন। বেরিয়ে এসে গান্ধিজীর সঙ্গে তাঁর আশ্রমে রইলেন। কিন্তু চলে গেলেন বছর কয়েক পরে—আশ্রমচর্যা মনের সঙ্গে নিতে পারলেন না। গান্ধিজীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রইল তবু।

এমনি সব বিপ্লবী বীরদের নিয়ে আমি উপন্যাস লিখেছি, তাঁদের প্রতি বড় অনুরাগ আমার। এ সব খবর আমিই বলি, কিম্বা আর-কেউ বলে থাকবেন। কেমন একটু বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাঁর সঙ্গে। খাওয়ার সময়টা প্রায়ই এক টেবিলে বসতাম গল্পগুজবের জন্য। শান্তি-সম্মেলনের মধ্যেই একদিন খাতা এগিয়ে দিলেন, নাম-ঠিকানা লিখে দাও। খাতা ফেরত পেয়ে হাতে গুঁজে দিলেন আবার। কিছু লিখে দাও ঐ নামের সঙ্গে। লিখলাম—মহাবিপ্লবীকে প্রণাম।

পৃথ্বী সিংকে দেখতে পাচ্ছি অদূরে। শালগাছের মতো সরল সমুন্নত। খাড়া হয়ে চলেছেন। একটা জিনিস শেখেন নি জীবনে—মাথা নিচু করা। তা

ঐ পাহাড়ে উঠছেন, সে অবস্থায়ও নয়।

এমনি চলেছি ট্রেনের জঠর থেকে বেরিয়ে-আসা আগন্তুক দল। পথ সংক্ষেপ করতে পাকদণ্ডীর পথ ধরেছি। দুর্গম পথ—বসে পড়ে জিরোচ্ছি ক্ষণে ক্ষণে। চারিদিকে নজর করি। আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে বিসর্পিল গতিতে উঠছে ঐ দলের পর দল। কতক আমাদের আগে চলে গেছে। কতক বা উঠে আসছে নিচে থেকে। পুরুষ আছে, মেয়ে আছে—একটা বাচ্চাও দেখতে পাচ্ছি সাত-আট বছরের। নানান জাতের মানুষ—পৃথিবীর কোন দেশের যে নেই, ঠিক করা শক্ত। পোশাক তাই বিচিত্র রকমের। ঝোপঝাপ ও শিলাখণ্ডের আড়ালে এই একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল, বেরিয়ে আসছে আবার পরক্ষণে।

অনেক কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে অবশেষে প্রাচীরের উপর ওঠা গেল। সপ্ত আশ্চর্যের সেরা বস্তুটি এখন এই পায়ের তলায়। চলো, এগিয়ে চলো—উঁচুর দিকে ক্রমশ। প্রাচীর ঐ পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় গিয়ে উঠেছে। তার পরে ঢালু হয়ে নেমে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেছে। প্রহ্লাদ গুরুমশায় বলতেন, দ্বাদশটি অশ্বারোহী—আমার তো মনে হল, বাড়তি আরও দু-পাঁচটি সহ ঘোড়দৌড় হতে পারে এখান দিয়ে। ছাতের আলসের মতো বেশ-খানিকটা উঁচু পাঁচিল দুদিকে—উত্তম ব্যবস্থা, নিচে পড়বার আশঙ্কা নেই। পাথরের উপর পাথর গেঁথে করেছে এই কাণ্ড; উপরের দিকে সেই পাথর কেটে ইটের মতো পাতলা করে বসিয়েছে—মানুষের চলাচলে কষ্ট যাতে না হয়। এমনি টানা চলেছে—কত দূর আন্দাজ করুন দিকি? পনের শ' মাইল। কখনো পর্বতশীর্ষ, কখনো বা নিম্নতম অধিত্যকার অন্ধি-সন্ধি অতিক্রম করে। এ মহাপ্রাচীর তৈরি শুরু হয় খৃষ্টের তিনশ' বছর আগে—সম্রাট অশোকের সমকালে। পঞ্চাশ বছর লাগে শেষ করতে। সে কি আজকের কথা! কি করে সে আমলে অত উঁচুতে তুলল এত পাথর! আর কি তাজ্জব দেখুন—পাঁচিল গেঁথে দেশের গোটা সীমানা ঘিরে ফেলে দিল মোঙ্গলদের রুখবার জন্য। আমরা গরু-ছাগল ঠেকাবার জন্য বাগানের বেড়া দিই—সেই গোছের ব্যাপার আর কি!

আলিগড়ের অধ্যাপক ডক্টর আলিম—চাপদাড়ি, সুন্দর সুগৌর চেহারা। আলসেয় ঠেশান দিয়ে দাঁড়িয়ে পুরানো ইতিহাস বলছিলেন তিনি। এত উদ্যম আর অধ্যবসায়ের মহাপ্রাচীর কি কাজে এলো শেষ পর্যন্ত? মোঙ্গলদের ঠেকানো যায় নি, কুবলাই খাঁ এসে মহাচীনে দখল গাড়লেন। আর এখনকার যুগে পাঁচিল তুলে শত্রু আটকাবো—হেন প্রস্তাব ভাবতে যাওয়াই হাস্যকর। মানুষের

পাখনা হয়েছে, আকাশে উড়ে উড়ে লড়াই। মেঘের চোরাগোপ্তা পথে যাতায়াত। মহাপ্রাচীর কত নিচে মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে—এখনকার দিনে সে কিছু ধর্তব্যের বস্তু নাকি? এত মানুষ মিলে এত বড় কাণ্ড করেছিল, কিছুই মুনাফা হল না কোন কালে। শুধু সপ্ত আশ্চর্যের একতম হয়ে রইল—স্থাপত্যের চূড়ান্ত নিদর্শন। দেশবিদেশের মানুষ এসে দেখে যায়—প্রত্নতাত্ত্বিকের গর্বের জিনিস। প্রাচীরের উপর কতকগুলো ঘাঁটি তৈরি হয়েছিল, দেখলাম, গত লড়াইয়ের সময়—আকাশমুখী কামান বসানো হয়েছিল। দুশমনি প্লেন ঘায়েল করা হত। এখন সীমাহীন প্রশান্তি চারিদিকে—শুধু প্রাচীরের উপর ভাঙাচোরা পাথরের গাঁথনিতে সেই ভয়ঙ্কর দিনের সামান্য দাগ লেগে আছে।

দেশে থাকতে শুনেছিলাম, জড়বাদী নতুন-চীন মহাপ্রাচীর ভেঙে তছনছ করেছে; পাথর খুলে খুলে দশ রকম কাজে লাগাচ্ছে। আরে সর্বনাশ, বাটালি মেরে একটি টুকরো-পাথর খসাতে যান দেখি! দশ রকম কৈফিয়তের তালে পড়বেন। পুরানো জিনিস নিয়ে এত দেমাক তামাম দুনিয়ায় আর কোন জাতের নেই। বাঘিনী শাবক আগলে থাকে—প্রায় সেই অবস্থা। ধর্মকর্মের বড় ধার ধারে না, তা সত্ত্বেও দেখে আসুন গিয়ে—এই নতুন আমলে হাজারো রকম কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে বে-মেরামতি বৌদ্ধমন্দিরগুলো ভারা বেঁধে রাজমিস্ত্রি লাগিয়ে ঠিকঠাক করছে, অস্পষ্ট প্রাচীন দেয়ালচিত্রে নতুন করে রং ধরাচ্ছে।

দেড়হাজার মাইল-জোড়া পাঁচিল, একটুখানি বস্তু নয়। তার উপর বয়সেও কত বুড়ো হল বিবেচনা করে দেখুন—প্রায় বাইশ শ' বছর। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে কত শত বার, জনপদের উত্থান-পতন ঘটেছে। অতএব দশ-বিশ জায়গায় আপনি ভেঙে পড়তে পারে, সেটা কিছু নয়। ইচ্ছে করে ভাঙা হয়েছে গোটা কয়েক জায়গায় নতুন রেল-লাইন বসাবার প্রয়োজনে। মহাপ্রাচীর এখন আর চীনের সীমান্ত নয়। প্রাচীর পার হয়েও অনেক দূর অবধি চীনদেশ। নব জীবনের বার্তা ছুটেছে দেশের সর্ব অঞ্চলে—প্রাচীর ভেঙে রেললাইন বসিয়ে তারই পথ হয়েছে...

দলে দলে উপরে উঠে যাচ্ছে—আমরা দু'জনে বসে পড়েছি এক ধাপের উপর। আমি আর বর্ধমানের সন্তোষ খাঁ। সান্ত্বনাও আছে অবশ্য—আমাদের নিচে ঐ কত জন বসে হাঁপাচ্ছে। অনেক দূর উঠেছি—যত উপরেই যাই, একই ব্যাপার—কি হবে মিছামিছি দেহযন্ত্রটা খাটিয়ে? দিব্যি বসে বসে দিগ্‌-ব্যাপ্ত মহাচীনের শোভা দেখা যাচ্ছে। ঘর-বাড়ি উঁকি দিচ্ছে গাছপালার

ভিতর থেকে। রেল-লাইন এক সুদীর্ঘ সরীসৃপের মতো পাহাড়-জঙ্গলের ভিতর এঁকেবেঁকে শুয়ে রয়েছে। শীতল গিরিবায়ু সর্ব শরীর জুড়িয়ে দিয়ে গেল...

উচ্ছল কলহাস্য এক টুকরো। এক তরুণী লাফাতে লাফাতে উঠে এলো। ভারি সুন্দরী। অলকগুচ্ছ কপালের উপর এসে পড়েছে। এক রাশ বন-ফুল তুলে এনেছে পথের ধার থেকে। কি কৌতুকে পেয়ে বসেছে—ঝুঁকে পড়ে ফুলের থোলো ঘোরাল সে আমাদের দু-জনের মুখের সামনে। আরতির সময় যেমন পঞ্চপ্রদীপ ঘোরায়। কোন্ দেশের মানুষ, কি বৃত্তান্ত, কিছু জানি নে—এর আগে চোখেই দেখিনি মেয়েটাকে। বার কয়েক ফুল নেড়ে ডান দিক ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে ধুপধাপ ছুটে বেরুল। সঙ্কোচের বালাই নেই—এ কেমন-ধারা উল্লাসিনী গো! ছুটতে ছুটতে নাচতে নাচতে চলে গেল। প্রাচীরের চূড়ায় চূড়ায় সঞ্চারিণী অপরূপ এক বিদ্যুল্লতা।

পরে আরও দেখেছি তাকে। কনফারেন্সের মধ্যে দেখতাম শান্ত অচপল মূর্তি। একমনে বক্তৃতা শুনছে, কদাচিৎ নোট নিচ্ছে কপোত-আঁকা সবুজ পকেট-বই খুলে। সাংস্কৃতিক কমিশনেও দেখেছি—রাত তিনটে বেজে গেছে, সদস্যেরা উসখুস করছেন আসর ভেঙে ঘরে যাবার জন্য। কিন্তু বিতর্ক শেষ হবার আশু সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটা দু'টি আঙুলে আঙুরের থোলো থেকে ফল ছিঁড়ে ছিঁড়ে আলগোছে গালে ফেলছে, আর পাশের লোকটির সঙ্গে চাপা গলায় কি আলোচনা করছে। লোকটি তার স্বামী—খবরের কাগজ চালান এবং কিছু কিছু সাহিত্যচর্চা করেন। পরে এক সাহিত্যিক কনফারেন্সে খুব ভাবসাব হয়েছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে। স্বামী-স্ত্রী জোড়ে এসেছেন। পিকিন ছাড়বার আগের দিন ক্ষিতীশ আর আমি বাজার চুড়ছি—ঐ দম্পতির সঙ্গে দৈবাৎ দেখা। ভদ্রলোক নিয়মমাফিক স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মেয়েটা নিঃসংশয়ে ভুলে গেছে মহাপ্রাচীরের উপর আর একদিনের ক্ষণ-চাপল্য। পিকিন থেকে ও'রা দেশে ঘরে ফিরছেন না, জোড় বেঁধে এখন য়ুরোপে চললেন। এদেশ-সেদেশ ঘুরে ঢুঁ মারবেন অবশেষে ভিয়েনা-কনফারেন্সে।

দেখাশুনোর পাট চুকল, আর নয়—নিচে নেমে সবাই এবার স্টেশনে গিয়ে জুটব। আপন মনে ফিরে চলেছি আমি। প্রখর রোদ, বেশ কষ্ট হচ্ছে। পথ সংক্ষেপ হবে বলে জঙ্গলে ভরা সুঁড়িপথে এসে পড়েছি। একলা। এদিক-

ওদিক তাকাই। উপরে ও নিচের দিকে সঙ্গীদের দেখা যাচ্ছে। কোন-একটা দলে গিয়ে জোটা কঠিন নয়। কিন্তু প্রয়োজনই বা কি? পথের আন্দাজ হয়ে গেছে—স্টেশনে ঠিক গিয়ে পেঁছিব, হয়তো বা ঘুরপথ হবে একটু-আধটু। সে এমন কিছু নয়।

কিন্তু তৃষ্ণা পেয়ে গেল যে! তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায়। এক ঢোক শীতল জল—পথ চলা নইলে অসম্ভব হয়ে উঠছে।

আঃ, মিলে গেছে! বাঁক ঘুরেই দেখি কলস্বনা ঝরণা। কপোত-চক্ষুর মতো নির্মল জল বনান্তরাল হতে বেরিয়ে উপল-বিছানো খাতে লাফিয়ে পড়ছে, তার পরে ধীর বেগে বয়ে চলেছে সঙ্কীর্ণ ধারায়।

কোন অলক্ষ্য-দেবতা অবস্থা বুঝে মিলিয়ে দিলেন। নেমে যাচ্ছি ঝরণার দিকে। দৌড়ানো বলা যেতে পারে। আঁকা-বাঁকা পথ অতিক্রম করে ঈপ্সিত জলের ধারে এসে পড়েছি, অঞ্জলি ভরে জলও তুলেছি—

চিৎকার এলো, কে যেন হুমকি দিয়ে উঠল কোথা থেকে। চমক লাগে। হাত কেঁপে অঞ্জলির ফাঁকে জল পড়ে যায়। না, মনের ভুল নয়—ছুটে আসে একটি লোক—চেঁচাচ্ছে, কথা বুঝতে পারি না তাই প্রবল বেগে হাত-মুখ নেড়ে মানা করছে। সাধারণ গ্রাম্য মানুষ—দোভাষি কিম্বা আমাদের চেনা-জানা কোন প্রাণী নয়।

অবাক হয়ে আছি। কেন এমন করে? বিদেশ-বিভুঁই জায়গা—রীত-প্রকৃতি কিছু বুঝি না এদের। লোকটা একেবারে পায়ের কাছে এসে ইসারা করছে তাকে অনুসরণ করতে। কি মতলব কে জানে! হতভম্ব হয়ে পিছু পিছু চলি।

রেল-লাইন অবধি নিয়ে এলো সঙ্গে করে, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল স্টেশনটা। সহসা হাত বাড়াল বন্ধুত্বের ভাবে, সেকহ্যান্ড করে ফিরল বনপথ বেয়ে। ভারি রহস্য তো! হাঁ করে চেয়ে আছি যতক্ষণ না সে নজরের আড়ালে গেল।

স্টেশনে সকলে কলরব করে ওঠেন, একা কোন দিকে কেটে পড়েছিলেন? ট্রেন ছাড়বার সময় হল।

তৃষ্ণা মেটাই তো সকলের আগে! সাদামাঠা জল চাইলাম, দিল এনে বোতলের মিনারল ওয়াটার। মন্দ কি! ঢক-ঢক করে পুরো গ্লাস গলায় ঢেলে সুস্থ হয়ে বৃত্তান্ত নিবেদন করলাম।

পাগল বোধ হয় লোকটা!

দোভাষি বলে, কি সর্বনাশ! ঝরণার জল খেতে গিয়েছিলে—জলে হয়তো বিষ।

মুখে এক ধরনের হাসি, ঘৃণা উপছে পড়ছে সেই হাসিতে। বলে, এক ফোঁটা তেষ্টার জল—তা-ও নির্ভয়ে মুখে দেওয়া যায় না শয়তানির ঠেলায়।

জল না ফুটিয়ে খায় না এ-তল্লাটে। স্বাস্থ্য-ব্যাপারে কড়া নজর—এটা কিন্তু ঠিক সেইজন্যে নয়। মার্কিন সৈন্য কোরিয়ায় জীবাণু-বোমা ফেলে গেছে। কিছু কিছু এ দিকেও না পড়েছে এমন নয়। এখানে-ওখানে যে-কয়েকটার সন্ধান পাওয়া গেছে, তার বাইরেরও থাকতে পারে। পদে পদে তাই এত সতর্কতা। বিদেশি মানুষ—আমি তো অত শত জানিনে—চাষী লোক চাষ ফেলে সামাল করতে এসেছিল তাই।

স্পেশাল গাড়ি চলল আবার পিকিনমুখো। খাবার পরিবেশন করে গেল টেবিলে টেবিলে—পরিবেশকদের হাতে দস্তানা, নাকে-মুখে কাপড়ের ঢাকনি! (মোটর-ড্রাইভারদের এমনি দেখেছি। ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা বাড়ি ফিরছে —ধুলোর ভয়ে তাদেরও নাকমুখ ঢাকা) অপারেশনের সময় ডাক্তার-নার্সদের যেমন দেখে থাকি। কামরা ঝাঁট দিয়ে যাচ্ছে কিছু সময় অন্তর। একবার লাউড-স্পীকারে বলল, কাচের জানলাগুলো খুলে দাও—বাইরের বাতাস চলা-চল করুক। কর্মচারী মেয়েগুলো জানলা খুলতে লাগল, আমরা সাহায্য করি। আবার এসে তারের কবাট ফেলে দেয়, মাছি আর ধুলো যাতে না ঢোকে। বীজাণু-যুদ্ধের ব্যাপার বাদ দিয়েও তামাম জাত অতিমাত্রায় স্বাস্থ্য-সজাগ হয়ে উঠেছে। প্রায় ছুঁৎমার্গীয় অবস্থা।

আমাদের বন্ধু প্রশ্ন করলেন, ছিং-লুঙ-ছাও স্টেশন কত মাইল পিকিন থেকে?

জানি নে তো—

তবে সমস্ত দিন ধরে কি লিখলেন মশায়? ট্রেনে আর স্টেশনে লিখলেন, পাঁচিলের উপর বসে বসে লিখলেন—এই সামান্য কথাটা খোঁজ নিলেন না কারো কাছ থেকে?

ভুল হয়ে গেছে দেখছি। তা না-ই বা থাকল আমার লেখায় হিসাবপত্রের ফিরিস্তি!

শৈলেন পাল ওদিকে ধমকাচ্ছেন। এ কি হল! সিগারেটে পুড়িয়ে ফেললেন চেয়ারের চাদর।

লজ্জার কথা সত্যি। সামান্য সিগারেটটাও কায়দামাফিক ধরিয়ে টানতে পারি নে। তার উপরে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি এত দেশের এতগুলো মানুষের দিবসব্যাপী সান্নিধ্যে। বহু তীর্থনদীর বিচিত্র সঙ্গমে আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে আছি, অত শত হুঁশ থাকে না।

মতামত চাইতে এলো রেলগাড়ির পরিচালনা সম্পর্কে। আরো কি রকম উন্নতি হতে পারে, সেই পরামর্শ যদি দিতে পারি। লিখতে দিচ্ছে একটা করে ছবি-আঁকা মনোরম কাগজ। না লিখে পকেটে পুরতে লোভ হয়। কিন্তু এতগুলো চোখ!

লিখলাম, তোমাদের সঙ্গে আজকের এই মধুর ভ্রমণ চিরকাল আমার মনে থাকবে।

(১৪)

পরের দিন। ডেলিগেট-সভা চুকল তো সাংস্কৃতিক সভা। মানুষ এত বকতেও পারে! সেই আটটার মুখে জলযোগ সেরে এসে বসেছি, তারপর থেকে এই চলেছে। এত ধকল সইবে তো কলম-পেশার নির্বাক কাজ নিয়েছি কেন? অন্তত একটা হাফ-নেতা হওয়া কি যেতো না! সে পথ মাড়াই নি —এবম্বিধ মীটিং করা এবং তৎপরে খবর-ছাপানোর জন্য কাগজওয়ালাদের তোয়াজ করতে হবে, এই ভয়ে। তবে বিদ্যে এবং রুচিজ্ঞান কিছু বেশি হয়ে গেছে নেতা হওয়ার পক্ষে, এমন কথাও আপনারা অবশ্য বলতে পারেন।

সে থাকগে। মনে মনে এতক্ষণ ধরে এক ভীষণ সঙ্কল্প ভেঁজে নিয়েছি। রাস্তায় হাঁটব, যত্রতত্র ঘুরে বেড়াব। জীবনে ঘেন্নাধরে যায় ঐ এক এক ফোঁটা ছেলে-মেয়েগুলোর জ্বালায়। ক্ষুদে অভিভাবক হয়ে বুড়ো বুড়ো নাবালক-দের খবরদারি করে বেড়াবে। নিতান্ত অবোধ যেন আমরা এক-একটি, কিছু বুঝি না সংসারের—কোথায় কখন গোলমাল ঘটিয়ে বসি, সেই ভয়ে সদা তটস্থ। আয়েসের সুধা-তরঙ্গে হাবুডুবু খাচ্ছি—দাও না বাপু গোলমালের চোরা-বালিতে একটুখানি পা ঠেকাতে। হোক না একটু পথের গণ্ডগোল—এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে বেড়াই, ঠকেই আসি না হাজার কয়েক ইয়ুয়ান সওদা করতে গিয়ে। রবীন্দ্রনাথ আওড়াচ্ছি মনে মনে—'পুণ্যে পাপে সুখে দুখে পতনে

উত্থানে মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে'—তা বিশ-বাইশের গরবিনী ঐ মা-জননীরা বুঝবে সেকথা!

মরীয়া আজকে, পালাবোই। তোমাদের বিনা মাতব্বরিতে বহাল তবিয়তে বেড়াতে পারি, প্রমাণ করে ছাড়ব। ক্ষিতীশ দু'দিন ধরে একটা টাইয়ের কথা বলছে, নিজেরাই টাই কিনে চোখের উপর মেলে ধরব, কেমন—পারি না যে?

গলা খাঁকারি দিয়ে বেরিয়ে এলাম। থুতু ফেলতে বাইরে যাচ্ছি এই আর কি! ক্ষিতীশের দিকে চোখ টিপে এসেছি। অনতিপরে সে-ও এলো।

নিচের তলায় মীটিং, এই বড় সুবিধা। অধিক আগল পেরোতে হবে না বড়-দরজা পার হতে পারলেই লন, এবং তার পরেই রাস্তা। লনেও বিপদ থাকতে পারে। কিন্তু এই দেড় প্রহর বেলায় সকলেই প্রায় মীটিঙে তালে ব্যস্ত—সুড়ুৎ করে লনটুকু পিছলে যাওয়া যাবে না, তবে আর বড়-বিদ্যার কি শিখলাম এতদিনে!

আঃ, করো কি ক্ষিতীশ! তাকিও না কোনদিকে—ঝুপ করে বসে পড়ো সোফার উপর।

দোভাষি ছাত্র একটি আসছে। না, আমাদের দিকে নয়; আমাদের সন্দেহ করেনি। এমনি শঙ্কিত মন—সিঁদুরে মেঘ দেখলে অগ্নিকাণ্ড বলে ভাবি। সিঁড়ি বেয়ে ছোকরা তরতর করে উপরে উঠে গেল। চলে যাক একেবারে দৃষ্টির আড়ালে। আমরা বাপু নিতান্তই ক্লান্ত হয়ে বসে আছি। দুষ্ট বুদ্ধি কিছু নেই, জিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আবার মীটিং-ঘরে।

গেছে চলে তো? এখন এগারোটা। একটায় লাঞ্চ—পাক্কা দু-ঘণ্টা। কাছে-পিঠেই একটা বাজার লক্ষ্য করা গেছে—মরিশন স্ট্রীটের উপর। বাজার ঢুঁড়বো, চলো—

কি আনন্দ! পায়ে হেঁটে বেড়ানো পিকিনের রাস্তায়—মোটরের গর্তে বসে নয়। পিকিনের পথের ধুলো লাগছে পায়ে। পায়ে নয়, জুতোর তলায়। আর ধুলোই বা কোথা—ধুলো কি থাকতে দিয়েছে কোন খানে? যা-ই বলুন, এ-ও এক রকমের ব্যাধি। ধুলো-ময়লা মশা-মাছি নিয়ে শুচিবাই। আমার সেজ-খুড়িমার মতো—সর্বত্র গোবর লেপে তিনি নির্ভাবনা হতেন।

চলেছি। লোকে তাকাচ্ছে আমার দিকে। উৎসাহী কেউ কেউ পিছু নিচ্ছে। একবার দাঁড়িয়েছি পথের পাশে দোকানের জানলায়। পিছন ফিরে

কি আশ্চর্য! জাত-ভাইয়ের গলা—হিন্দি জবানে বলছে। কি আনন্দ যে হল! ইচ্ছে করে, আধবুড়ো মানুষটাকে কাঁধে তুলে নাচাই।

বলে, বেরুমল আমার নাম। ঘর সিন্ধুদেশে। জমিজিরেত-ঘরবাড়ি সমস্ত এখন পাকিস্তানে। আপনারা আসছেন, কাগজে দেখতে পাচ্ছি। তা মশায়, আমরা পুঁটিমাছ—অত বড় মচ্ছবে মাথা সেঁধুতে ভয় পাই। জানি, এসেছেন যখন—পায়ের ধুলো একদিন পড়বেই। চিনে চিনে ঠিক এসেছেন।

এসেছি কিন্তু না চিনেই—

বেরুমল মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন।

দেখুন তাই। চিনবার কোন উপায় রাখতে দিল কি? দেশের মানুষের মুখ দেখতে পাইনে। কালেভদ্রে কেউ যদি এসে পড়ে—সেই জন্যে ধরাপাড়া করলাম, বাপু হে, তোমাদের চীনে হিজিবিজি কে বুঝবে, সাইনবোর্ডখানা ইংরেজিতে লিখিয়ে দি—'ইন্ডিয়ান সিল্ক সপ'। তা বিদেশি হরপ চীনা-মানুষের চোখে পড়লে এদের মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়। সদর জায়গায় চীনা ছাড়া আর কোন লেখা থাকতে দেবে না। এমন গোঁড়া বামনাই দেখেছেন মশায়, ভুভারতে?

বটে তো! পথে ঘাটে এ ক'দিন যত লেখা দেখছি সমস্ত চীনা। গোটা চার-পাঁচ ক্ষেত্রে কেবল চীনার সঙ্গে একত্র রাশিয়ান দেখেছি। চারটে কি পাঁচটা পোস্টার—তার অধিক হবে না। নিজের ভাষা ছাড়া আর-কিছু লোকের নজরে আসবে না—এ কিন্তু গোঁড়ামি। আমরা কত দরাজ, বিবেচনা করুন তা হলে। এই কলকাতা শহরে, কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বমুখ হয়ে পাদচারণা করুন, বিশ্বভুবনের যাবতীয় বর্ণমালা মিছিল করে দেখা দেবে। মানি, পুরানো জাত তোমরা, অতি-পুরানো সংস্কৃতি—ঐশ্বর্যবান তোমাদের সাহিত্য। তা আমরাও কম হলাম কিসে? অত ঠেকার আমাদের নয়।

পরে আরও এক নমুনা দেখেছিলাম, পিকিন ছাড়বার মুখোমুখি সময়টা। শান্তি-সম্মেলন চুকে যাবার পর যতদিন ছিলাম, শুধুমাত্র মেলামেশা—ভাবের লেনদেন। আমাদের সাহিত্যিকদের কয়েকজনকে নিয়ে একটুখানি বৈঠক হচ্ছিল। সামান্য ব্যাপার—জন আষ্টেক সাকুল্যে, তন্মধ্যে দু-জন ওঁদের। ওঁরা বলছেন চীনা ভাষায় দোভাষি ইংরেজি করে বুঝিয়ে দিচ্ছে। একটা জিনিস ঠিক বোঝাতে পারছে না দোভাষি, লাগসই কথার জন্য কাতড়াচ্ছে। বক্তা টুক করে জুগিয়ে দিলেন কথাটা। তবে তো মাণিক, জানো তোমরা ইংরেজি, ভাল

দেখি, ভিড় জমে গেছে। ও-ফুটপাথের লোকও রাস্তা পার হয়ে আসছে। তখন মালুম হল। এই কৃষ্ণমূর্তি—তার উপর পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি-আলোয়ান। আজব চিজ পথে বেরিয়েছে, নিতান্ত অন্ধজন ছাড়া আসবেই তো ছুটে। নিখরচায় চিড়িয়াখানার মজা! বিপদ কত দিক দিয়ে কত রকম ভেবেছি, এক-চক্ষু হরিণের মতো এটা ভেবে দেখিনি তো!

একবার ওদের দিকে তাকাই, একবার বা নিজের দিকে। ফরসা মানুষদের মধ্যে দেহবর্ণ আরও যেন ঘন দেখাচ্ছে। কৃষ্ণের বেদনা, আপনাদের মধ্যে যাঁরা গৌরাঙ্গ আছেন, বুঝতে পারবেন না। চারু-দার কথা মনে পড়ে। ফড়খেলা হচ্ছিল যশোরের এক মেলায়—চারু-দা ইস্কাপনের উপর এক আনা ধরলেন। হল না, গুঁটি অন্য ঘরে। আনিটা বাজেয়াপ্ত করে ফড়ওয়ালা বলে, ফরসা—। তার মানে, ঐ ঘর ফাঁকা—গুঁটি পড়ে নি। চারু-দা তৎক্ষণাৎ আর এক আনা বের করে সেই ঘরে রাখলেন। বলেন, আর একবার বলো ভাই ফরসা। পাওনা হলেও চাইনে। আমার দিকে চেয়ে 'ফরসা' আজ অবধি কেউ বলে নি।

দ্রুতপথে হাঁটছি। ভিড় পিছনে ফেলে এগিয়ে উঠব। হাঁটা আর বলি কেন, দৌড়ানো। ক্ষিতীশের কোট-পাৎলুন—গঙ্গাজলের ছিটার মতো ঐ পোশাক-মাহাত্ম্যে তার কালো রঙের পাপ খণ্ডন হয়ে যায়। গায়ে চাপিয়েছে কি সাহেব। দূর থেকে সে হাঁক পাড়ছে, দাঁড়ান—

দাঁড়িয়ে মরি আর কি ভিড়ের ঠেলায়! মানুষ-চলাচল বন্ধ হবার জোগাড় —ট্রাফিক-পুলিশ শেষটা থানায় নিয়ে তুলুক! মহাকালের মতো চলতেই হবে আমায়, থামা চলবে না। সাহেব হয়ে পথে বেরিয়েছ, ভাগ্যবান তোমরা—হেলতে দুলতে ইতি-উতি দেখে শুনে গজেন্দ্র-গমনে এসো।

নতুন বিপদ। একদল সৈন্য ওদিককার পথ ধরে মরিশন স্ট্রীটে পড়ছে। পথ আটকে গেছে, ওদের লাইন শেষ না হওয়া অবধি এগোবার উপায় নেই। গতিশীল ভিড়টাও থমকে দাঁড়িয়েছে আমার সঙ্গে। সৈন্যেরা কুচকাওয়াজ করে খুব সম্ভব আসন্ন উৎসবের মহড়ায় চলেছে। কিন্তু তাদের চেয়ে বেশি দ্রষ্টব্য এখন আমি—আমারই উপর সমস্তগুলো চোখ। উপায়?

চতুর্দিকে দেখে নিলাম এক নজর। সৈন্যেরা যাচ্ছে তো যাচ্ছেই—পথ খালি হবার আশু সম্ভাবনা দেখিনে। বড় দোকান একটা। অকূলে ভাসমান—তৃণ কি মহীরুহ বাছবিচারের সময় নেই। যা থাকে কপালে—কাচের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম ভিতরে। আপাতত নিরাপদ তো বটেই!

আইয়ে বাবুজি—

রকমই জানো—এ ধকল দিচ্ছ কেন? মারফতি কথা না বলে মুখোমুখি চালাও তবে ইংরেজি।

সে হবার জো নেই। চীনা সাহিত্যিক চীনভূমির উপর দাঁড়িয়ে ভিন্ন ভাষায় কথা বলবে—কেন, ওঁদের ভাষা-সাহিত্য কম জোরের হল কিসে? মুখের বুলি কারো খাতিরে ভিন্ন দেশের চেহারা নেবে না—গরজ থাকে, তোমরা বুঝে নাও তর্জমা করিয়ে। আমাদের মওলানা আজাদেরও ঠিক এই রীতি। উর্দু ছাড়া অ-কুলীন কোন ভাষা জিভের ডগায় ঠাঁই দেন না।

আর, আমার কথা বলা যায়—মানুষটা আমিই বা কম কিসে? ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এই যে লোকের দৃষ্টিশূলের খোঁচা খাচ্ছি, পোশাকের এমন-অমন হলে তো হাঙ্গামা ছিল না। হবার জো নেই—আত্মম্ভরিতা। বাঙালি মানুষ বাইরের দেশে এসেছি তো বাঙালি হয়েই ঘুরব। গরজে ভোল বদলাতে হলে সাহেবেরা আমাদের দেশে, অন্ততপক্ষে সামাজিক ব্যাপারে, ধুতি পরবে না কেন?

বেরুমল বলছিলেন, শেষ অবধি কথা হল ভারতের পতাকা আঁকা থাকবে আমাদের দোকানের সাইনবোর্ডের উপরে। আমতা-আমতা করে ওঁরা রাজি হলেন—ভারত-দূতাবাস থেকে যদি কিছু না বলে। তারা কি বলবে! দূতাবাস-গুলোই আমার খদ্দের—নানান দেশের ওঁরা আছেন বলেই কায়ক্লেশে টিকে আছি। তাই চক্রধারী পতাকা রয়েছে দোকানের সাইনবোর্ডে, আর এক শাড়ি-পরা মেয়ে আঁকিয়ে রেখেছি দরজার পাশে। কিছুতে কিছু হয় না, কে দেখে এত খুঁটিনাটি নজর করে? এই আপনাকে দিয়েই বুঝুন না।

ক্ষিতীশ ঢুকেছে আমার পরেই। এখানেও টাই মজুত বহুত রকমের। কর্মচারীরা চীনা—তাদের একজন দেখাচ্ছিল। বেরুমল তিন লাফে সেখানে গিয়ে পড়লেন। গোটা চারেক বাক্স বাতিল করে টাই বের করলেন একটার ভেতর থেকে। মেলে ধরে বললেন, দেখুন তাকিয়ে—আসল আমেরিকান চিজ। পঁচিশ হাজার। কাঁইকুই করবেন না, দিল খুলে গলায় বেঁধে নিন। দেশের মানুষ—দুটো পয়সা কম নেবো তো বেশি নয়।

ক্ষিতীশ দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলে, কিন্তু অন্য জায়গায় আলাদা দর দেখে এলাম। ঠিক এই রকম জিনিসই তো!

বেরুমল হেসে ওঠেন।

আরে মশায়, চাঁদ বাঁকা আর তেঁতুলও বাঁকা। তামাম পিকিন ঢুঁড়ে হেন বস্তু আর একটি মিলবে না। পাবেন কোথা? বাইরের আমদানি বন্ধ—

অতি-দরকারি জিনিস ছাড়া আনতে দেবে না। নিজেরা যা বানাচ্ছে, তাতেই চালিয়ে-চুলিয়ে নাও। দর বাঁধা—আমদানি কম বলে যে দুটো পয়সা চড়িয়ে দেবেন, সে জো নেই। বিদেশি মালে তবু শতকরা তিরিশ অবধি মুনাফা দেয়, ওদের ঘরের জিনিসের উপরে খুব বেশি হল তো বারো। খরচখরচা কষে সরকারি লোক দর ঠিক করে দিয়ে যায়; সেই দর সেঁটে রাখো মালের গায়ে। খদ্দের সেজে ওরাই আবার ঢুকে পড়ে মাঝে মাঝে, সাঁটা দরের হেরফের হল কিনা তদারক করে যায়। বলেন কেন, নিকুচি করেছে পোড়া দেশের ব্যাপার-বাণিজ্যের!

বেরুমলের এক কনিষ্ঠ আছেন, তিনি এসে জমেছেন। ফোড়ন দিচ্ছেন মাঝে মাঝে।

ঐ যে তিরিশ পার্সেন্ট—সে-ও কেবল কানে শুনতে। স্টেট বারো পার্সেন্ট ট্যাক্স টেনে নেয় ওর থেকে, কত থাকল তবে হিসেব করুন। চলে?

সহসা গলা নামিয়ে বলেন, বাইরের মাল বলে আমাদের সঙ্গে হিসেবের খুব কড়াকড়ি করতে পারে না—এই যা। আপন লোকের কাছে ঢাকাঢাকি কি—সামান্য হলেও আছে কিছু। কিন্তু নতুন মাল আসতে দেবে না—তা হলে ব্যবসা আর ক'দিন?

বেরুমল বেজার মুখে বললেন, পুরানো জিনিস ক'টা কেটে গেলে—ব্যস, হাত-পা ধুয়ে ঘরমুখো জাহাজে ভাসব। ঘরই বা কোথায়, বেড়াবো আপনাদের দিল্লি-কলকাতার পথে পথে।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। রকমারি সিল্কে ঘরের ছাত অবধি ভরতি।—এই পর্বতপ্রমাণ সংগ্রহ কয়েকটা জিনিস বলে উল্লেখ করে বেরুমল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ভাবনা কিসের? আপনাদের এই মালের কাটান দিতেই তো কলি কাবার—কনিষ্ঠ বললেন, এ আর কি দেখছেন? একেবারে নস্যি মশায় আগের তুলনায়। পাশের ঐ দোকান, ওটাও আমাদের ছিল—এই দোকানের লাগোয়া। ভাড়া দিয়ে দিয়েছি। এ বাড়ি নিজস্ব আমাদের। মেয়েছেলেরা উপরে থাকে, নিচে দোকানপাট।

বেরুমল বলেন, পঞ্চাশ বছরের দোকান, এক-আধ দিনের নয়। আমি নিজেই পিকিনে রয়েছি তিরিশ বছর। হাজার হাজার চীনা, বিবেচনা করে দেখুন, আমার দেশে ভাত করে খাচ্ছে। আর এই এত বড় শহরে গোটা পাঁচ-ছয় ভারতীয় দোকানের সমস্ত গেছে—শেষ আমিও যাই যাই করছি। তখনই

মশায় আঁচ করেছিলাম, চিয়াঙের দল খেদিয়ে এরা যখন এসে পড়ল। ভায়াকে বললাম, একেবারে ছেড়েছুড়ে যাওয়া ঠিক হবে না—কাঠামোটা ঠিক রেখে ওদের ভাব-সাব বুঝতে লাগো। স্বদেশের হাল দেখে আসিগে আমি। ইটখোলা করলাম আপনাদের কলকাতার কাছে সোনারপুরে। ব্যবসা জমে যায় তো সবসুদ্ধ দেশে গিয়ে পড়ব ঝাড়ু মেরে এই ছ্যাঁচড়া কারবারের মুখে। তা গেরো খারাপ মশায়! চোতমাসে এমন বিষ্টি—খানা খুঁড়ে ইট বানিয়েছিলাম, কাঁচা-ইট গুলে গিয়ে সে খানা সঙ্গে সঙ্গে ভরাট। ইটখোলা তোবা করে আবার জাহাজে চড়লাম। পুনর্মুষিক হয়ে পড়ে আছি।

দেশের মানুষ পেয়ে মনের ব্যথা খুলে বলছেন। আমাদের সমবেদনা হওয়া উচিত, আর হচ্ছেও তা। তবু এক জায়গায় বসে কাঁহাতক এক কাঁদুনি শোনা যায়? চুপিসাড়ে বেরিয়ে এসেছি,—অনেক কৌশলের একটুখানি ছুটি। তা বেশ তো—জানাজানি হয়ে গেল, আসা যাবে আবার। আছি এখনো বেশ কিছুদিন—কতবার আসব! গরজও আছে। অনেক দিন ধরে আছেন—চীনের সঠিক খবর নিতে চাই আপনাদের কাছে। দু'পাঁচটা এখানকার হালকা জিনিস নিতে চাই দেশের বন্ধুবান্ধবের জন্য—কেনাকাটার ব্যবস্থা করে দিতে হবে কিন্তু।

নিশ্চয়, একশ' বার। আত্মীয়জন ভাববেন আমাদের। যা যখন দরকার পড়ে। দোকান বন্ধ থাকে তো ঐ পাশের দরজায় বোতাম টিপবেন। উপরে থাকি সকলে। একদিন খেতে হবে কিন্তু আমাদের বাড়ি, সবাইকে পায়ের ধুলো দিতে হবে। এত জনকে একসঙ্গে পাওয়া ভাগ্যে হয় না তো কখনো!

দু-ভাই ফুটপাথে নেমে এসে যে-দরজায় বোতাম টিপতে হবে, দেখিয়ে দিলেন। ঠিক বুঝতে পারি নে, কেন নিতান্তই চলে যেতে হবে এঁদের। বিদেশি সিল্ক ও অন্য বিলাস-দ্রব্যের আমদানি বন্ধ করেছে, আজকের দিনে তিলমাত্র অপচয়ের উপায় নেই সেইজন্য। তা অন্য সকলের মতো চীনা কাপড়ের কারবার ধরলেই তো হয়! মনটা ভারাক্রান্ত হল—বাঁধা দোকান ছেড়ে দিয়ে সেই তো হাজার-লক্ষ উদ্বাস্তুর দলে ভিড়বেন। এমনধারা ব্যবসা জমিয়ে নিয়ে বসবেন, সে অনেক কথার কথা। কিছু গুহ্য ব্যাপার আছে হয়তো, পয়লা দিনে ফাঁস করেন নি। শুনে নিতে হবে। সরকারি তরফের মানুষ আমাদের ঘিরে থাকেন—তাঁদের উল্টো-ভাবনা যাঁরা ভাবেন, তাঁদের কথাও শুনতে হবে বই কি!

আবার ভিড় জমছে। তা হোক, মতলব ঠাউরে ফেলেছি এবার। পালাবো না—মানুষ ওরা, বাঘ-ভালুক নয়। আর এই ফাঁক রেখে চলার দরুনই মানুষ শেষটা বাঘ-ভালুকে দাঁড়ায়।

এসো—ভাই সব, এসো এগিয়ে—

থমকে দাঁড়িয়েছে, তখন নিজেই চলে যাই ওদের মধ্যে। কাঁধে হাত চাপিয়ে দিলাম একজনার। অবাক হয়ে গেছে। আর এতদিনে সর্বসাকুল্যে একটি চীনা কথা রপ্ত করেছি—সেটা ছেড়ে দিলাম এই মওকায়। ইন্দু—অর্থাৎ ইন্ডিয়ান, ভারতীয় আমি। কি মোক্ষম কথা রে বাপু, মড়া বাঁচিয়ে তোলার মন্ত্র! সকলের মুখে সঙেগ সঙেগ অমায়িক হাসি। ভারতীয় আমরা—বুদ্ধের দেশের মানুষ। অন্য দেশের মানুষ ওদের ভাষায় 'হু' অর্থাৎ বর্বর; কিন্তু ভারতের মানুষ হল 'থিয়েন-চু' অর্থাৎ স্বর্গের বাসিন্দা। আজকের নয়—এ কথা পুরানো কাল থেকে চলে আসছে। ইংরেজ টুঁটি চেপে আছে—তারও মধ্যে চীনের সেই বড় বিপদের দিনে আমাদের মেডিকেল মিশন তাবৎ দেশের ভিতর সেবা করে বেড়িয়েছে। অর্ধাশনে থেকেও দুর্ভিক্ষের চাঁদা দিয়েছি। তামাম দুনিয়া একঘরে করলেও আমরা এবং আঙুলে-গণা-যায় এমনি কয়েকটা দেশ ইউনো-য় লড়ে বেড়াচ্ছি নতুন-চীনের হয়ে। শক্তির দাপটে ভয় পাইনে, ঐশ্বর্যের হাতছানিতে লোকাতুর হইনি—চিরকালের কুটুম্বের পাশে সহজ আসনটি নিয়ে বসেছি। তা কুটুম্বিতা ওরা মেনে নিল ঐ একটি মাত্র কথায়; পথ-চলতি নগণ্য মানুষ হলেও সবাই ভাসা-ভাসা রকমে জানে, ভারত ভাল লোক—নতুন-চীনের পরম বন্ধু।

দু'টি প্রাণী—আমি আর ক্ষিতীশ—একা-একা যাচ্ছিলাম পিকিনের পথে। দেখ, দেখ, কতজনে এখন আমরা! গা ঘেঁসে চলেছে, আমার আলোয়ানের প্রান্ত তুলে ধরে কাশ্মীরি কাজকর্ম দেখছে। বাজারের ভিতর ঢুকব এবার—হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে তারা। গভীর আবেগে হাত নেড়ে দিয়ে নতুন বন্ধুরা বিদায় নিল।

কোরিয়ার লড়াই কতদিন ধরে শুনছি। কতটুকু দাগ পড়েছে মনে! কাছাকাছি এসে পড়ে এখনই কিঞ্চিৎ মালুম হচ্ছে। সেই যে মহাপ্রাচীরের নিচে ঝরণার জল খেতে দিল না—হায় রে, তেষ্টার জলটুকুও হতভাগাদের নির্বিচারে মুখে দেবার জো নেই!

কোরিয়া থেকে সদ্য-ফিরে-আসা একজনে আজকে বর্ণনা দিচ্ছেন। মনিকা ফেলটন—বৃটিশ মহিলা। এর আগে আরও একবার গিয়েছিলেন দল বেঁধে। রণবিধ্বস্ত কোরিয়া দু-দু'বার নিজের চোখে দেখে এসেছেন। পনের মাস আগে সেই প্রথম বারেই দেখেছেন ধ্বংসের ভয়াবহতা। শহরে একটা ইমারত আস্ত নেই। খাড়া রয়েছে হয়তো একটা থাম কি একটুখানি দেয়াল। এক এক টুকরো নমুনা রয়ে গেছে, আগে কি ছিল তার কিছু কিছু আন্দাজ করা চলে। ঐ যেমন দেখে থাকেন, মাটি কাটার সময় এক একটা ঢিবি রেখে দেয়, মাটির পরিমাণ হিসাব হবে বলে। ঐ সব নমুনা ইচ্ছা করেই রেখেছে কিনা, কে জানে! যে সর্বজনে দেখুক তাকিয়ে তাকিয়ে! এবং নিঃসংশয়ে বুঝে নিক—মারবার, পোড়াবার, গুঁড়োগুঁড়ো করে ভাঙবার ওস্তাদি কি প্রকার সুসভ্য মানুষের! অতএব দুর্বল জাতিবৃন্দ, 'যাহা পায় তাহা খায়, যাহা শোনে তাহা করে' এবম্বিধ প্রথম ভাগের সুবোধ গোপাল হও। ঘাড় তুলতে গিয়েছ কি মারা পড়েছ।

তবু শুনুন, তাজ্জব ব্যাপার। ফেলটন বলতে লাগলেন, ধূমকেতুর মতো আকাশে উঠে দুশমন যখন আগুন বৃষ্টি করে যাচ্ছে, কিন্তু মানুষে আর ভয় পায় না। গা সহা হয়ে গেছে। মরার বাড়া গাল নেই—সেই মচ্ছব চালাচ্ছই তো দিবারাত্রি! আর কি করবে হে বাপু, এর উপর?

গোটা পয়ং-ইয়ং শহর ঢুঁড়ে চারটে দেয়াল এবং তদুপরি ছাত—হেন গৃহ একটি পাবে না। তবু দেখা যাবে, ধ্বংস-স্তূপের এখানে-ওখানে ঘরসংসার পেতেছে মানুষজন। মানুষ মানে মেয়েলোক, শিশু ও বুড়োরা। সমর্থ পুরুষ সবাই লড়াইয়ের কাজে। এরই মধ্যে ত্রিপল খাটিয়ে একটু ইস্কুল মতো হয়েছে, বাচ্চারা পড়ে সেখানে। পড়ে আর মনের সুখে লুকোচুরি খেলে বেড়ায় ভাঙা বাড়ির ইটকাঠের মধ্যে।

লোকে আকাশমুখো তাকায়—দেবতার করুণা চেয়ে নয়—রোষ আর ঘৃণার দৃষ্টিতে। যে আকাশ থেকে যখন তখন বোমা পড়ে হাস্যোচ্ছল জনপদে আগুন ধরায়, নির্বিচারে মানুষ মারে। এ সমস্ত অবশ্য জানা কথা, চোখে না দেখেও আন্দাজ করা চলে। যে খবর সকলে জানে না, সে হচ্ছে সর্বধ্বংসী আগুনের মধ্যে দুরন্ত জীবনোল্লাস। মার্কিন আধিপত্যের খানিকটা স্বাদ একবার পেয়েছিল কিনা লড়াইয়ের গোড়ার দিকটায়! এখন তারা মরীয়া।

বৃটিশ ও আমেরিকান কয়েকটি বন্দী গল্প করেছে মনিকা ফেলটনের কাছে। তাদের ধরে ফেলল যখন চীনারা। একে চীনা তায় কম্যুনিস্ট—মেরে ফেলবে

তো নির্ঘাৎ। আর মরার আগে খবর বের করবার জন্য যা সব ঘটবে, আন্দাজ করতে সর্বদেহ হিম হয়ে যাচ্ছে।

এলো সেইক্ষণ। হেড-কোয়ার্টারে এনে বন্দীদের সারবন্দি দাঁড় করিয়েছে। হুকুম হল, হাত বাড়াও—

এক গুলিতে সাবাড় করবার পদ্ধতি এই। কিন্তু পেটের কথা পেটের মধ্যে রেখেই মরতে দেবে—এত দূর ভদ্র, জানা ছিল না তো! বন্দুকই বা কই সামনে? সিপাহি-সান্ত্রী কোথায়? কয়েকটি মাত্র অফিসার।

হাত বাড়াতেই অফিসাররা হাত চেপে ধরছেন জনে জনের। সেকহ্যান্ড করছেন।

কিছু বলতে হবে না ভাই, সমস্ত জানি। কোরিয়ার যুদ্ধের জন্য দায়ী তোমরা নও। নিজেরাই কি কম ভুগেছ? যাকগে, বিশ্রাম আপাতত।

পেটের কথা ক্রমশ তাঁরা নিজেরাই ফাঁস করেছে। একেবারে কিছুই জানত না—ঘরবাড়ি ছেড়ে সাত সমুদ্র-পারের লড়াইয়ে ঝাঁপ দিয়েছে পৃথিবীর অশান্তি রোধ করবার জন্য। সেই রকম বুঝিয়েছিল তাদের। তারা নৃশংস নয় —মা-বাপ, ভাইবোন, প্রীতিমতী প্রণয়িনী সমস্ত ছিল একদা, ছিল য়ুানিভার্সিটির পড়াশুনো আর অফিসের চাকরি। আর ছিল রুচিবান আদর্শনিষ্ঠ শান্ত জীবন। রণদৈত্যের মুঠোর মধ্যে পড়ে সেই তাদের হেন জঘন্য কর্ম নেই যা করতে হয় না। তার উপরে ঔদ্ধত্য ছিল মনে মনে—এসব মানুষের জন্য, মানুষের সমাজের জন্য, সমাজ-শত্রুদের সায়েস্তা করবার জন্য। আজকে আর্তনাদ করছে অন্তরের মানুষ। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। আমি নই—কিছু জানিনে আমি। আমার হাত দু'খানা দিয়ে বোমা ফেলেছে ওরা......

নিরুদ্ধ-নিশ্বাসে মনিকা ফেলটনের তাবৎ কথা শোনা হল। ছবি যেন চোখের উপর দেখছি। এবারে চলুন আর এক জায়গায়—অন্য এক ঘরে। নাকামুরা কি বলে, শুনে আসি।

হ্যাঁ, গতিক সেই রকম। পৃথিবী অতি ছোট—হাতের মুঠোর আমলকী বিশেষ। কোরিয়া বলুন, জাপান বলুন, এবাড়ি ওবাড়ি ছাড়া কিছু নয়। সবাই প্রতিবেশী আমরা। পীস-হোটেল আর পিকিন-হোটেল—দুটো মাত্র জায়গার মধ্যে সকলকার আস্তানা। দিনের মধ্যে অমন দশ বার দেখাশুনো হচ্ছে। ভাষা না জানি তো বয়ে গেল। তাতে বুঝি পরিচয় আটকায়? ঐ তো

আজ সকালেই যে কাণ্ড হলো মরিসন স্ট্রীটের উপর বাজারে যাবার সময়। কোরিয়ার কথা শুনলাম, এবার জাপান কি বলে—শুনি গে চলুন। জাপানি গবর্নমেন্ট নয়—জাপানের মানুষ।

নাকামুরা স্ফূর্তিবাজ অভিনেতা মানুষ—চলনে বলনে তার আমেজ পাওয়া যায়! হবে না কেন? রং মেখে সাজগোজ করে বাপের পিছন ধরে পাঁচ বছুরে শিশু একদিন স্টেজে উঠলাম, আজকে বাহান্ন বছুরে বুড়ো নেচে কুঁদে ঠিক সেই রকম লোক মাতাচ্ছি। জাত ব্যবসা মশায়, বাপ-দাদাও জীবন ভোর এই করে গেছেন। খাসা ছিলাম কাবুকি দলে, সেটা হল পেশাদারি অপেরা—টাকা কামাও, আমোদ-স্ফূর্তি করো, নাক ডেকে ঘুমোও—কোন রকম ঝামেলা নেই। সেই মানুষ আজ তামাম দুনিয়ার গুণী-জ্ঞানীদের সামনে দাঁড়িয়ে আঁতের কথা বলতে উঠেছি। হেন দুর্ভোগ স্বপ্নে ভেবেছি কোন দিন?

লড়াই বাধল। লড়াইয়ের বাবদে যত গণ্ডগোল। কর্তারা বললেন, বাজে নাচনা-গাওনা নয়—মতলব নিয়ে লেগে পড়ো। নতুন পালা লেখানো হচ্ছে—লড়াই জিতলে ইন্দ্রধাম ধরায় নেমে আসবে, এমনি সব বিষয় নিয়ে। এমন মোক্ষম গাওনা শুরু করো মানুষ যাতে দলে দলে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তাই সই। ঢাক কাঁধে ঝুলিয়ে দিল তো বাজিয়ে চললাম এক নাগাড়ে চার-পাঁচ বচ্ছর। কি ঝড় বয়ে গেল দেশের উপর দিয়ে, কত সর্বনাশ যে হয়ে গেল! কাগজে ক'টা কথাই বা লেখে! একটি কথাই বিশ্ববাসী সকলে জেনে রইলেন, জাপানের মতো হাড়বজ্জাত লড়াইবাজ জাত দুনিয়াদারিতে দ্বিতীয় নেই।

রামা-শ্যামা মানুষগুলোর কথা কানে যায় না যে আপনাদের! আর মন খুলে কথাও কি বলবার জো আছে? সাদা পোশাকে পুলিশ কোথায় ওৎ পেতে আছে, ক্যাঁক করে টুঁটি চেপে ধরবে। তা মশায়রা, আমাদের দুর্ভাগা দেশের হয়ে একটা খবর নিবেদন করি—মার-কাট করনেওয়ালা গোঁয়ার-গোবিন্দ জাত সত্যি সত্যি আমরা নই। কপালের ফের, তা ছাড়া আর কি বলতে পারি? ঘুরে ফিরে আমাদের দিয়ে প্রলয়-নাচন নাচাচ্ছে, কিন্তু বিশ্বাস করুন—নেচে নেচে চেরিগাছে মুকুল ফোটাবো, সেইটেই আমাদের বিশেষ পছন্দ।

তা হতে দিচ্ছে কে? দু-দুটো এটম-বোমায় ঘায়েল হয়ে আছি, তবু রেহাই দেবে না। ষড়যন্ত্র হচ্ছে, আবার ওখানে পয়লা নম্বরের ঘাঁটি করে নতুন এক লড়াই যদি বাধানো যায়। আমরাও ঠিক করছি মশায়, ন্যাড়া আর বেলতলায় যাবে না। ঠিক করছে অবশ্য রামা-শ্যামা-যোদো-মোধোর দল—

যাদের কথা খবরের কাগজে ওঠে না। কিন্তু শোনাবোই এবার আমাদের কথা। জেন শিনজা (গণনাট্য-দল) গড়েছি, নাটক করি। নাটক দেখতে লোক ভেঙে পড়ে। তা হলে দেখুন, ওরাই গুরু এক হিসাবে, ওদের কথা মেনে নিয়েছি—বাজে নাচনা-গাওনা নয়, মতলব হাসিল করতে হবে।

বাধা শতেক রকমের। হুড়মুড় করে একদিন হাজার খানেক পুলিশ এসে সমস্ত তছনছ করে দিয়ে গেল। তখন মতলব হল, দু-চারটে পালা সিনেমা-ছবিতে পাকাপোক্ত করে তুলে রাখা মন্দ নয়। ছবি তোলা চাট্টিখানি কথা নয়—ম্যাও ধরবে কে? দেশের মানুষদের জানান দিয়ে দাও। তা মশায়, বলব কি, এক পয়সা, দু-পয়সা করে লাখ টাকা উঠে গেল। চাঁদা তুলে সিনেমার ছবি—শুনেছেন এমনধারা? একবার হামলা দিল আমাদের উপর—অভিনয় করতে দেবে না। জনতার গোলামনফর আমি—স্টেজে উঠে করজোড়ে শুধাই, কি আদেশ তোমাদের?

শত কণ্ঠে গর্জন উঠল, চালাও। আমরা আছি—কে ধরতে আসে দেখি!

পুলিশ প্যাট-প্যাট করে চেয়ে রইল, স্ফূর্তিসে পালা গেয়ে যাচ্ছি। গতিক বুঝে পিঠটান দিল তারা অবশেষে।

হাসছে নাকামুরা নিজে, হাসাচ্ছে আমাদের। হাসতে হাসতে শিল্পীর লাঞ্ছনা ব্যক্ত করছে। আর এদিকে হাসতে গিয়ে জল ফুটে ওঠে শ্রোতাদের চোখে।

সুইং-ইঞা-মিং—সেই হাসিখুশি মেয়েটা—নজর খাটো বলে চশমা ধরেছে, কিন্তু পান থেকে চুন খসলেও দেখি নজরে পড়ে।

সকালের মীটিঙে ছিলেন না—

আমতা-আমতা করে বলি, ছিলাম বই কি! নিশ্চয় ছিলাম। হাজিরার লিস্টি আছে তো—দেখ গিয়ে তার মধ্যে।

শেষ অবধি ছিলেন না।

অত মানুষের মধ্যে সেটাও ঠাহর করেছে। কিছু আশ্চর্য নয়। আমাদের আটটি দশটি পড়েছে এক একজনের ভাগে। ছায়া হয়ে সাথেসঙ্গে ঘোরে, খেজমত করে বেড়ায়। ভাগের মানুষ সরে পড়েছে, টনক তো নড়বেই।

ধরা পড়েছি যখন, বুক ফুলিয়ে জাঁক করাই ভালো। বললাম, দু-দুটো

মীটিঙের অত ভালো ভালো কথা সামলাতে পারলাম না। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল, তাই বেরিয়েছিলাম।

বললেন না কেন? সঙ্গে যেতাম।

ওঃ, ভারি সব লাটসাহেব এসেছি কি না—যেথায় যাবো, মিছিল করে চলতে হবে!

সুইং বলে, সে কথা হচ্ছে না। ধরুন, দরকার পড়ল কাউকে কিছু বলবার। কিম্বা চলতে চলতে হয়তো ভুল রাস্তায় গিয়ে পড়লেন।

তোমাদের তর্জমা ছাড়াও বলতে পারি কথা। বলবার ভাল কায়দা আজকে শিখে নিয়েছি।

বাজার থেকে অনেক জিনিস এনেছি রঙিন বেতের ব্যাগ বোঝাই করে। সগর্বে মেলে ধরলাম।

দেখ, দেখ। হাতীর দাঁতের উপর কাজ-করা সিগারেট-হোল্ডার কুল্যে দশ হাজারে। দশ দোকান ঘুরে ঘুরে কেনা—এক ইয়ুয়ান কমে নিয়ে এসো দেখি কোন-একটা জিনিস। বিনা কথায় হয়েছে এসব?

ভ্রূভঙ্গ করে সুইং বলে, সওদায় এখানে কথা লাগে না—বোবারাও করে থাকে। কেউ ঠকবে না, দরাদরি নেই—

শুনলেন? আমরা বোবা—ঠেশ দিয়ে তাই বলা হল কি না! ওদের ঐ হিজিবিজির ধাঁধায় না ঢুকতে পারলে ধরে নেবে নিতান্ত অবোলা জীব। কি করে বোঝাবো বলুন নির্বুদ্ধি মেয়েটাকে—মুখে বকবক না করেও চোখের চাউনিতে তামাম কথা বলা যায়। তাই তো বলেছিলাম মরিশন স্ট্রীটের উপর। সেই ভাষায় কথা বলেছি দোকানিদের সঙ্গে। তুমি ছিলে না মাতব্বর ঠাকরুন, ভাগ্যিস ছিলে না সঙ্গে! ঠিক করেছি, এমনি ফাঁক কাটাবো যখন তখন—লায়েক হয়ে গেছি, ডরাই নে আর কোন মানুষ। চীনের মানুষগুলো তো নয়ই।

আর ঐ যে বলল, ঠকায় না কোন ব্যক্তি—সবাই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। হেন তাজ্জব বিশ্বাস করতে বলেন কলিকালে? আর আমি 'হাঁ' বলে রায় দিলেও বিশ্বাস করবেন কি আপনারা বুদ্ধিমান পাঠকদল? জাতে চীনা—কলকাতার চীনাবাজার ঢুঁড়ে বিস্তর চিনে রেখেছেন ওদের। জুতো কিনতে যান ওদিকে। জুতোর দাম বিশ টাকা হেঁকে বসল তো তার সিকি পাঁচ লুপেয়া থেকেই শুরু করবেন, না কি? ইংরেজি বলবেন, বাংলা বলবেন, সাহেব-সাহেব করবেন—একবার বা আঁটকুড়ির ব্যাটা বলে নিলেন ওর ফাঁকে। নাঃ, কিনবো না এখানে—

রাগ করে রাস্তায় নেমে পড়লেন। পিছন থেকে তখন ডাকবে, আট লুপেয়ায় নিয়ে যাও জুতো, লোকসান করে দিচ্ছি।

দেশের দোকানে এসে বসলে সেই তারা নাকি একেবারে দরাদরি বরদাস্ত করবে না। পাতিকাক স্থান-মাহাত্ম্যে ময়ূর হয়ে পেখম ধরেছে। আচ্ছা, হাতে-নাতে দেখিয়ে দেবো কাল-পরশুর মধ্যে। সুইঙের দেমাক চূর্ণ হবে।

আজ সন্ধ্যায় ভিয়েটনামের দল ডিনারে ডেকেছি আমরা ভারতীয়েরা। এই তো আসল—মানুষজনের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়। কনফারেন্সে ধুম-ধাড়াক্কা ব্যাপার, সর্বচক্ষুর দৃষ্টি সেই দিকে, রিপোর্টাররা মুকিয়ে আছে বক্তৃতাদির কমাটুকু বাদ না যায়। ইতিমধ্যে বিশ্বের নানান জাতের মানুষ মুখ-শোঁকাশুঁকি করে নিঃসংশয়ে বুঝে নিচ্ছি, ভাইব্রাদার আমরা—ডাণ্ডাবাজি নিতান্তই অহেতুক। খোলা মনে পাশাপাশি বসেই সব মীমাংসা হতে পারে।

নিচের বাঙ্কুয়েট-হলে খাওয়া-দাওয়া। আচ্ছা মজার নিমন্ত্রণ—নিমন্ত্রক-দের এক তিল ঝঞ্চাট পোয়াতে হল না। ওদের ঘরবাড়ি, ওদের লোকজন, জিনিসপত্র সমস্তই ওদের। একটিবার মুখের হুকুম ঝেড়ে খালাস। শুধু নামের বেলা আছি—খাওয়াচ্ছি নাকি আমরাই।

খবরের কাগজ পড়েন, অতএব ভিয়েটনাম নামটায় চোখ পড়ে থাকবে। কি একটা গোলমেলে ব্যাপার চলেছে যেন অনেক দিন ধরে? আজ্ঞে হ্যাঁ, নিব্যূঢ় স্বত্বে-স্বত্ববান ও পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখলিকার সুসভ্য ফরাসি জাতি—দুর্জন ভিয়েটনামিরা গোলমাল বাধাচ্ছে উক্ত মহাশয়দের সঙ্গে। এক অতি হাস্যকর নিয়মবিরুদ্ধ কথা বলছে—ভিয়েটনাম নাকি ভিয়েটনামবাসীদেরই। রাগ হয় না?

আমার ডান দিকে বসেছে গো-গিয়া-খাম। দুটো হাত নুলো। বক্তৃতায় হাততালি দিচ্ছে নুলো করাগ্র দুটোয় শুকনো কাঠি বাজানোর মতো। আলাপ-পরিচয়ের পর পরস্পর সেকহ্যাণ্ড করছি, সে নুলো হাত ঠেকাচ্ছে আমাদের হাতে। এ দশা ছিল না তার। জাপানি হামলার সময় ফরাসিরা তো রাতারাতি জাহাজ ভাসিয়ে দরিয়া পাড়ি দিল। গেরিলা-লড়াই করছে তখন এরা। নিরস্ত্র ও নিঃসহায়—তা হাতবোমা বানিয়েই নাস্তানাবুদ করতে লাগল জাপানিদের। একটা হাত গেল, তবু ছাড়েনি। দুটো হাতই খতম তারপরে।

মুখ পুড়ে মাংস দলা-দলা হয়ে আছে। খানিকটা নিশ্চিন্ত সেই থেকে। ছেলেটাকে বার বার চেয়ে দেখছি। বীভৎস ভয়ঙ্কর মুখ, কিন্তু সাদা দাঁতে হাসির লহর খেলছে।

এটম-বোমার গুঁতোয় শিরদাঁড়া-ভাঙা জাপান পালাল তো খিড়কির পথে শুড়শুড় করে। ঠাকঠমক সহ পুনশ্চ ফরাসিরা ঢুকে পড়লেন। এই যে এসে গেছি! কিন্তু কোথায় ছিলেন বীরপুঙ্গবেরা বড় ডামাডোলের সময়টা? সেই যখন জাপানিরা কুড়িয়ে বাড়িয়ে তাবৎ চাল বাইরে সরাল, আর অনাহারে ঝাঁকেঝাঁকে মানুষ মরল কীটপতঙ্গের মতো? লাইনবন্দি গোরুর-গাড়ি লাস সরাতে লাগল রাজধানী হ্যানয়ের রাস্তা থেকে—তখন মহাশয়দের টিকি দেখা যায় নি। তার পরে শ্মশানভূমির নৈঃশব্দে প্রেতদলের মতো করোটি-কঙ্কাল নিয়ে ডাংগুলি খেলার উদ্দেশ্যে আবার অভ্যুদয়?

গুয়েন-কুয়োক-ট্রি পঁচানব্বুইটা লড়াইয়ের বীর। জাপানিদের সঙ্গে লড়েছে, এখনও লড়ছে। বলে, তোমরা ভারতীয়েরা, বাপু, যা হোক করে কাঁধের ভূত নামিয়েছ—কবে যে সোয়াস্তির শ্বাস ফেলব আমরা!...

মঞ্জুশ্রী দেবী রবীন্দ্র-সঙ্গীত ধরলেন। পৃথিবী এমন সুন্দর, মানুষ এমন ভালো! বাংলা বোঝেন ক'জনই বা! কিন্তু প্রীতি-প্রসন্নতার আলো মুখে মুখে। সর্বব্যাপ্ত আনন্দ। এতক্ষণের আলোচনার যাবতীয় সমস্যা ও আক্ষেপ সুরতরঙ্গে ভেসে গেছে। রবীন্দ্রনাথের গান এই প্রথম শুনল ওরা, সর্বপ্রথম এই রণিত হল পিকিন-হোটেলের কক্ষে। গানের শেষে ভিয়েটনামের একটি মেয়ে জড়িয়ে ধরল মঞ্জুশ্রী দেবীকে। আবিষ্ট হয়ে আলিঙ্গন করছে, ছেড়ে দিতে চায় না। অপলক চোখে দেখছি আমরা। নিখিল পৃথিবীর পাহাড়-সমুদ্র যেন নিঃশেষে বিলীন হয়ে পথ ছেড়ে দিয়েছে, এক হয়ে গেছে দূরবাসী আপন-মানুষেরা।

(১৫)

তার পরের দিন—২৮শে সেপ্টেম্বর। ব্রেকফাস্টে চলেছি কয়েকজনে সাততলার খানাঘরে। লিফটের বোতাম টিপে অপেক্ষায় আছি।

হন্তদন্ত হয়ে এক ভদ্রলোক এলেন। আমার নাম ধরে বলছেন। অমুক বলে কেউ আছেন আপনাদের মধ্যে?

অতএব ছেড়ে দিলাম সেবারের লিফট।

পিকিন-য়্যুনিভার্সিটির অধ্যাপক আমি—আলাপ করতে এসেছি।

চলুন তবে ঘরে গিয়ে বসিগে।

খেতে চলেছেন—খেয়েই আসুন। না হয় আমিও যাচ্ছি সেখানে, খাওয়ার টেবিলে আলাপ হবে। উঠে যান—আসছি আমি একটু পরে।

আধময়লা লম্বা মানুষটি। চৈনিক চেহারা এমন যে হতেই পারে না, এমন নয়। তার পরে জানাশোনা হল—চক্রেশের বাপ জগদীশ জৈন। হিন্দি পড়ান। মেয়ের সঙ্গে তো বিস্তর পরিচয় হয়েছে, বাপকে দেখলাম এবার। বম্বের এক কলেজের অধ্যাপক—চাকরিটা ছাড়েন নি। ছুটি নিয়ে এসেছেন। সমস্ত পরিবার বম্বে রয়েছে, এখানে শুধু বাপ আর মেয়ে।

এ মানুষকে হেলা করা চলে না। মাস ছয়েক আছেন, কত কি নতুন কথা পাওয়া যাবে এঁর কাছে!

চীনা ভাষাটা শিখেছেন তো ভাল করে?

অধ্যাপক শিউরে উঠলেন। ওরে বাবা, সে কি দু-দশ মাসের কর্ম?

দু' মাসের না হোক, দশ মাসেও হবে না?

না। সজোরে তিনি ঘাড় নাড়লেন।

অক্ষরই হাজার কয়েক। ভুল বললাম—অক্ষর নয়, লিপি। কিম্বা ছবিই বলুন না! এক একটা গোটা কথার ছবি দিয়ে প্রকাশ।

এত প্রগতি নানান দিকে—লিপির ঐ জগদ্দল বোঝায় অসুবিধা হয় না? সহজ কিছু বেছে নিলে তো পারে। রোমক অক্ষর নিয়ে নিচ্ছে অনেক দেশে। কাজকর্ম চালানো কত সহজ হয় তাহলে!

এই আলোচনা পরে করেছিলাম অপর এক বিদগ্ধ জনের সঙ্গে। তিনি ঐ দেশীয়। খুব খানিকটা হেসে নিলেন। বললেন, অতি প্রাচীন পরিপক্ক জাত যে আমরা! আয়তনে সারা ইউরোপের চেয়ে বড়। ইজ্জতেও। কেউ আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারবে না। চার হাজার বছরের খবর পাওয়া যায়। খৃস্টপূর্ব ২৮০০ বছরের পাকা ইতিহাস রয়েছে। হেন ঐতিহ্য দেখান দিকি আর কারো! আর সকলের যা চলে, আমাদের তা চলবে না। জান কবুল—পুরানো ঐতিহ্যের আঁশটুকুও আমরা ছাড়তে পারব না।

আবার বললেন, ভাষা নিয়ে অসুবিধা আছে মানি। কিন্তু কার ঘাড়ে ক'টা মাথা, ভাষা-ত্যাগের প্রস্তাব তুলবে? তবে গবেষণা চলছে—সহজে ভাষা

শেখবার একটা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিও বেরিয়েছে। মাস তিনেকে মোটামুটি কাজ চালানোর মতো শেখা যায়।

খবরের মতো খবর। পুলকিত হবার ব্যাপার নিঃসন্দেহ।

ছড়িয়ে দিন না পদ্ধতিটা। বিচিত্র আপনাদের প্রাচীন সাহিত্য-ভাণ্ডার। যারা স্বাদ পেয়েছে, তারাই তো মজেছে। ভাল হয়েছে, সংক্ষিপ্ত পথে এগিয়ে মূঢ় জনে এবারে যদি একটু উঁকিঝুঁকি দিতে পারে!

তিনি বললেন, বাইরের লোকে এখন খুব বেশি সুবিধা করতে পারবে না। পদ্ধতিটা ধ্বনির উপর নির্ভরশীল। আমাদের বাগ্‌ভঙ্গির সঙ্গে পরিচয় থাকলে তবে হবে।

হিজিবিজি লিপির প্রবর্তনা কেমনে হল, শুনবেন নাকি একটু? সত্যি মিথ্যে জানি নে—কষ্টিপাথরে ঠুকে যদি বলেন খাদ আছে, গণেশের দিব্যি করতে পারব না। যেমন শুনেছি, তেমনি লিখে দিলাম। আপনারাও গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করুন, শুনতে পাবেন এই কাহিনী।

তখনো লিখন-শিল্পের আবিষ্কার হয়নি। লোকে দৈবজ্ঞের কাছে যায় ভবিষ্যৎ জানতে, রোগপীড়া সারাতে, গ্রহশান্তি করতে। সমস্ত শুনে নিয়ে দৈবজ্ঞ কচ্ছপের খোলা, মানুষের করোটি বা ঐ জাতীয় কিছু ফেলে দিলেন আগুনে। তারপর আগুন নিবিয়ে বস্তুগুলো বের করে আনা হল। উত্তাপে ফেটে ফেটে আঁকাবাঁকা রেখা ফুটেছে খোলার উপর। দৈবজ্ঞ ভবিষ্যৎ পড়ে গেলেন ঐ সমস্ত রেখায় চোখ বুলিয়ে। এই হল লিপিবিদ্যার আদি। রেখার মানে দৈবজ্ঞ বোঝে তো আপনি আমি চেষ্টা করলে বুঝব না কেন? অতএব সকলে লিখতে লাগল ঐ ধরনে, মানেও করতে লাগল। লিপির ধরন তাই অমন আঁকাবাঁকা।

অক্ষর নয়—ছবি। এক একটা আস্ত কথার ছবি করে দিয়েছে। একটা-দুটো টুকরো-রেখায় ছবির সঙ্কেত। নিরীখ করে দেখুন, মালুম হবে কতক কতক। রসবোধের নমুনা দেখে অবাক হতে হয়। মানুষ—দেখুন, এক জোড়া পা। স্ত্রী—দেড় লাইনে মেয়েলোকের মতো বানিয়ে তার হাতে ঝাঁটার ইঙ্গিত। মামলা—দুটো কুকুর। কয়েদি—বাক্সের ভিতরে গুড়ি মেরে আছে মানুষ। পূজা—মানুষ হাঁটু গেড়ে আছে। পূর্বদিক—গাছের আড়ালে সূর্য। পশ্চিম—পাখীরা বাসায় ফিরছে। এমনি অজস্র।

অধ্যাপক জৈনের পরে পরাঞ্জপে। এসে অবধি তাঁর খোঁজ করছি, এত দিনে চোখে দেখলাম। ঝড়ের বেগে ইংরেজি বলেন। আর এমন তাজ্জব

চীনা শিখেছেন—খাস চীনা মুলুকের মানুষও লজ্জা পেয়ে যায়। বড় ব্যস্ত—বসে দুটো কথা বলবার ফুরসৎ নেই। এঘরে-ওঘরে ছুটোছুটি করে দেশের ভাইদের সঙ্গে আলাপ করছেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে ষাট জনের সঙ্গে মোলাকাত সেরে ড্রইংরুমে এলেন। ভারতীয় দূতাবাস চাল কিনবার তালে আছে চীনের কাছ থেকে—তার জন্য নানা স্তরে নানাবিধ আলোচনা। আরও নানা ব্যাপার। একটুও সময় নেই। কাল আসব আবার। নয় তো পরশু। আজকে মার্জনা করুন।

সাইকেল চেপে পরাঞ্জপে সাঁ করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

চলুন যাই একজিবিসনে। নতুন-চীন কি করছে, তার কিছু নমুনা দেখে আসা যাক। নিজ চোখে। এতকাল চীন যাদের তল্পি বয়ে এসেছে, জোট বেঁধে তারা তো একঘরে করে দিল। রোসো, দেখে নিচ্ছি—জব্দ করছি কম্যুনিস্ট বেটাদের হুঁকো-নাপিত বন্ধ করে। কিন্তু শাপে-বর হয়ে গেল। বাঁচতেই হবে, দাঁড়াতে হবে নিজের পায়ে। যা দেশে-ঘরে আছে, তাই নিয়ে খুশি থাকো দেশের মানুষ। আর গড়ে তোল নতুন নতুন কারখানা, কোমর বেঁধে সর্বশক্তিতে লেগে যাও।

দশ বছরের বেশি ঘরোয়া লড়াই—অস্থি-মজ্জা কিছু কি আর ছিল? জিনিসপত্রের দাম লক্ষগুণ বললে বিনয় করে বলা হয়। ভারী-শিল্প কমে গিয়েছিল শতকরা সতর ভাগ, ছোট-শিল্প তিরিশ ভাগ। ফসল কমেছিল সিকি। সব আবার ঠিক হয়ে গেছে। তাই বা কেন—উৎপন্ন এমন বেড়েছে, কস্মিনকালে যা কেউ দেখেনি। আরও বাড়ছে দিনকে দিন। যেটা ওরা আশা করে, সে আশা ছাপিয়ে অনেক আরো এগিয়ে যাচ্ছে বছর বছর। কয়লা আর লোহা-পাথর চালান দিত আগে, এখন নিজেরাই ইস্পাত বানাচ্ছে। দেশের শিরা-উপশিরার মতো সর্বপ্রান্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে রেল-লাইন। জমি-সংস্কার করে ফেলেছে—লাঙল যাদের তাদেরই জমি। নিজের হাতে লাঙলের মুঠো ধরতে হবে, তার মানে নেই অবশ্য; লোকজন দিয়েও করাতে পারে। কিন্তু ফরাসে পা ছড়িয়ে খাজনা আদায় চলবে না। দেশ-জোড়া এত বড় কাজ ক'টা বছরের মধ্যে যেন মন্ত্রের জোরে করছে। অথচ অস্বস্তি কত রয়েছে, ভেবে দেখুন। ঘরশত্রু বিভীষণেরা অদূরে ফরমোশায় ওৎ পেতে আছে—তাদের পিঠের আড়ালে ভুবনের শক্তিধর মহাশয়গণ। আর শিল্পাঞ্চল অর্থাৎ দেশের প্রাণকেন্দ্রের অতি-

নিকটে কোরিয়ায় তো মার-মার কাট-কাট ব্যাপার—অহরহ সেদিনকার ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। তার মধ্যেও এত সমস্ত—এমন হাসি আর নির্বোধ আনন্দ।

ঘুরে ঘুরে দেখছি। হেন বস্তু নেই, যেদিকে এদের নজর পড়ে নি। ছবি-আঁকা মধুগন্ধী চন্দনের পাখা থেকে ভীমকায় বয়লার। আহা, সর্ব-রকমে নাজেহাল হয়েছে এতকাল ধরে—কেউ তো ছেড়ে কথা হয়নি! বারোয়ারি ময়দা—যে পেয়েছে, সে-ই ঠেসে গেছে। আজকে দিকে দিকে নবজীবনের ব্যাপ্তি। একজিবিশন ঘুরে ঘুরে ওদের নবীন স্বাস্থ্যের নিশ্বাসপ্রশ্বাস অনুভব করছি। ভাল হোক এদের—শান্তি ও সমৃদ্ধি উথলে উঠুক। এই আনন্দোচ্ছল স্বাস্থ্যোদ্ভাসিত ছেলেমেয়েদের মুখ মলিন না হয় যেন আর কখনো! আর আমি জানি, এমনি হাসি হাসবে আমাদের সন্ততিরাও। সার্বিক চেষ্টা চাই তার জন্য। দোষ আছে আমাদের মানি, গালিগালাজ করি—আত্ম-সমালোচনা বলে তা ধরে নেবেন। আমাদের কর্মচেষ্টা নিষ্কলঙ্ক ও ব্যাপকতর হোক। আনন্দের প্লাবন দেখে এলাম চীনে—সে আনন্দ হিমালয় ছাপিয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙে পড়ুক এখানে। প্রীতি ও সৌহার্দ্যে এপার-ওপার এক হয়ে থাক সেই প্রাচীন দিনের মতো।

কিনতে লোভ হয় নানান জিনিস। বিশেষ করে সিল্কের উপরে তোলা ছবি ও ব্যাগ। ভারি চমকদার। চক্রেশ ও তার বাপ আছেন দলে—আমাদের সঙ্গে ঘুরছেন। হাঁ-হাঁ করে উঠল মেয়েটা। এখানে নয়, আমি কিনে দেবো। যারা তৈরি করে, জানি তাদের। অর্ডার দিয়ে দেবো—আরও ভালো জিনিস হবে, অনেক ভালো—

•

ডায়েরির খাতা খুলে স্তব্ধ হয়ে আছি। বিজয়া দশমী। ছাপা আছে তাই, নইলে টের পাবার কথা নয়। শানাই বাজছে যেন। কোথায় অনেক দূরে। বাজছে করুণ হয়ে আমার কিশোরকালের একটি বিমুগ্ধ দিনান্ত। এয়োস্ত্রীরা জমেছেন চণ্ডীমণ্ডপে, প্রতিমার কপালে সিঁদুর দিচ্ছেন—তার-পর প্রসাদী সিঁদুর মাখাচ্ছেন এ-ওর কপালে। অতি কুৎসিত মেয়েটাকেও কত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে এই দশমীর দিন।...উঠানে নামাল প্রতিমা। গর্জন-তেল মাখিয়ে দিয়েছে—অপরাহ্ণ আলোয় ঝিকমিক করছে। মাগো, আবার এসো—

-বাড়ির গিন্নি হাউ-হাউ করে কে'দে উঠলেন। ঠাকুর-প্রতিমা নয়, এ যেন মেয়ে। মা-খুড়ি এবং মাসীরা মিলে শ্বশুরবাড়ি পাঠাচ্ছেন এই গ্রামকন্যাকে। পাশাপাশি আর এক ছবি। ঘাটে নৌকো। ছাতিমতলায় সকলে দাঁড়িয়ে। চোখে অঝোর ধারা বয়ে যাচ্ছে। মাগো—কাঁদিস নে মা, নিয়ে আসব তোকে সামনের অঘ্রাণে—

লগি ঠেলছে মাঝি। নৌকো এগোয় কই? কলমিফুলে ভরে গেছে নদীজল। কলমিলতারা শত বাহু মেলে আটকে আছে। এগুতে দেবে না...

তেমনি সানাই বাজে আজও যেন কোথায়! আমার সারা চৈতন্য আচ্ছন্ন করে বাজছে। হঠাৎ কে কথা বলে উঠল। চমক লাগে। ইয়ং এসে বলছে—বয়সে ছোকরা, কিন্তু দোভাষি দলের কর্তাব্যক্তি।

পাকিস্তানের দল আসছেন। ভাবলাম, আপনিও গেছেন বুঝি এরোড্রোমে।

জানি নে তো—

আপনাদের অনেকেই গেছেন। এমন চুপচাপ ঘরের মধ্যে—শরীর খারাপ নাকি?

ভাবছি নানান কথা। লিখছি—

ছবি দেখতে যাবেন? আটটায়। ভালো ছবি। হুয়ে নদী আটক হচ্ছে। সেই সর্বনাশা নদীর বন্দীদশা দেখবেন চোখে।

না ভাই, কোথাও নয় আজকে। চিঠি লিখব।

কত চিঠি লিখলাম গভীর রাত্রি অবধি। পর্বত-সমুদ্রের ওপার থেকে প্রণাম, প্রীতি আর আলিঙ্গন সুহৃৎ-আত্মীয়দের। দক্ষিণ-দিগন্তে পাখনা মেলে মন উড়ে চলল ভারতের দিকে।

(১৬)

সকালবেলা নিচে নেমেছি। ড্রইংরুম হল দিনরাতের আড্ডাখানা। মহাবিটবীবৎ এই হোটেলের কোন খোপে কে সে'দিয়ে আছেন, জানা সহজ নয়। ড্রইংরুমে হঠাৎ দেখা মিলে যায়। বেরোবার মুখে পরস্পরের সঙ্গে খানিকটা মোলাকাত সেরে যাই আরামপ্রদ আসনে বসে। ফিরে এসেও বসি খানিকক্ষণ। অথবা ঘুরে বেড়াই ঘরের এদিক-ওদিকে—বই ও ছবির দোকানে,

পোস্টাপিসে, ব্যাঙ্কে। তক্কে তক্কে বেড়াচ্ছি—কাল যাঁরা পাকিস্তান থেকে এলেন, তাঁদের পাকড়াতে হবে। অন্তত একজন-দুজন—কে কে এলেন, খবর নিতে চাই। ভিন্ন দেশ বলে আলাদা দল করে এসেছেন—তবু এতগুলো দেশের মধ্যে রক্তসম্পর্কীয় অমন আর কে? বিশেষ করে যাঁরা পূর্ব-পাকিস্তানের। আমার সাত পুরুষের ভিটেবাড়ি, জন্ম থেকে সমস্ত কিশোরকাল কাটিয়েছি যেখানে। সে গাঁয়ের খানাখন্দ, জঙ্গলে গাছগুলো অবধি মুখস্থ। ঢাকা শহরের মধ্যেই বা কত বন্ধু আমার! সে আজ বিদেশ হয়ে গেছে। ভারতের দলে আছি আমরা কয়েকজন বাঙালি—আর ও-দলেও নিশ্চয় বাঙালি এসেছেন। ভাইব্রাদার একত্র হয়ে মনের খুশিতে খাস বাংলায় হুল্লোড় করে বুঝব।

আচকান-পরা এক ব্যক্তি—হুঁ, চেহারা ও বর্ণে স্বজাত বলে সন্দেহ করি। তবু সাবধানে এগুনো ভালো। ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করি, এই প্রথম বোধ হয় দেখলাম মশায়কে?

ইলিয়াস খোন্দকার আমার নাম—

ব্যস, ব্যস—আবার কি! দু-হাত জাপটে ধরি। বিনামূল্যের খাদ্য খেয়ে —বলতে নেই—গায়ে কিছু তাগত লেগেছে। সদ্য-আগন্তুক আমাদের স্ফূর্তির ধকল সামলায় কি করে? অবাক হয়ে গেছে। স্বদেশি ভাষায় তখন সাহস দিই, ঢাহার থন আইছেন—সেইডা কন ভাইডি! জোব্বা দেখে ভড়কে যাচ্ছিলাম, বুঝি বা কোন্ কুবলাই খাঁ তক্তাউস থেকে নেমে এলেন।

জবাব এলো—আর, ঐ পয়লা জবানেই আমি তাঁর দাদা।

আপনি চীনে এসেছেন, ঢাকা থেকেই শুনেছি দাদা।

এবং একথা-সেকথার পর—

দাদা, গরম মোজা কিনতে হবে যে একজোড়া—

হবে, হবে—সেজন্য ভাবনা কি!

এই ক'দিনে আমরা পুরোপুরি লায়েক। ছোট ভাইয়ের চোখ-কান ফুটিয়ে দেওয়া সম্পর্কে দাদার বিশেষ কর্তব্য আছে নিশ্চয়ই। ঠাণ্ডা হতে বলি। পিকিন একেবারে নখদর্পণে—এমনি একটা ভাব। বললাম, সমস্ত পাওয়া যাবে ভায়া—ব্যবস্থা করে দেবো, ভাবতে হবে না।

অনতিপরেই বেরুলাম ইলিয়াসকে নিয়ে। ছেলেমেয়েগুলো বা অপর কেউ জানতে না পারে! বাহাদুরির জুত হবে না তাহলে।

হাজির করেছি বাজারের ভিতর। সারাপথ তালিম দিয়ে এনেছি। হোটেলে খাবার ব্যবস্থা কখন কি রকম, ব্রেকফাস্টে কোন কোন পদ অতি-

উত্তম, দেশে চিঠি দেবার প্রক্রিয়া কি, কাপড় ধোপার বাড়ি দিতে হলে কি করতে হবে...। কনিষ্ঠের জ্ঞানচক্ষু-উন্মীলনে চেষ্টার কসুর নেই।

জিনিস দেখুন, পছন্দ করুন, এ-দোকানে ও-দোকানে দেখে বেড়ান—কিন্তু এক-দামে নাকি কেনা-বেচা। ঐ যে দর সাঁটা রয়েছে, মাথা খুঁড়ে মরলেও ওর থেকে পাই-ইয়ুয়ান কমবে না।

ইলিয়াসও অবাক। চীনে দোকানে একদর—বলেন কি?

তাই বলে তো দেমাক করছিল। দেখা যাক একটু ভাল করে বাজিয়ে।

আরও ক'জনের সঙ্গে দেখা। তাঁরাও আমাদের। বাজার ঢুঁড়ছেন। অবসর পেলে বাজারে ঘুরে বেড়ানো নেশার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঘুরলাম অনেকক্ষণ ধরে। লাখ পাঁচেকের জিনিস পছন্দ করেছি সকলে মিলে। দোকানিকে বলি, এত মাল গস্ত করছি, দশটা হাজার কমিয়ে দাও এর থেকে বাপু। ভদ্রলোকের মান রাখা তো উচিত। উচিত কিনা বলো?

হাত-মুখ নেড়ে প্রাণপণ করছি তো বোঝাবার! কতদূর কি বুঝল, কে জানে? হাসছে মিটিমিটি। হিসাব করবার একরকম যন্ত্র আছে—তারে-বাঁধা কতকগুলো গুঁটি, ফ্রেমে বসানো। সেই গুঁটির এটা এদিকে ওটা ওদিকে দ্রুত বেগে ঘুরিয়ে কি দিয়ে কি করল—সেই দিকে চেয়ে একটুকরো বাজে কাগজে ফসফস করে লিখে যাচ্ছে। আর আমরাও এদিকে পাঁচ আর নয়ে চোদ্দ, চোদ্দ আর সাত একুশ, একুশের এক নামে হাতে দুই রয়—এমনি করে অনেক কষ্টে যখন লাখ লাখের যোগ শেষ করলাম, দেখি নির্ভুল ওদের হিসাব। কিন্তু কি পাষণ্ড দেখুন—এক ইয়ুয়ান, যার দাম এক পয়সার প'চাত্তর ভাগ, তা-ও বাদ দেয়নি ভদ্রলোকদের খাতির করে। ঠোঁটের উপর ঐ একটু হাসি মাখিয়েই শোধ দিল।

রাগ করে বলি, তবে বাপু চললাম। সওদা হবে না তোমার এখানে—

তখনো হাসি। কথা না বোঝায় সুখ আছে, দেখতে পাচ্ছি। যেমনধারা দেখেছি, কালা হওয়ার দরুন সেকালের এক যশস্বী সম্পাদকের সুখ। নামটাই বলে দিচ্ছি, জলধর সেন—আমাদের জলধর-দা। লেখা ছাপানোর তাগাদার জবাব দিতে হত না তাঁকে।

দোকানদার ইতিমধ্যে আপন মনে ক্যাশ-মেমো কাটতে বসেছে। না গছিয়ে ছাড়ল না দেখা যাচ্ছে।

দশ হাজার না হোক, নিদেন পক্ষে পাঁচ। ছাড়তেই হবে কিছু। আজকে আমরা পণ করে এসেছি।

যোগ দিয়ে ঠিক সেই আগের অঙ্কে এসেছে। তার পরে—ও হরি, বাদ দিয়ে দিল পাঁচ নয়, দশ নয়—হাজার পঁচিশের মতো। ক্যাশ-মেমো সগর্বে পকেটে পুরি। দেখাবো সুইং-ইঞ্জা-মিংকে। বড় যে জাঁক হচ্ছিল, খাতির-উপরোধ নেই—বোবা মানুষেও সওদা করতে পারে! কি হল তবে এই পঁচিশ হাজার বাদ দিয়ে দেওয়া ?

ক্ষিতীশ আচ্ছা জমিয়ে নিয়েছে, দেখি, ওদিকে। বাজনার দোকানে ঢুকে পরখ করছিল একটা যন্ত্র। মিষ্টি হাত। লোক জমে গেল দোকানের জানলায়। তখন গান ধরল কিঞ্চিৎ। আর যাবে কোথায় ? এ ব্যাজ কিনে এনে পরিয়ে দেয়, ও এসে সেকহ্যান্ড করে। তারপর বাজার থেকে বেরুল তো ভক্তদল ফিরছে পিছু পিছু। সমারোহ ব্যাপার !

জাতীয় উৎসব এসে পড়েছে। যে দিকে তাকাই, সাজসজ্জার ধুম। নতুন চেহারা খুলছে অতি-পুরানো পিকিন শহরের। এখন থেকে এই—আর সেই পরম দিনে মানুষজন কি করবে আন্দাজ করতে পারি নে।

বড় বাহার বেরুমলের দোকানের। সাজানো তবু শেষ হয়নি, নিশান টাঙাচ্ছে, তার টেনে এনে আলোর মালা ঝুলিয়ে দিচ্ছে দরজা ও কাচের শো-কেসের চতুর্দিক ঘিরে। মালিক দু-ভাই ফুটপাথের উপর; নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করছেন। আমাদের দেখে হৈ-হৈ করে উঠলেন, আসুন—আসতে আজ্ঞা হয়—

নাছোড়বান্দা। ভিতরে নিয়ে তুললেন। এমনই হয় দূর বিদেশে দেশোয়ালি পেলে। সেই যে বলে থাকে—কোথায় নিয়ে রাখি, ভূঁয়ে রাখলে পিঁপড়েয় খাবে, মাথায় তুললে উকুনে খাবে—এ যেন সেই বৃত্তান্ত।

চা খেয়ে যেতে হবে আজকে। খুব ভাল ভাল বস্তু খাচ্ছেন জানি—কিন্তু নিজের দেশের মতো চা করে খাওয়াবো। সে জিনিস ওরা দিতে পারবে না। বেরুমল চীনা কর্মচারী একজনকে পাঠিয়ে দিলেন উপরে। মাকে বলে এসো নিজ হাতে ভাল করে চা বানাতে কলকাতার বাবুদের জন্য।

বিস্তর জিনিস কিনেছি আজকে। তর্কাতর্কির ঠেলায়, এই দেখুন, সস্তা করে দিয়েছে।

ক্যাসমেমো বের করে ধরলাম। বেরুমল নিশ্বাস ফেলে বললেন, ছিল মশায় সে সমস্ত দিন। একটা বছর আগে এলেও কিছু কিছু নমুনা পেতেন।

এখন ফক্কিকার। মাল কেনো, দাম ফেল—ব্যস, বিদেয় হয়ে যাও। একেবারে শুকনো লেনদেন—দুটো কথা-কথান্তরেরও ফাঁক রাখেনি।

এটা কি হয়েছে তবে? হাজার পঁচিশ ডিস্কাউন্ট আদায় করে ছেড়েছি চেয়ে দেখুন।

বেরুমল বললেন, সবাই দিচ্ছে। দোকানিদের ইউনিয়ন ঠিক করেছে, উৎসবের এক হপ্তা পাঁচ পার্সেন্ট বাদ দেবে দামের উপর। তর্কাতর্কি করে থাকেন তো কথার বাজে খরচ করেছেন মশায়। বোবা মানুষ গেলেও ডিস্কাউন্ট পাবে।

ফুটফুটে একটি মেয়ে এলো। বছর আষ্টেক বয়স। নাম মায়া। এরও দিদি আছে—দু' বছরের বড়। বেরুমল বললেন, নমস্কার করো বাবুদের—

মিষ্টি রিনরিনে গলায় মায়া বলে, নমস্তে—

তার পর চা ইত্যাদির সঙ্গে বড়টিও এসে দাঁড়াল।

কি পড়ো তুমি?

ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, হিন্দি। আর চীনাও।

কি সর্বনাশ! শেল শূল গদা মুশল—শিশুপাল-বধের চতুরঙ্গ আয়োজন একেবারে!

বেরুমল বললেন, ফ্রেঞ্চ-ইস্কুল বলে ফরাসিটা পড়তেই হবে। তাহলে কোনটা বাদ দেওয়া যায় বলুন। দূতাবাসগুলোর যত ছেলেমেয়ে ঐখানে পড়ে। ইস্কুলটা স্রেফ বিদেশিদের নিয়ে। বড় মুশকিল হয় এখানে আমাদের ছেলে-পুলের পড়াশুনোর ব্যাপারে।

আবার গল্প জমে ওঠে। সেই আঁতের ব্যথা। ব্যাপার-বাণিজ্যের সুখ একেবারে নেই মশায়। এই মরিশন স্ট্রীটে আগে সাহেব-মেমের ভিড়ে রাস্তা চলা যেত না—এখন চৌকাঠে ঠায় দাঁড়িয়ে গুণুন, গণ্ডা দুই-তিনের বেশি পাবেন না সমস্ত দিনে। শখের মাল কারা কিনবে তবে বলুন? মা-ষষ্ঠীর দয়ায় এরাও অনেক। তা এরা কিনবে শৌখিন আমেরিকান সিল্ক? হয়েছে আর কি!

নীলরঙের গলাবন্ধ কোট আর পাজামা। মেয়ে-পুরুষ সকলের এক পোশাক। দামে অতি সস্তা—টাকা কুড়ির মতো সাকুল্যে। সুতি জিনিস—খুব টেকসই, তুলোর প্যাড দেওয়া শীত ঠেকানোর জন্য। সরকারি কো-অপারেটিভ দোকানে পাওয়া যায়। দূর গ্রামাঞ্চল অবধি গবর্নমেন্ট সরবরাহ করে। দুটোতেই বছর কাবার। সান-ইয়াৎ-সেন চেষ্টা করেছিলেন এই

জিনিস চালু করতে—তিনি তত জুত করতে পারেন নি। এদের আমলে, দেখুন, বিলকুল সব নীল হয়ে গেছে। তা হলে বুঝুন, আমাদের খদ্দের কোথা? দূতাবাসগুলো আছে, আর কদাচিৎ ছিটকে-আসা কেউ কেউ। আর এখন তো এ সবের আমদানি বন্ধ। আর ভাল লাগে না—আগেকার এই মজুত মাল খতম হয়ে গেলে এতকালের পাট চুকিয়ে দুর্গা বলে ভেসে পড়ি।

মাস আষ্টেক আগে—সে কি কাণ্ড—ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। পাশের দোতলা দেখছেন—এক দোকানদার ঐ ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে মরল ওদের হাতে পড়বার ভয়ে। ঘোড়া-ভেড়া সব সমান, মশায়, এ পোড়া দেশে—আপন লোক বলে খাতির-উপরোধ নেই। চোরা-কারবারের দায়ে চারটেকে গুলি করে মারল—তিনটে তার মধ্যে কম্যুনিস্ট, কর্তাদের ভাইব্রাদার। মেরে ফেলল, তা-ও বরং ভাল—প্রাণে বাঁচিয়ে রেখে যে দাগাটা দেয়! এক রকম আছে—প্রশ্ন করে যাওয়া। মানুষটাকে শুতে দেবে না, ঘুমুতে দেবে না—একের পর এক এসে অবিরাম প্রশ্ন। কমাদাঁড়ি নেই প্রশ্নের—দিনের পর দিন পালাক্রমে চলছে। কতক্ষণ সামলানো যায়? প্রশ্নের সাঁড়াশির টানে পেটের কথা হিড়-হিড় করে বেরিয়ে আসে। এই তো দেখছেন, কোন দিকে কিছু নেই—খদ্দের সেজে এরই মধ্যে কতবার দর-দাম নিয়ে গেছে, ঠিক কি! কার ভরসায় কি করবেন তবে বলুন। জানে-মানে সরে পড়াই উচিত।

বেরুমলের দোকান থেকে বেরিয়ে ভাবতে ভাবতে আসছি। ঐ যে খেই ধরিয়ে দিলেন—তারপর খবরাখবর নিয়ে তাজ্জব হয়ে যাই। যা হয়ে থাকে। ক্ষমতা হাতে পেয়ে মানুষের ঠিক থাকা মুশকিল। আদর্শ ধুয়ে মুছে যায়। এক বিপ্লবী দাদাকে জানি—সারা যৌবনকালে ফাঁসির দড়ি পিছলে কোন গতিকে প্রাণ নিয়ে ছিলেন, বুড়ো বয়সে স্বাধীনতার আমলে সেই তিনি পার-মিট বাগানো ঘুঘু। এদেশে যা হয়েছে, ওদেশেও হয়ে উঠছিল প্রায় তাই। মাথা ঘুরে গেল জন কতকের।

আর অমনি ছেড়ে দিল মোক্ষম অস্ত্র—সান-ফান অর্থাৎ তিন মানার আন্দোলন। দুর্নীতি নয়, অপচয় নয় এবং বনেদিআনা নয়। চোরা-কারবার কুলো বাজিয়ে দেশছাড়া করতে হবে; যা নইলে নয় সেইটুকু মাত্র নেবে, জিনিসের এক কণিকা নষ্ট না হয়; আর চিরকাল ধরে ঐ যে বাদশাহি মেজাজ দেখিয়ে আসছে একটা দল—কাজ করবে না, অন্যের শ্রমের উপর বসে বসে খাবে, ক্ষমতা

ও প্রভুত্ব আঁকড়ে থাকবে কলে-কৌশলে—সমূলে উচ্ছেদ করতে হবে তাদের অনাচার।

শাসন-শক্তি ওখানে আলাদা-কিছু নয়—কোন বিশেষ অঞ্চল থেকে পুলিশ-প্রহরায় আপতিত হয় না জনসাধারণের উপর। ঐ বস্তু ছড়িয়ে আছে সর্ব-সাধারণের মধ্যে। তোমাদের গাঁয়ের কাজ, তোমাদের পাড়ার ব্যাপার তোমরাই দেখ—কার বাপু দায় পড়েছে বাইরে থেকে চৌকিদারি করবার? না পেরে ওঠ, পিছনে পড়ে থাকবে তোমরা। পারবে সইতে হেন অপমানের দায়?

এত দুঃখ-দহনের পরও এমন দুর্গ্রহ! কি লজ্জা, কি লজ্জা! টেনে বের করো দুরাচারদের জনসমাজে। মুখে চুন-কালি দাও। সমাজের শত্রু—নতুন-চীনের অগ্রগমনে পথের কাঁটা।

এই হল জনসাধারণের আন্দোলন। তখন ব্যাপারি মহল বলে, আমরাই বা কম হলাম কিসে? ওরা হুমকি দিয়ে কালোবাজার সামলাবে—কেন, নিজেরা সাবাড় করতে পারব না আমাদের ভিতরকার কালো-ভেড়াগুলোকে? ব্যাপারিদের নিজস্ব আন্দোলন উ-ফান অর্থাৎ পাঁচ মানা। ওদের তিন, এদের হল পাঁচ—আরও দুটো বেশি। ঘুস দেবো না, সরকারকে ঠকাবো না, সরকারি মাল চুরি-চামারি করবো না, সরকারি গোপন তথ্য ফাঁস করবো না, ট্যাক্সে ফাঁকি দেবো না।

কে কি অপকাজ করেছ, খুলে বলো সরল মনে। একটা তারিখ ঠিক করে দেওয়া হল—অমুক দিনের মধ্যে নিজের ইচ্ছায় দোষ-ঘাট স্বীকার করো। তা যারা করল—দশের সামনে হা-হুতাশ করে বলল, এমনটি আর কস্মিনকালে হবে না—বকেঝকে ছেড়ে দেওয়া হল তাদের।

ওদিকে হাঁকরাতে লাগল খবরের কাগজ, রেডিও, মিছিল, মিটিং, শ্লোগান। উত্তর-দক্ষিণ পূব-পশ্চিম যে দিকে চরণ ফেলবেন—হৈ-হুল্লোড় পড়ে গেছে। এই তো ব্যাপার যে মালপত্র চেপে রেখে দুটো-পাঁচটা টাকা বেশি নিয়েছে! তা মানুষ খুন করলেও কোন দেশে এতদূর হয় না।

এই এক মজা ওখানে—উপরওয়ালারা একা-দোকা কিছু করে না, নিজে-দের কাঁধে ভার রাখে না, সকলকে নিয়ে দল জোটায়। কেন বাপু, একলা আমাদের কি? চোরা-কারবারের দরুন দুর্ভোগ সর্বসাধারণের নয়? সকলে নির্বিকার আর সরকারি কয়েকটা মানুষ ঢং মেরে বেড়াবে—এমন হবে কেন তাহলে? আর পড়শিরা বিগড়ে রয়েছে—হেন লক্ষ্মীছাড়া স্থানে আর যাই হোক, কালোবাজার কক্ষণো চলতে পারে না।

মামলা দায়ের হল হাজার দুয়েকের মতো। গণ-আদালতের ব্যাপার বেশির ভাগ—কম-বেশি জরিমানা দিয়ে আসামিরা ছাড়ান পেল। কিন্তু প্রাণে মারা ওর চেয়ে বোধহয় মন্দ ছিল না। কি ধিক্কার! এই কাণ্ডের পরে আবার কি মাথা তুলে বেড়াতে পারবে? সমাজদ্রোহী রূপে চিরদিনের মতো দাগি হয়ে রইল।

দু-হাজারের মধ্যে প্রাণদণ্ড চার জনের। চোরা-কারবারের দায়ে গুলি করে মারা হবে। বুঝুন। আর তার মধ্যে কম্যুনিস্ট তিন জন। হয়তো ভেবে-ছিল, আমি শ্রীপ্রভঞ্জন শর্মা, অমুক কর্তার সঙ্গে দহরম-মহরম, মাকড় মারলে ধোকড় হবে, রাজত্ব চালাচ্ছে যখন আমাদের দল। কিন্তু হুকুম শুনে চক্ষু কপালে উঠে যায়।

কি সর্বনাশ, খুনে ডাকাত নাকি আমরা?

হাঁ। একজন দু'জন নয়—হাজারে হাজারে খুন হয়েছে। ডাকাতি এক-আধ জায়গায় নয়, লক্ষ লক্ষ বাড়িতে।

চুলচেরা হিসাব—অপকর্মের ফলে কত মানুষ খেতে পায়নি, কত খাদ্য পাতালপুরীর অন্ধকারে জমিয়ে রেখেছিল। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সে হিসাব জানিয়ে দেওয়া হল দেশের সর্বত্র সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে।

কম্যুনিস্ট পার্টির মাতব্বর গোছের মানুষও আছে আসামিদের মধ্যে। এ সমস্ত চাউর হয়ে গেলে দোষ তোমাদের পার্টির উপরেও পড়বে যে! শত্রুর অভাব নেই, তারা হাসাহাসি করবে—চোখ টিপে বলবে, মাছ খেয়েছে বাপু আরো কত জন, ধরা পড়েছে হাঁদারাম এই কয়েকটি মাছরাঙা। বুদ্ধিমানেরা হেন অবস্থায় চেপে যান, ধমক-ধামক দিয়ে সামলে নেন। কিন্তু ওরা গোঁয়ার-গোবিন্দ। বলে, ছিল এককালে পার্টির মানুষ—এখন পতিত। আর পার্টির চেয়ে অনেক বড় হল মহাচীন।

একজন আকুল হয়ে কেঁদে পড়ে।

পথের কুকুরের মতো তাড়া খেয়ে বেড়িয়েছি কুয়োমিনটাং আমলে, মুক্তি-সৈন্যদের মধ্যে থেকে লড়েছি, ঘর-গৃহস্থালীর দিকে চোখ তুলে তাকাইনি কোনদিন। বিবেচনা করো, আমার গৌরবময় অতীত—

মৃত্যুও গৌরবময় হোক এবার। মহাপাপের মহা-প্রায়শ্চিত্ত।

পিকিন শহরে দুটো লোক প্রাণ দিল এমনি। বাহান্নর ফেব্রুয়ারিতে এমন কিছু বেশি দিন নয়। সারা দেশের মধ্যে বাকি আর দু-জন। পঞ্চাশ

কোটি মানুষের চারটি—ব্যস, এতেই একেবারে ঠাণ্ডা। কালোবাজারে লাল-বাতি। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা—ও-পথের ধুলো আর মাড়াবে!

কি অদ্ভুত পরিবেশ—দেশময় প্রায়-যুধিষ্ঠির হয়ে উঠেছে। মানুষ বটে তো! ইচ্ছে কি করে না দুটো পয়সা এদিক-ওদিক করে বেশি রোজগারের? কিন্তু জোট বাঁধে কার সঙ্গে? এমন হয়েছে, অমন চিন্তা মনের মধ্যে আনতেও ভয় করে। তা ছাড়া খাওয়া-পরা যখন মোটামুটি চলে যাচ্ছে, কিসের প্রয়োজন ঐ হাঙ্গামা-হুজ্জতের মধ্যে যাবার?

(১৭)

সেন্ট্রাল কলেজ অব আর্টসে যাচ্ছেন জন-কয়েক। সে দলে আমার নাম নেই। অফিস-ঘরে চলে গেলাম।

লিস্টি কে করেছেন?

সেক্রেটারি বহুজন। যাকে বলি, তিনিই ঘাড় নাড়েন। শেষে টের পাওয়া গেল, বন্দোবস্ত কুমুদিনী মেহতার। তিনি খেতে গেছেন। খানাঘরে অতএব হানা দিলাম।

আমায় বাদ দিলেন কেন?

একটা বাসে ক'জন ধরবে। লেখক মানুষ, লেখাপড়া নিয়ে থাকেন—ছবিও বোঝেন নাকি?

পরখ করুন। যে ছবি সকলের গরু বলে মনে হবে, ঠিক বলে দেবো পার্বত্য-ঝরণা; জোটো-তালগাছ যাকে বলেন, সেটা হবে বেণী-বিসর্পিণী আধুনিকা। ছবি দেখে দেখে ঘুণ হয়ে আছি—

হেসে হেসে বলছিলাম। তার পরে ঝাঁঝ এসে গেল কথায়।

শিল্পীর দেশ মহাচীন—'হুনুরে চীন'। তাদের নতুন কালের শিল্প-সাধনা চোখে দেখতে দেবেন না—সে হবে না, যাবোই আমি।

আজকে ঘুরে আসুক তো এরা। না হয় আর একদিন—

খাওয়া শেষ হয়েছিল। কুমুদিনী উঠে গেলেন। গটমট করে এক ফাঁকা টেবিলে আমি বসে পড়লাম। টাইপ-করা মেনু দিল হাতে। মেজাজ উষ্ণ—তালিকা ধরে একনাগাড় অর্ডার দিয়ে যাচ্ছি।

নিচে এসে দেখলাম, কলহের ফল ফলেছে। ছাড়পত্র মিলেছে, আমার নামও জুড়ে দিয়েছে তালিকায়।

মেয়েরাই বেশি এই ছবি দেখার দলে। দু'টি মেয়ে-দোভাষিও চলেছে। একটি তো সুইং-ইঞা-মি', আর একটির নাম—লিখে রেখেছিলাম, পেয়ে গেছি সম্প্রতি—চেন-ইয়েন।

আর দেখছি, মেয়েরাই যেন অধিক জমিয়ে তুলেছেন। পুরুষদের ছাপিয়ে। রোহিণী ভাটে হলেন মধ্যমণি। তাঁর ঘরে এসে পিকিনের মেয়েরা ভারতীয় নাচ শেখে। রোহিণীও চীনা নাচ শিখে নিচ্ছেন। গানেরও এমনি পালটা-পালটি চলে। ভারত-চীনের মধ্যেকার হিমালয় পর্বত নিতান্তই নস্যাৎ করেছেন ও'রা নাচ-গানের দাপটে।

আর ঐ গোলমেলে চীনা নামে তৃপ্তি হচ্ছে না বোধ হয়। বাসের মধ্যে সেই কথা উঠল। রোহিণী বললেন, ভাই তোমাদের নাম দিয়ে দিচ্ছি আমাদের ভাষায়। সুইংকে বললেন, তোমার নাম হল ঊষা। চেন-ইয়েনকে বললেন, তুমি সন্ধ্যা।

ওরা হেসে খুন। উছা-উছা। বার কয়েক বলে বলে সুইং তো নতুন নাম রপ্ত করে নিল। সন্ধ্যা নামে কিন্তু আমাদের ঘোরতর আপত্তি। কাঁচা-সোনার রঙের মেয়ে—সন্ধ্যা কেন সে হতে যাবে? দেশে ফিরে গিয়ে সন্ধ্যা কেন—নিশীথিনী, অমাবশ্যা, ঘোরা তামসী—যত খুশি নামকরণ কোরো। মানাবেও চমৎকার!

সুইং বলে, মানে কি ঊষার? মানে জেনে খুশির অন্ত নেই। বলে, ভারি ভালো নাম—আমার বড় পছন্দ। ভারতের যা-কিছু শোনে, সমস্ত ভালো ওর কাছে। বলে, তোমাদের ভারতে যাবো আমরা। দেখতে বড় লোভ হয়। যাবো যখন, আমায় কিন্তু এই নামে ডাকবে।

তা যেন হল—কিন্তু তোমার ঐ আদি-নামের মানেটা কি, এবার শুনি আমরা।

কিছুতে বলবে না। ফিক-ফিক করে হাসে। বলে, জানি নে—

তাই কি শুনি? এমন চালাক মেয়ে তুমি—গ্রাজুয়েট হয়েছ, দুনিয়ার তাবৎ ব্যাপারের মানে জেনে বেড়াও, আর নিজের নামের মানে জানো না?

মানে নেই আমার নামের—

তখন বোঝাচ্ছি, দেখ মিথ্যেকথা বলতে নেই। বিশেষ আমরা হলাম যখন থিয়েন-চু—

আধুনিকা এরা স্বর্গনরক মানে না, থিয়েন-চু বলে ভয় ধরানো যাবে না। তবু অতিথিজনে এমন করে বলছে—বিশেষ যেগুলোকে সে অহরহ তাড়না করে বেড়ায়। সলজ্জ কণ্ঠে বলল, বিশ্রী নাম—মানে বলতে লজ্জা করে আমার। তখন এত সমস্ত কেউ তো জানত না, ফিউডাল নাম রেখেছেন বাপ-মা—

ঘাড় নাড়ে আর হাসে।

না-না, সে আমি কিছুতে বলতে পারব না।

আরও কৌতূহলী আমরা।

বলতেই হবে। ফাঁস করব না হে, কানে কানে বলো। এইও, কেউ শুনবে না তোমরা—

'সুইং-ইঞা-মি' কথাটার মানে হল, গ্লোরি অব দি ফ্যামিলি—পরিবারের গৌরব।

এই ব্যাপার! আমরা ভাবলাম, কি না কি! খাসা নাম হে তোমার—গৌরব করার মতোই মেয়ে তুমি।

সুইং বলে, ছোট্ট একটু গণ্ডীর মধ্যে গৌরব হয়ে থাকা! পরিবার আবার কি? ওসব বাতিল, থাকা উচিত নয়।

বোঝানো যাচ্ছে, নিখিল মানব-গোষ্ঠীই হল একটা পরিবার! তার গৌরব তুমি। এই রকম মানে করে নাও না—লজ্জার কিছু নেই।

তারপর এক সময় গভীর কণ্ঠে বললাম, আর কোন দিন দেখা হবে না, কিন্তু এই নাম যেন সত্যি হয়ে ওঠে তোমার জীবনে। এই আশীর্বাদ রইল আমার।

পীস-হোটেলে ঢুকল বাস। কয়েকটি আমেরিকান বন্ধুকে তুলে নেবো।

প্রতিশোধ নাও তুমি সুইং, ছাড়বে কেন? তোমাদের ভারতীয় নাম দিয়েছে, তোমরা পালটা চীনা নাম দিয়ে দাও এঁদের—

বেশ তো, বেশ তো—

রোহিণী প্রভৃতি কলকণ্ঠে উল্লাস প্রকাশ করেন।

কাকে কি নাম দিচ্ছ, বলো মুখস্থ করে ফেলি।

নাম বলতে গিয়ে মেয়ে দুটো থমকে গেল।

না, থাকগে এখন। ভেবে-চিন্তে দিতে হবে। এখন নয়, পরে।

নামকরণ হয় নি শেষ পর্যন্ত। অন্তত আমরা কিছু জানি নে।

আর্টস কলেজের মস্ত বড় বাড়ি। ঝকঝক তকতক করছে। পরিচালকেরা এগিয়ে এসে সম্বর্ধনা করলেন। ঘরে ঘরে নানান শিল্পকর্ম। ছাত্রেরা নিবিষ্ট মনে কাজ করছে, পা টিপে টিপে সরে আসতে হয়। তারপর দোতলায় উঠলাম।

সামনেই শ্মশ্রু-সমন্বিত আমাদের আপন মানুষটি—রবীন্দ্রনাথ। বিশাল হলঘরে অগণিত ছবির ভিড়ের মধ্যে সব চেয়ে বৃহৎ আর সর্বপ্রধান। যত অন্যমনস্ক থাকুন, নজর আপনার পড়বেই।

সুদূর চীনের জ্ঞানী-গুণীদের সমাজে গুরুদেব আজও জমিয়ে বসে আছেন, আমরা খবর রাখি নে। এদেশে-ওদেশে চিরকালের ভালবাসাবাসি—নতুন কালে সেই প্রীতি শান্তি ও সৌহার্দ্যের তিনিই দূতিয়ালি করলেন। চীন ঘুরে তাদের চিত্তজয় করে এলেন, চীনা-ভবন গড়লেন শান্তিনিকেতনে—সে কতদিন আগের কথা! চিত্রপটের রবীন্দ্রনাথ প্রসন্ন হাস্যে তাঁর দেশের মানুষদের আহ্বান করলেন। শিল্পীর নাম চু-বি-আন (Chu-bei-huang)। কবিকে শিল্পী চোখে দেখেন নি—মানস-স্বপ্ন তুলির টানে তুলে ধরেছেন।

ঘরের অবধি নেই। ঘুরে ঘুরে দেখছি। হিন্দী কথাসাহিত্যের রাজা মুন্সি প্রেমচাঁদকে জানেন—তাঁর ছেলে অমৃত রায় বিস্তর নোট নিচ্ছেন ছবি সম্পর্কে। ক্ষণে ক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়ছেন কোথাও, ধীরে সুস্থে আনন্দ-স্নান করে চলেছেন যেন রসসমুদ্রে! আমি এক পাক ঘুরে দেখে নিয়েছি ইতি-মধ্যে। আবার এসে ঐ দলে জুটেছি। দোভাষি অবাক—তাদের বলবার আগেই পরিচয় দিয়ে দিচ্ছি অনেক ছবির; যেটা অতি উপাদেয়, রসিক বান্ধবদের টেনে দাঁড় করাচ্ছি তার সামনে। দুই চোখের অপলক সুধাপান—বর্ণনা দিয়ে কি বোঝাব ছবির কথা? পুরানো আর আধুনিক সকল রকম পদ্ধতিতে ছবি এঁকেছে। গ্রামে গ্রামে ছড়ানো লোকশিল্প থেকে অনুপ্রেরণা নিচ্ছে—সর্বক্ষেত্রে তার পরিচয়। আর ঐ যে ওদের নিয়ম, অকেজো বলে কোন জিনিস বাতিল হবে না—ছেঁড়া কাগজ আর টুকরো কাপড় নানান কায়দায় জুড়ে একটু-আধটু তুলির পোঁচ টেনে পুতুল, জানলার পর্দা, ফুল-দানি আরও কত কি শিল্পবস্তু বানিয়েছে। উডকাটই বা কত রঙের আর কত রকমের! দেখে তাজ্জব। নতুন-চীনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প ছবি করে ফুটিয়ে তুলেছে।...কুঁড়ে মানুষ, পরের উপর নির্ভর করে বাঁচতে চায়—আজকের দিনে তার লাঞ্ছনার অন্ত নেই; জনতা টিটকারি দিচ্ছে, মাথা নিচু করে আছে লোকটি—টিটকারির কথাগুলো যেন কানে শুনতে পাচ্ছি জনতার

ভাবে-ভঙ্গিমায়।...ভূমি-সংস্কার হয়েছে—চাষী এবারে জমির মালিক, ঢাকঢোল বাজছে—সেকালের বাতিল দলিলপত্র স্ফূর্তিতে ছুড়ে দিচ্ছে আগুনে।...একটা মজার ছবি—সরল গ্রামবাসীরা ভোট দিতে এসেছে গ্রাম-সমিতি নির্বাচনে। প্রার্থীরা সারি সারি দাঁড়িয়ে—পিছনে ভোটের বাক্স; কোন বাক্সে ফেলবে ভাবছে ভোটদাতারা।...আপোষে মামলা মিটিয়ে নিচ্ছে—আর ওরা মামলা করে উৎসন্নে যাবে না।...শ্রমিকরা নৈশ বিদ্যালয়ে যাচ্ছে।...লড়াইয়ের দুর্দিনে বাচ্চা ছেলেদের শুকনো কুয়োর মধ্যে সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখছে এক মা-জননী...

নাঃ, খাটিয়ে মেরে ফেলবে! এই ছবি দেখিয়ে আনল—রাত্রে আবার অপেরা। নাচ-গান-অভিনয়—হাজার বছরের ঐতিহ্য এর পিছনে। যে সব মানুষ অনেক কাল আগে অতীত হয়ে গেছে, তারাই রূপে উল্লাসে ঝলমল করে দাঁড়াল স্টেজের উপর। পুরানো চীনকে এরা একটুও ভোলে নি নতুন কালের ডামাডোলের মধ্যে। অপচয় ও বাহুল্যের বিরুদ্ধে এত জেহাদ—অপেরার ব্যাপারে কিন্তু দরাজ ব্যবস্থা। আলো, সাজপোশাক, বাজনা, দৃশ্যপট—টাকা ধুলোর মুঠোর মতো ছড়িয়েছে। পরে আরও অনেক পালা ও নাচ দেখেছি—পুরানো বনেদ আধুনিক পালাও অনেক গেঁথেছে। চীনের এই নাচ-অপেরা নমো-নমো করে সারবার বস্তু নয়, মউজ করে বলা যাবে আর একদিন। কি বলেন?

(১৮)

শহর তোলপাড় বার্ষিক উৎসবের আয়োজনে। কাগজে পড়ছি, শুধু পিকিন শহর নয়—সারা চীন মেতে উঠেছে। ১লা অক্টোবর কাল। দেশের দূরতম প্রান্ত থেকে জনস্রোত অবিরল এসে পড়ছে। বাইরে থেকেও আসছে। তামাম দুনিয়ার যাবতীয় যানবাহনের বুঝি একটি লক্ষ্য—পিকিন।

সন্ধ্যায় ভোজ। ভোজ তো হামেশাই হয়ে থাকে—সে এক ভয়ের বস্তু। কিন্তু আজকে বড় স্ফূর্তি। চীন দেশটাই ধরুন ছোটখাট এক পৃথিবী—উৎসব বাবদে তার সকল অঞ্চলের মাতব্বররা এসেছেন, তাঁরা খাবেন। যত দূতাবাস আছে, ঢালাও নিমন্ত্রণ সকলের। আর তাবৎ দুনিয়ার শান্তি-সৈনিক আমরা তো আছিই। পৃথিবীর মানুষ পাশাপাশি পাত পাড়বে—নানান জাত নানান ধর্ম নানান ভাষার মানুষের একসঙ্গে পংক্তি-ভোজন।

খাওয়াচ্ছেন মাও-সে-তুং। ঐটে ভেবে দমে যেতে হয়। ভদ্রলোকের অবস্থা সুবিধের নয়—আমাদের অনেকের চেয়ে গরিব। মাইনে সর্বসাকুল্যে আট শ' (ইয়ং হিসাব দিল, জন তিনেকে আমরা কষে দেখলাম—শ' আষ্টেকের বেশি আমাদের টাকায় কিছুতেই ওঠে না)। তা-ও শুনলাম, দিবারাত্রি হাড়-ভাঙা খাটনি খেটে—রাত্রি একটা-দুটোর আগে কোনদিন শোওয়া জোটে না। ঐ মাইনের ভিতর যাবতীয় ঠাটবাট বজায় রাখতে হয়। অতএব খান দুই-তিন ঘর নিয়ে বাসা, চৌপায়ায় শয্যা। আর অধিক কুলিয়ে ওঠে কি করে? এর চেয়ে প্রথম বয়সে পিকিন য়ুনিভার্সিটির চাকরিটাই বোধ হয় ছিল ভাল। লাইব্রেরির কাজ করতেন ওখানে। আসল লাইব্রেরিয়ান নন, সহকারীদের এক-জন। ছাত্র-ছাত্রীরা ডেকে ডেকে দেখায় আজকে—এখানে বসতেন আমাদের মাও-তুচি, এই টেবিলে লেখাপড়া করতেন। সে আমলে যেমনটি ছিল, আসবাব-পত্র ঠিক তেমনি ভাবে রাখা আছে। ওদের ম্যাগাজিন আছে—যেমন থাকে কলেজ-ইস্কুলে। ম্যাগাজিনের জন্য লেখা চেয়ে পাঠিয়েছিল ওরা মাও-র কাছে। আপনি পুরানো লোক এখানকার, সাহিত্যিক মানুষ—দিন আমাদের কাগজে একটা লেখা। মাও তার জবাব দিয়েছেন, সময় কোথায় ভাই? সাহিত্যের পাট চুকিয়ে দিয়েছি। তোমাদের দিনকাল, তোমরাই লেখো। সেই চিঠি ওরা সগর্বে দেখায় বিদেশি আগন্তুক যারা য়ুনিভার্সিটি দেখতে আসে।

তা সত্যি, ওদের মাও-তুচি সাহিত্যিক হিসাবেও খুব বড়—উঁচু দরের কবিতা-লিখিয়ে। রাজনীতির তালে না গেলে শুধু সাহিত্য করেই দেশ-বিদেশে নাম করতেন, দিব্যি বহাল-তবিয়তে থাকতেন। কিন্তু কপালের গেরো, তাছাড়া আর কি বলি! গুহার ইঁদুরের মতো উত্তর-চীনের পর্বতরন্ধ্রে কাটিয়েছেন কত কাল! যাতে ওঁদের বুলেটিন ছাপা হত সেই যন্ত্র, আর কিছু পরিমাণ সেই বুলেটিন মিউজিয়ামে রেখে দিয়েছে। দেখে হাসি ঠেকানো দায়। প্রথম স্ত্রীটাকে তো জ্যান্ত কোতল করল কুয়োমিনটাঙের লোকেরা; দ্বিতীয় স্ত্রী মরলেন আকাশের বোমায়। ঐতিহাসিক লং-মার্চের সময় দলবল যখন অতি-দুর্গম দক্ষিণ পথে ধাওয়া করেছে, সেই গোলমালের মধ্যে খতম হল দুটো ছেলে। তা বেশ-অনেকখানি হাত পা-ঝাড়া অবস্থা বলতে হবে মাও-র।

আর, কাকে ছেড়ে কার কথাই বা বলি! খোদ কর্তা মশাই ঐ প্রকার, তা হলে মেজো-সেজোদের দশা আন্দাজ করে নিন। চাউ-এন-লাই, চু-তে—ইনি প্রিমিয়ার, উনি কম্যান্ডার-ইন-চীফ—শুনতেই ভারী ভারী, বেতন কুল্যে ছ-শ

তঙ্কা। আমাদের আধা-মন্ত্রীদেরও ওর বেশি মাইনে দিয়ে থাকি। সুন-চিন-লিং ডক্টর সান ইয়াৎ সেনের বিধবা। কাঁচ কাঁচ চেহারা, আগুনের মতো দেহজ্যোতি—তিরিশ পেরিয়েছে, কে বলবে? নতুন-চীনের জননী তো বটেই, জগজ্জননী বলে ডাক পাড়তে ইচ্ছে করে। তা সে যা-ই হোন, রাজধানী পিকিনের বাস্তু দেড়খানা ঘর নিয়ে। সাংহাইয়ের সান ইয়াৎ সেনের বাড়ি দেখেছি (এক বন্ধুর দান অবশ্য)। দোতলা বাড়ি, একটু লনও আছে—আশ-পাশের বিশ-পঁচিশ তলা বাড়িগুলোর সঙ্গে তুলনীয় না হলেও মোটের উপর ভালোই, ছবির মতন। কিন্তু ম্যাডামের ফুরসৎ কোথা সেখানে যাবার? অহোরাত্রি মাত্র চব্বিশ ঘন্টার না হয়ে যদি আটচল্লিশ ঘন্টার হত, তবে বোধ হয় দুনো খেটে ওঁরা আরও কিঞ্চিৎ সুখ করে নিতেন। এ চিত্র আমাদেরও অজানা নয়। মহাত্মাজী জীবনে হাঁটু ঢেকে কাপড় পরতে পারলেন না, দিল্লি এসে জায়গা হত ভাঙি-বস্তির মধ্যে কিন্তু স্বাধীন-ভারতে চটপট ভোল পালটে ফেলেছি। পারেন তো কোন ঐতিহাসিক লিখে রাখুন গে সে সব দিনের কথা, ভবিষ্যতে ছেলেরা পড়বে।

সন্ধ্যাবেলা ওঁরা খাওয়াবেন। দুপুরটাই বা ন্যাড়া যায় কেন? পাকি-স্তানি ভায়াদের খাইয়ে দিই আমরা। আপত্তি কি, যখন স্রেফ মুফতে খাওয়ানো চলে—এক আধেলা খরচ-খরচা নেই? ওঁরা চাইবেন না, আর আগ বাড়িয়ে কড়ি গুণে দেবে এমন আহাম্মক কে আছে কলিযুগে?

চিরকাল একসঙ্গে ঘরবসত—আজকেই ভিন্নভাগ হয়ে হিন্দুস্থান-পাকি-স্তান দু'-এলাকার মানুষ হয়ে দর্শন দিয়েছি। দেশে থাকতে দশ জনে দশ রকম কথায় তাতিয়ে তোলে, বিদেশ-বিভূঁয়ে সেই দশম অবতারেরা নেই। খেতে খেতে অতএব মন খুলে সুখ-দুঃখের কথা চলল। এরোড্রোম অবধি ভার-তীয়েরা গিয়েছিল পাকিস্তানিদের ডেকেডুকে আনতে। 'মন কেমন করে উঠল, ভাই, মাঠের প্রান্তে আপনাদের দেখে। কত দেশের মানুষই তো এসেছে—কই, আপনারা চুপ করে ঘরে থাকতে পারলেন না তো আর সকলের মতো!'

বলছিলেন—ভদ্রলোকের নাম পাওয়া গেল, মজিবর রহমান। এই নাম তো জানি আওয়ামি লীগের সেক্রেটারির, মানুষ পাগল করে তোলেন নাকি তিনি মিটিঙে! এই এক ছোকরা, এমন সারল্য কথাবার্তায়—নাম ভাঁড়িয়ে বলছেন না তো?

কিন্তু পরিচয়গুলো মুলতুবি থাক আপাতত। জরুরি চিন্তা মগজে। পরশু থেকে শান্তি-সম্মেলন। বহুতর উৎকৃষ্ট জবান ছাড়া হবে বিশ্বজনের

হিতার্থে—ঘরে ঘরে নিশিরাত্রে বক্তৃতার মক্স চলছে, অনুমান করি। আর খোদার জীব আমরাও সেই ডামাডোলে নিতান্ত অবোলা হয়ে বসে থাকব না। কিন্তু তোড়ের মুখে হঠাৎ যদি কেউ বলে বসে, বাপু হে, ঘর সামাল করে তারপর পরের ভালো কপচাতে এসো। হিন্দুস্থান-পাকিস্তানে তোমরা যে পায়তারা ভেঁজে বেড়াচ্ছ, সেইটেই ফয়শালা আগে করো দিকি।

মিলেছি যখন এই কল্যাণ-পরিবেশে, উপায় কিছু বাতলাবোই। মারা-মারি-কাটাকাটি করে যে সুহৃৎবর্গের গোপন আনন্দ জুগিয়েছি, ভাব করে ফেলে তাদের মুখে কাষ্ঠহাসি ফোটাব। ভায়ে ভায়ে ঝগড়া নিজেরাই মেটাবো—বাইরে কেউ নাক গলাতে এসেছে কি নাক কেটে শূর্পণখা বানিয়ে দেবো নির্ঘাৎ...

সত্যি, কি মিষ্টি লাগল যে সকলের কথাবার্তা! মিষ্টি লাগল সেই ভোজের ঝাল-দোরমা অবধি (অতিকায় ঝাল-লঙ্কার খোলে মাংস ইত্যাদির পুর)। দইকে বলে সাওয়ার মিল্ক (sour milk)—ভোজের টেবিলে সেই দইয়েও যেন মধু ছিল সেদিন!

সন্ধ্যায় অনেক ধকল আছে—বিকালের বক্তৃতাদি থেকে রেহাই পাওয়া গেছে তাই আজ। দেদার ছুটি—কি করা যায়? আবার কি—ঘুরে ফিরে দেখে বেড়াও কালকের উৎসব-ব্যবস্থাদি। দেখে দেখে সাধ মেটে না। বেলাবেলি কিন্তু ফেরা চাই হে—সেজেগুজে যে যার ঘরে বসে থাকবে, পাক্কা ছ'টার সময় বাসে পুরে ও'রা অকুস্থলে চালান দেবেন। সবে তিনটে বাজল—ছ'টার অনেক দেরি। চলো।

সাহস কি পরিমাণ বেড়ে গেছে, শুনুন। আমার ধুতি-পাঞ্জাবিতে দৃষ্টি দিলে রক্ষে নেই—তেড়ে তেড়ে ধরছি তাদের। হাত টেনে নিয়ে সেকহ্যান্ড করি। ইন্দু, ইন্দু! ভালবাসা কুড়িয়ে টহল দিচ্ছি পিকিনের রাস্তায় রাস্তায় রাজচক্রবর্তীর মতো।

কাল জাতীয় উৎসব—যেদিকে তাকাই তারই আয়োজন। মানুষের অন্য ভাবনা-চিন্তা লোপ পেয়ে গেছে। মরা চীন নবীন মন্ত্রে মেতে উঠল এমনি দিনে তিনটে বছর আগে। নেপোলিয়ন সেই যে বলেছিলেন—'চীন? ঘুমন্ত দৈত্য—পড়ে থাকুক অমনি ঘুমিয়ে। জেগে যদি ওঠে—আরে সর্বনাশ! তামাম দুনিয়ার ঝুঁটি ধরে ঘুরপাক খাওয়াবে।' সেই কাণ্ড ঘটে গেল শেষ পর্যন্ত।

লাল সিল্কের উপর সোনার হরপ বসিয়ে যাচ্ছে। মূর্খ মানুষ—পড়বার

ক্ষমতা নেই। কি হে, কি অত লিখলে বলো দিকি? একটুখানি পড়ে মানে বলে দাও। 'চিরকাল বেঁচে থাকুক আমাদের এত সাধের নবীন-চীন; দশ হাজার বছর বেঁচে থাকুন আমাদের আদরের মাও-তুচি...'

মাও-তুচি মানে হল চেয়ারম্যান মাও। কণ্ঠের সমস্ত মধু ঢেলে দিয়ে ওরা উচ্চারণ করে। কেন জানি আমার মনে হত, প্রীতি বা শ্রদ্ধা তত নয়—বাৎসল্যের রসে কানায় কানায় ভরা কথা দুটো। চীনের তাবৎ মেয়ে-মদ্দ বাচ্চা-বুড়ো মাও-সে-তুঙের মা বনে গিয়েছে। আহা, বিস্তর কষ্ট পেয়েছ তুমি মাও—আর নয়, সর্বসুখ ও শান্তি আসুক এবার জীবনে। কোটি কোটির মনে অহোরাত্রি ঐ একটি কামনা।

আলো, ফুল, পাঁচ তারার রক্তনিশান, পীচবোর্ডের পায়রা—যেটা যেখানে চলে, সমস্ত খাটিয়ে ফেলতে হবে সন্ধ্যার আগে। আনন্দ-সজ্জায় ত্রুটি না থাকে কোন রকম। রাত্রে আজ বাড়িতে বাড়িতে ভোজ। বিয়ের আগে অধিবাসের মতন উৎসবের শুরু সন্ধ্যা থেকেই বলতে পারেন।

তিয়েন-আন-মেন স্বর্গীয় শান্তির দরজা—নতুন গাঁথনি হয়েছে তার এদিকে-সেদিকে, নতুন করে রং ধরিয়েছে। হামেশাই এ পথে গতায়াত—সকালে, সন্ধ্যায়, দুপুরে, কখনো বা রাত দুপুরে। দিনে দিনে তিয়েন-আন-মেনের নতুন বাহার খুলছে। শরতের রোদে সমস্তটা দিন ঝিকমিক করে, আলো যেন ঠিকরে বেরোয়। শান্তির দরজা—তাই বটে! সুবিশাল অলিন্দের নিচে বড়-দুয়ারটা খুলে ফেললেই বুঝি বিক্ষোভ-বেদনার সীমান্ত-পারে নিশ্চল মহিমময় শান্তি! দরজা ও পরিখা ইত্যাদির সামনের দিকটা বড় রাস্তা—পিকিনের চৌরঙ্গি বলতে পারেন। তার ওধারে অনেকগুলি পার্ক—পাঁচিল ভেঙে একসা করে দেওয়া হয়েছে। সমস্তটা মিলে পিপলস্ পার্ক। ভেঙে চুরে প্রতি বছরই জায়গা বড় করা হচ্ছে, এবারও হয়েছে, নইলে কুলোয় না। সবুজ ঘাস বসানো হয়েছে পার্কে, আর দূরতম প্রান্তে নানা রকম ফুল। কত ফুল ফুটে আছে, দুলছে প্রসন্ন হাওয়ায়!

সারা রাত আলো-আলোময় করে রাখে উৎসব-ক্ষেত্র। তিনশ' কুড়িটা জোরালো বাতি—সিনেমা-স্টুডিয়োর যে ধরনের বাতি লাগে। গেল-বছর যা ছিল, তা থেকে একশ' কুড়িটা বেড়েছে। মহাচীনের বহু কোটি মানুষের প্রত্যাশা কেন্দ্রিত যেন এই একটি জায়গায়। এ আলো সরিয়ে নেওয়া হবে না উৎসব অন্তে। বছরের প্রতিটি রাত্রে জ্বলবে।

শহর উৎসব-সজ্জা পরেছে। কাল যা দেখেছি, সকালবেলা দেখি ভিন্ন

এক রূপ। এখন আরও চমকদার। আর এই শহর-জায়গা বলে নয়—শুনতে পাচ্ছি, কাগজে পড়ছি, দেশের তামাম জায়গা জুড়ে এই কাণ্ড।

দোকানের সামনে, বাড়ির দরজায় দরজায় লাল সিল্কের গেট বানিয়েছে। চীনের ঐ চিরকালের রেওয়াজ—আমোদ-স্ফূর্তিতে এন্তার লাল সিল্ক ওড়ায়। আর বিশ-তিরিশ হাত অন্তর লাউডস্পীকার। চতুর্দিক গমগম করছে। উৎসবের বাজনাবাদ্য এবং হৈ-হুল্লোড় ঘরে বসেই কানে যাবে। কিন্তু যা কাণ্ড—ঘরে থাকবে কি একটা মানুষ কালকের দিনে?

শান্তি-সম্মেলনে দেশ-দেশান্তরের মানুষ আসছে। জল স্থল আকাশ—সকল পথে আনাগোনা। আসছে এখনও—ঐ যে ইয়ং-পায়োনিয়ররা এবং এক-গাদা ফুলের তোড়া বাস বোঝাই হয়ে চলল এরোড্রোমে কিংবা রেল-স্টেশনে। উঃ, এতও পারে মানুষ! হরবখত অভ্যর্থনা। একটা দল আছে শুধু অভ্যর্থনা করতে। এদ্দিনে ফুল যা খরচ হল, শুধু সেই হিসাবটা ধরুন না! জমিয়ে রাখলে এক পাহাড় হয়ে যেতো।

দেশে দেশে মানুষের কত রং রূপ চেহারা পোশাক এবং মেজাজ থাকতে পারে, এখন এই পিকিন শহরে পাদচারণা করেই অনেকটা আন্দাজ পেয়ে যাবেন। আর বাইরের মানুষ বলে কেন—চীন একাই তো প্রায় এক পৃথিবী! পাঁচ হাজার বছরের পাকা ইতিহাস আছে, সেই গুমরে তো বাঁচেন না। কিন্তু মরু-জঙ্গল ও গুহান্ধকারে হেন জাতও আছে, এই সেদিন অবধি যারা হাজার পাঁচেক বছর পিছনে ছিল। এখন অবস্থা পালটেছে অবশ্য—তারা আলোয় এসেছে। চীনা মহাজাতির সমান হকদার—আর দশটা মানুষের সঙ্গে তাদের সমান ইজ্জত।

আসছেন তা-বড় তা-বড় বীর—কৃষক বীর, শ্রমিক বীর। কোরিয়ার যুদ্ধে যারা ভলাণ্টিয়ার হয়ে গেছে, মেয়েরাও আছে তার মধ্যে—তাবৎ বিশ্বজনের কাছে তারা লড়াইয়ের টাটকা খবর ও চোখে-দেখা বৃত্তান্ত নিবেদন করবে। ইংরেজি নিউজ-রিলিজ ও সাংহাই-নিউজ দিয়ে যায় আমাদের রোজ। তার মধ্যে দেখতে পাই, পাল্লা চলেছে ফ্যাক্টরিতে ফ্যাক্টরিতে। উৎসব-ক্ষণে কাজের পরিচয় দিতে হবে না? প্রাণপাত করে খেটেছে—যে কাজ এক বছরে করবার কথা, আট মাসে তা সেরেসুরে বসে আছে। কাজ দাও, আরও কাজ, আরও। পয়লা অক্টোবর তাদের পরম প্রিয় মাও-তুঁচিকে দেখাতে চায় কে কি করেছে দেশের জন্য। মাও, তোমার পিছনে আছি আমরা—চীনের আবালবৃদ্ধ সকলে। তুমি যা চেয়েছ তারও এগিয়ে আছি, এই দেখ!

জিনিসপত্রের বেচাকেনা অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে। পুজোর বাজার আর কি! আমাদের কলকাতায় এই হপ্তাখানেক আগেও যেমনটা ছিল। অনেক দুঃখ-ধান্দার পর দিন পেয়েছে—ঐ পরম দিনে জগৎবাসীর সামনে সেজেগুজে তারা অসামান্য হয়ে দাঁড়াবে। দাঁড়ানো বলি কেন—নেচে বেড়াবে, অফুরন্ত জীবন-প্রবাহে ভেসে ভেসে বেড়াবে। দিকে দিকে তার আয়োজন।

ঘুরতে ঘুরতে মনের মধ্যে কেমন করে ওঠে। কি মাতামাতিটা করেছিলাম সাতচল্লিশ সনের পনেরই আগস্ট দিনটায়। তার পরে মিইয়ে এলো বছরের পর বছর। রীতরক্ষার মতো এক একটা নিশান তাই বা তোলে ক'জন? মনে থাকে না তারিখটা।

হোটেলের দরজায় কুমুদিনী মেহতা। দরজা থেকে নেমে লনের এদিক-ওদিক তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে এক-একবার দেখে আসছেন।

শিগগির তৈরি হয়ে আসুন। দু-মিনিটের মধ্যে।

ছ'টার দেরি আছে এখনো—

হাতমুখ নেড়ে কথা বলা শ্রীমতীর অভ্যাস। সেই ভঙ্গিতে বললেন, সময় বদলে গেছে। খবর পাঠিয়েছে, রওনা হতে হবে সাড়ে-পাঁচটায়। দুঃখ প্রকাশ করেছে এই গোলমালের জন্য।

কিন্তু সময় আছে মনে করে যাঁরা না ফিরবেন?

যাওয়া হবে না তাঁদের—

রায় দিয়ে তর-তর করে তিনি উপরে উঠে গেলেন। সময় বদলের খবর চাউর হয়ে গেছে এদিকে। হন্তদন্ত হয়ে সবাই ছুটেছেন। একে দুয়ে তৈরি হয়ে নামতে শুরু করলেন আবার। নেমে এসে হলের ভিতর দাঁড়াচ্ছেন। সময় অতি-সংক্ষিপ্ত—এরই মধ্যে যেটুকু পারা গেছে। হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ক্রিম ঘসছেন—টেড়ি ঠিক করছেন কেউ কেউ। যে বঙ্গনন্দনকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোট-প্যান্ট ছাড়তে দেখি নি, তিনি দেখি ধুতি-কামিজে সেজেছেন, স্কন্ধোপরি শাল। মেয়েদের তো চেনাই দায়—এক একটি পটের পরী হয়ে আসছেন বাহারের সাজ-পোশাকে। ক্ষিতীশ বলে, কত শাড়ি বয়ে এনেছে রে বাপু, ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলানোর জন্য! তা দোষ দিলে হবে কেন—পাগড়ি বিহনে পেয়াদা অথবা খোলা বাদ দিয়ে চিংড়িমাছের কি বাকি থাকে বলুন? মুখের বাক্য শুনে বিতৃষ্ণা ধরলেও ঐ সাজের দৌলতে লোকে সিকি মিনিট কাল চেয়ে থাকবে

অন্তত। আজকের এই সব শাড়ি এত দিনের মধ্যে অঙ্গে ধরেন নি—তোলা ছিল পরম দিনের জন্য। চাট্টিখানি কথা নয়—মাও-সে-তুঙের সঙ্গে এক ঘরে বসে খেতে হবে। আরও যদি কপালে থাকে, তিনি হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন সেকহ্যান্ডের জন্য। কিছু বলা যায় না। হাতের তলায় একটু ক্রিম ঘষে নেবেন নাকি?

আমার পোশাকের কিঞ্চিৎ রকমফের আছে। বিলকুল সাদা। সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি এবং ধবধবে আলোয়ান। বলতে পারেন, কালো কালো হাত দুখানা ঐ যে বেরিয়ে রইল সাদা হাতা উত্তীর্ণ হয়ে? ছন্দপতন ঠিকই—কিন্তু আমি তার কি করতে পারি বলুন? স্রষ্টা যে অনেক ঊর্ধ্বে থাকেন—কৃষ্ণ হাতের নাগালের ভিতর থাকলে উত্তম রূপ পরিচয় করা যেত।

সুরলোকের ক্রিয়াকর্মে নারদ ঢেঁকি চড়ে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ করতেন—আজকের ব্যাপারও প্রায় তাই। পাইকারি নিমন্ত্রণ সকলের। আর এক তাজ্জব—এত নিমন্ত্রণ-পত্র গিয়েছে, সমস্ত হাতের চিত্রকর্ম—মাও-সে-তুঙের সই প্রত্যেকখানা চিঠিতে।

হোটেল থেকে সারবন্দি মোটরগাড়ি আর বাস চলল নিমন্ত্রিতদের নিয়ে। ডক্টর জ্ঞানচাঁদের পাশে আমি। জাঁদরেল পণ্ডিত, ভারত সরকারের অর্থনীতিক উপদেষ্টা ছিলেন—প্রদীপ তুলে চাঁদকে আমি আর কি দেখাব?

জ্ঞানচাঁদ বলেন, এক আই, সি, এস, সাহিত্যিক আছেন বাংলায়—হ্যাঁ, হ্যাঁ, অন্নদাশঙ্কর রায়ই বটে! তাঁকে আমি জানি। লেখেন কেমন? তিনি এলে বেশ হত। মতামত যা-ই হোক, চোখ মেলে দেখলে তবে বিচারের সুবিধা হয়—

জনারণ্য পথের দুধারে। কি করে অভিনন্দন জানাবে ভেবে পায় না। উল্লাস ফেটে পড়ছে তাদের চোখে-মুখে। তাই তো ভাবি, কোন সে মন্ত্র যাতে সকল বয়সের মানুষকে মাতোয়ারা করে দেয়! মহাচীন, অতুলন তোমার প্রাণ-শক্তি—আশ্চর্য গতিতে এগিয়ে চলেছ সকল দিকে। সমস্ত মানি। কিন্তু আনন্দের যে প্লাবন দেখে এসেছি দেশের সর্বপ্রান্তে, সমস্ত কর্মোদ্যম ছাপিয়ে দিয়ে তারই হাস্যধ্বনি আজ এই লিখতে লিখতে আমার কানে বাজছে।

সেক্রেটারি-দলের একজন হলেন ধর। উপাধি দেখে আন্দাজ হয়েছিল বাঙালি, ডক্টর নীলরতন ধরের জ্ঞাতগুষ্টি কেউ হবেন বা! তা নয়, পাঞ্জাব-

পুঙ্গব। এক তাজ্জব, হাসতে দেখিনি ভদ্রলোককে। হাসতে জানেন না, তা বলি নে; কিন্তু দগ্ধ চক্ষুর দর্শন-ভাগ্য হয় নি। চলতি বাসের মধ্যেই তিনি তালিম দিয়ে যাচ্ছেন সেই থেকে। নিমন্ত্রণ-চিঠি আছে তো সকলের সঙ্গে? ভাল করে দেখে নিন। পরখ করবে ওরা তন্নতন্ন করে, নামধাম দেখবে। আর আলোয়ান-ওভারকোট ইত্যাকার জবড়জং বস্তু নিয়ে ঢোকা যাবে না, বাইরে রেখে যেতে হবে...

ভয় ধরিয়ে দিলেন দস্তুরমতো; গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে শুনতে শুনতে। মাও-এর সঙ্গে এক দালানে ঢুকবার আগে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি সার্চ হবে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। কি প্রক্রিয়ায় কতক্ষণ ধরে চলবে, সেই এক ভাবনা। অবস্থা গতিকে দোষও দিতে পারি নে। নতুন-চীন চক্ষু-শূল অনেকেরই। গোটা দক্ষিণ ও পূব অঞ্চল জুড়ে বিস্তর সাধুজন জগদ্ধিতায় দল পাকাচ্ছেন গা-ঢাকা দিয়ে। এই দুটো বছর আগে পঞ্চাশ সনের উৎসব-দিনে নায়কগণ সহ গোটা তিয়েন-আন-মেন ডিনামাইটে উড়িয়ে দেবার নিখুঁত ব্যবস্থা হয়েছিল—ব্যবস্থাপকরা তৎপূর্বে শুভার্থীর ভেক ধরে রাজ্যের আতিথ্য ভোগ করছিলেন। আজকের এই অতিথি-পল্টনের ভিতর থাকতেও পারে তাদের চেলাচামুণ্ড শিষ্য-শাগরেদ কেউ কেউ। মুখে হাসি, পকেটে পিস্তল। অসম্ভব কিছু নয়। সন্তর্পণে আমি পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলাম। সকালবেলা নখ কেটেছিলাম—ব্লেডখানা রয়ে গেছে। সকলের অলক্ষ্যে ফেলে দিলাম সেটা—অস্ত্র রাখার দায়ে না পড়ি।

নিষিদ্ধ শহরের এলাকা। আগের দিন হলে আপনার আমার শতেক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। খান পনেরো বাস আমাদের নিয়ে সারবন্দি মস্ত বড় কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকল। আরও কত মোটর, কত বাস এসে জমেছে। গাছে গাছে ভরা বিশাল চত্বর—বিস্তীর্ণ লেক একপাশে। জোরালো আলো দিয়েছে গাছের মাথায়—আলোয় ঝলমল করছে লেকের জল। গাড়ি চলছে কি না চলছে—অত্যন্ত মৃদু গতিতে চলেছে লেকের কিনারা ধরে।

বাস থেকে নেমেও অনেকখানি পথ। একের পিছনে আর একজন—চলেছি তো চলেছিই। পাঁচ-সাত গজ অন্তর ফ্লাশ-আলো—একেবারে দিন-দুপুর বানিয়ে তুলেছে। নিশ্চল দুটো সৈন্য—একের হাতে বন্দুক, অন্যের কোমরে রিভলভার। মানুষ না পুতুল—নেড়েচেড়ে দেখতে ইচ্ছে করে। আর একটু এগিয়ে যেতে—ওরে বাবা! হাজার খানেক হাত শাণিয়ে আছে সেক-

হ্যাণ্ডের জন্য। বিদেশে-বিভূঁইয়ে এবারে প্রাণটা গেল। প্রাণ না-ই যদি যায় —এ হাতে খাবার তুলে ভোজ খাব, তার কোন আশা নেই।

এমনি করে অসংখ্য জাতি ও অগণ্য মানুষের প্রীতির পথ বেয়ে এসে পড়লাম সুবিশাল হলঘরে। আজকে ভোজনাগার—পরশু থেকে শান্তি-সম্মেলন বসবে এখানে। রাজসূয় ব্যাপার—বর্ণনা পড়ে হেন বস্তু ধারণায় আনা যায় না। লম্বা টানা টেবিল সারি সারি চলে গেছে। একটু-আধটু ব্যাপার? হাঁটুন না টেবিলের এ-মাথা থেকে ও-মাথা। পা টনটন করবে। আর টেবিলের উপর থরে থরে সাজানো যাবতীয় খাদ্য ও পানীয়। গুণে দেখলাম, পঁচিশ পদ তো হবেই। টেবিলের দু'পাশে নিমন্ত্রিতেরা লাইন-বন্দি দাঁড়িয়েছেন। বসবার ব্যবস্থা নেই—খেতে হবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ব্যুফে' ডিনার বলে এমনি অবস্থায় খাওয়াকে। আগের দিককার জায়গা বেবাক ভরতি—সুইং ঠেলতে ঠেলতে আমাদের নিয়ে চলল। চলেছি তো চলেইছি। 'আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী?'

কিচলু দলপতি; তাঁকে রেখে দিল এদিকে—কর্তাদের সঙ্গে মোলাকাতের প্রয়োজন হবে। আর নিরামিষাশী যাঁরা—রবিশঙ্কর মহারাজ, যোশি, হোসেন, মালবীয়—এঁদের জন্য আলাদা রকমের সাত্ত্বিক বন্দোবস্ত। বন্দোবস্ত করে এ-দলেও যদি জুটতে পারতাম! পাকিস্তানিরা পিকিনে পরে এসেও, দেখা যাচ্ছে, অধিক এলেমদার—ঠিক সময়ে এসে উত্তম জায়গা বাগিয়ে বসে পড়েছেন। আর আমরা চলেছি, চলেছি—এবং চলেছি দূরপ্রান্তের এক রঙিন দেয়াল লক্ষ্য করে।

ঠিক সাতটায় মাও-সে-তুং এলেন। সঙ্গে তাবৎ নায়কবৃন্দ। চোখে কি আর দেখেছি কিছু? কানের পর্দা-ফাটানো হাতাতালিতে বোঝা গেল, এসেছেন এইবার। হাজার খানেক আমরা—বেশি হবো তো কম নই। নানান চেহারা, রকমারি সাজ-পোষাক। আর অগণিত ফ্লাশ-আলো একসঙ্গে জ্বলে উঠছে, ক্লিক-ক্লিক—ফোটো তুলছে এদিক-ওদিক থেকে—ফ্লাশ-আলো নিবিয়ে দিচ্ছে তারপর। ধর বলেছিলেন, নিমন্ত্রণ-পত্র দেখবে, সার্চ করবে হলে ঢুকবার আগে। রামো! দ্বারে ঐ তো যাত্রাদলের দুই কাটা-সৈনিক, আর তাবৎ লোক এদিকে সেকহ্যান্ড ও হাততালিতে ব্যস্ত। অত হ্যাঙ্গামের ফুরসৎ কোথা? এই তো এলাহি ব্যাপার—অতি উৎসাহীরা আবার ঠেলেঠুলে সামনে ধাওয়া করছেন

ভাগ্যবশে ফোটো উঠে যায় যদি কোন কর্তাব্যক্তির পাশে। নিদেন পক্ষে গা-ছোঁয়াছুয়ি হতেও পারে। আমার ভয়-ভয় করছে—এলাকাড়ি এতদূর ভাল নয় বাপু, কিঞ্চিৎ ফাঁকে-ফাঁকে থাকো। সকলের লাথি-ঝাঁটা খাওয়া জাতটা মাথা খাড়া করে দাঁড়াচ্ছে—বহুৎ জনে মুখে সাবাস দিচ্ছেন, মনে মনে কিন্তু মোটেই ভাল ঠেকছে না।

সামনের দেয়াল ঘেঁসে উঁচু প্লাটফরম। ফুলে ফুলে অপরূপ। আটত্রিশটা দেশের নিশান সাজানো গুচ্ছরূপে। নিশানগুলোর উপরে শিল্পী পিকাসোর আঁকা শান্তির পারাবত। এরই উপর নাজিম হিকমত কবিতা ফেঁদে বসলেন—

> আটত্রিশটা নিশান হলের ভিতর—
> মহীরূহের যেন আটত্রিশ শাখা।
> শাখাদলের মধ্যে পাখা ঝাপটায়
> শান্তির শ্বেত-কবুতর।

আন্দাজ করেছিলাম, উঁচু জায়গাটা মাও-সে-তুঙের জন্য। ভাল করে তাঁকে দেখবে সকলে। তা নয়, শুধু পতাকা ঐ জায়গায়।

বাজনা, আলো আর হাততালি। কি এক ব্যাপার চলছে, একজনে একরকম বলে। মাও এবার করমর্দন করছেন নানান জায়গার মাতব্বদের সঙ্গে...... সুন-চিন-লিং মেয়েদের মধ্যে চলে গেলেন.........চাও-এন-লাই কিচলুকে কি বলছেন, ঐ দেখুন।

দেখছি না কোন-কিছুই, শুধু অগণিত নরমুণ্ড।

এক ললনা—কোন দেশের জানি না, যেমন বেঁটে তেমনি মোটা—আকুলি-বিকুলি করছেন নজর খানেক মাওকে দেখে নেবার জন্য; একবার এদিক একবার ওদিক যাচ্ছেন। মনে হয়, গড়িয়ে বেড়াচ্ছেন সুবিশাল এক পিপে। তারপরে তাজ্জব কাণ্ড—সেই বস্তু টপাটপ দেয়াল বেয়ে অত্যুচ্চ এক কুলুঙ্গি মতো জায়গায় উঠে পড়লেন। রেলিঙ ধরে ঝুঁকে পড়ে দেখছেন। নিম্নস্থ আমাদের রক্ত হিম হয়ে গেছে। বোঝার ভারে রেলিঙ ভেঙে যাওয়া বিচিত্র নয়। ওজনে নেহাৎ তিনটি মনও যদি হন, মাথার উপর পতন হলে নির্ঘাৎ চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যাবো।

তারপর দেখি, যে যেমনে পারছেন—ঐ মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করছেন। মেয়ে-পুরুষ কটা-কালোয় তফাৎ নেই। মানুষের আদিপুরুষ কারা ছিলেন, এতদ্দর্শনে আর সংশয় মাত্র থাকে না। হঠাৎমালুম হল, আমিও শূন্যদেশে। দিব্যি করে বলছি, ইচ্ছে করে উঠি নি—পা দিয়েও উঠেছি কিনা সন্দেহ।

দেয়ালে দেয়ালে ফুলের স্তবক ঝোলানো—তারই একটা দু-হাতে আঁকড়ে ধরেছি, আর পায়ের ভর কাঠ পাথর কি মানুষের মাথার উপর—আজও তা সঠিক বলতে পারব না। দেখতে পেলাম মাওকে—স্পষ্ট দেখছি। অপর দশজনার মতো নিচেই তাঁর আসন। প্লাটফরম আজকে শুধু পতাকার জন্যে —ব্যক্তি-মানুষের চেয়ে পতাকা অনেক বড়।

বক্তৃতা করছেন মাও। চীনা ভাষায় বলছেন। রুশীয় এবং তার পর ইংরেজিতে তার তর্জমা হল। এক-একটা কথা—আর হাততালি ও আনন্দোচ্ছ্বাস।

'প্রিয় বন্ধুরা, সম্বর্ধনা জানাই সকলকে। মহাচীনের তৃতীয় মুক্তিবার্ষিকী এসে গেল। বিশ্বশান্তি ও লোকহিতের জন্য অতীতে আমরা কাজ করেছি, আগামী বছরে আরও অনেক-কিছু করবার আশা রাখি।'

সর্বসাকুল্যে গোটা চারেক বাক্য। সবে থাম ঠেশান দিয়ে কান উঁচিয়ে জুত করে দাঁড়িয়েছি। ব্যস, খতম। বক্তৃতা ও তর্জমা ইত্যাদি নিয়ে সাকুল্যে মিনিট তিনেক। না মশায়, কথাতেও ট্যাক্স লাগে যেন এদের! জওহরলালের রাজ্যের মানুষ—নিক্তি-মাপা কথায় আমাদের সুখ হয় না। অপচয় বন্ধ—তা বলে সভাস্থলের বক্তৃতাতেও?

একজন টিপ্পনি কাটলেন, ডালকুত্তা কুকুর এরা—ঘেউ-ঘেউ করে না, একেবারে মোক্ষম কামড় হানে।

হবে তাই। ভোজন শুরু এবারে। পানপাত্র ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে নানান জাতের মধ্যে ভালবাসা ও বন্ধুত্বের কামনা। এক চীনা ভদ্রলোক—ইংলণ্ড ও কন্টিনেন্টে-পড়া বৈজ্ঞানিক—এগিয়ে এসে আলাপ করলেন। এমনি ঘুরে ঘুরে সকলে আলাপ-পরিচয় করছেন। বৈজ্ঞানিক একটু সুরা ঢেলে দিতে গেলেন গ্লাসে। আমরা নিলাম না। দুঃখ পেলেন বুঝতে পারছি। ম্লান হেসে বললেন, মোটেই চলবে না? ডক্টর জ্ঞানচাঁদ ও আমি লেমনেড ঢেলে নিয়ে গেলাস ঠেকিয়ে রীতি রক্ষা করলাম।

কত দেশের কত মানুষ! অনেকে আসে তীর্থযাত্রীর মতো বছরে একটি-বার। আসে মাওকে দেখতে, মাও-র সঙ্গে কথা বলতে। আত্মীয়-বন্ধু মরেছে লড়াইয়ে, সর্বাঙ্গে কত অস্ত্রের দাগ! সেই অতি-বড় দুর্দিনে ছিল একটিমাত্র পরম আশ্বাস, সকলের চেয়ে আপন জন, তাদের বড় আদরের মাও—মাও-তুচি। মাও আজকেও ঠিক সেদিনের মতো, একই রকমের নীল কোর্তা গায়ে। কোন রকম বিশেষ উর্দি নেই যাতে চেনা যায়, ইনি মাও-সে-তুং—পিকিন-

বাজারের রামা-শ্যামা দোকানদার নয়। পরমাত্মীয়ের মতো সেকালের মানুষগুলোকে কাছে টেনে নিচ্ছেন। পরিচিত কথাবার্তা। মাওকে যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে কেউ প্রশংসা করে, মাও দেখিয়ে দেন তাদের। তাঁর একার কিছু নয়, কৃতিত্ব সকলের। মাও আলাদা নন ঐ মানুষগুলো থেকে।

ভিড়টা এখন কিছু থিতিয়েছে। এগিয়ে গিয়ে অনেকেই মাওকে মুখোমুখি দেখে আসছেন। অধ্যবসায়ী কেউ কেউ সেকহ্যান্ড করে এসেছেন, এমনও শোনা যাচ্ছে। সোয়া-আটটায় মাও হল ছেড়ে চলে গেলেন।

আমাদের পাশের টেবিলে মঙ্গোলিয়ান ও উত্তর-পশ্চিম চীনের পিছনে-পড়া কয়েকটা জাত। একটি মেয়ে—হেন রঙ নেই যা তার অঙ্গের পোশাকে না আছে, তার উপর গাড়ির চাকার ধরনের পাগড়ি মাথায়। হাঁ, সাজ করতে হয় তো এমনি—মাও-সে-তুঙের পরে সর্বচক্ষুর দৃষ্টি এখন মেয়েটার দিকে। এই নাকি জাতীয় পোশাক ওদের। কয়েকটা বছর আগেও শিকার করে ঝলসানো মাংস খেত। এমনি বিস্তর জাত চীনে—আজকে তাদের বড় খাতির, শ্রদ্ধার নব নামকরণ হয়েছে 'ন্যাশনাল মাইনরিটি।' যা কাণ্ড—সবুর করুন কয়েকটা বছর—পয়লা দলে টেনে ওদের তুলবেই।

চাউ-এন-লাই, দেখি, চলে এসেছেন এদিকে। চোখ মেলে দেখবার মতো। এক টেবিলের ধারে আসেন, হাত বাড়িয়ে দেয় সকলে—পাঁচ-দশখানা যা হাতের মাথায় পাওয়া গেল কিঞ্চিৎ ঝাঁকিয়ে দিয়ে গেলাস ঠোকাঠুকি করে গেলাসটা একটু ঠোঁটে ঠেকিয়ে চক্ষের পলকে আর এক জায়গায়। অত বড় হলের হাজার মানুষের ভিড়ে তুড়ুক-সওয়ার হয়ে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

ডান হাত উঁচু করে কার্তিক ওদিকে তুড়িলাফ দিচ্ছে। চাউ সেকহ্যান্ড করে গেছেন আমার সঙ্গে—হেঁ-হেঁ, চালাকি নয়! সন্তর্পণে হাত তুলে রেখেছে, ছোঁয়াছুঁয়িতে মহিমা এক তিল ক্ষয়ে না যায়।

আমি আরও রসান দিই, ও-হাত ধুয়ে ফেলবেন না, খবরদার! ক'টা দিন বাঁ-হাতে খেয়ে নিন। দেশে ফিরে তারপর রুপোয় বাঁধিয়ে নেবেন।

নানান দেশের নানান সাজের মানুষ একখানা ঘরের মধ্যে অসংখ্য ভাষায় হুল্লোড় করছে। বসবার ব্যবস্থা নেই—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হবার যোগাড়। উৎসবে কিছুতে ভাঁটা পড়ে না। পৃথিবীর যত ক্ষ্যাপা জুটে পড়েছে একটা জায়গায় ? হঠাৎ এরই মধ্যে গান ধরে বসল একজন। একজন দু-জন করে বেশ একটা দল। তারপরে আর যাবে কোথায়—সকলকে প্রায় গানে পেয়ে বসেছে—দল তখন আর গোণাগুণতিতে আসে না। ইংরেজি, ফরাসি,

স্প্যানিস, রুশীয়, আর চীনা তো আছেই—আমাদের মঞ্জুশ্রী দেবী বাংলায় গান ধরলেন। কত মানুষ এসে জুটল এই বাংলা গানের দলে। কোন পুরুষ বাংলা জানে না অথচ কেমন দিব্যি ঠেকা দিয়ে যাচ্ছে। এই মানুষই জাত-বেজাত হয়ে এ-ওর বুকে গুলি মারে, এ কি একটা বিশ্বাস হবার কথা ? না, হতে পারে না—এসে দেখে যান এই গানের আসর, আপনিও দিব্যি করে সেই কথা বলবেন।

ফিরছি, অসংখ্য মানুষের তেমনি কর-মর্দন আর হাত তুলে আনন্দ-জ্ঞাপন। রাস্তায় রাস্তায় সকল বয়সের মেয়ে-পুরুষের ভিড়। কাল উৎসব—আজকে এরা ঘুমোবে না, সারা রাত পিকিন শহরে টহল দিয়ে বেড়াবে।

উৎসব-স্থানে, বলেছি তো, আলোয় আলোয় দিনমান। মানুষ এখনই বোধ হয় পাঁচ-সাত হাজার। (খবরের কাগজের লোক নই—কাজেই আন্দাজে বলা। ও'রা নজর হেনে সঠিক বলে দেন। গুণে দেখবার উপায় নেই, অতএব ঘাড় হে'ট করে ও'রা যা বলেন তাই মেনে নিতে হয়)। বাস পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। টের পেয়ে গেছে যে, ভোজের আসরের ফেরত আমরা। হাততালি দিচ্ছে। এক মা যাচ্ছেন রিক্সায় চড়ে বছর খানেকের বাচ্চাছেলে নিয়ে। হাসিমুখে সেই বাচ্চার দু'হাত ধরে তালি দেওয়াচ্ছেন তিনি। রিক্সাওয়ালা রিক্সা থামাল একটু; হাত তুলে আমাদের অভিবাদন জানাল। যারা দূরে ছিল, সচকিত হল হাততালির আওয়াজে। রে-রে করে আসছে অভিবাদন জানাতে। ভিড় হয়ে গেল—চালাও, চালাও গাড়ি। ছুটে আসছে এদিক-ওদিক থেকে—এসে পড়বার আগে পালাও।

হোটেলে এসে স্থির হওয়া গেল না। ঘরে বসতে মন চায় না। আবার বেরুনো হল—একটা গাড়ি নিয়ে বেরুলাম কয়েকজন। আনন্দ, আনন্দ,—আনন্দের লহর খেলে যাচ্ছে আলোকোজ্জ্বল উৎসবমত্ত পিকিনের পথে। রোহিণী ভাটে হাতের বালা খুলে দিলেন একটা মেয়েকে। মেয়েটা যেন পাগল হয়ে উঠল—কি করবে ভেবে পায় না—গলার স্কার্ফ খুলে জড়িয়ে দিল রোহিণীর গলায়। চোখে জল বেরিয়ে আসে—মানুষ এমন মেতে যায় দরদি মানুষদের কাছে পেয়ে! মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ভাবের বন্যায় সারা দেশ ডুবিয়ে দিলেন। সে কেমনধারা ? পুঁথিতে বর্ণনা পরি। উল্লসিত এই জনসমুদ্রের মধ্যে 'শান্তিপুর ডুবু-ডুবু ন'দে ভেসে যায়—' এই গানের কলি কেন জানি কেবলই আমার মনে আসছে।

ভোর হল। ঘুমের মধ্যেই মন নেচে ওঠে। সেই দিন আজকে, এসে অবধি যার নাম শুনছি। যার সম্বর্ধনায় সারা চীন পাগল হয়ে উঠেছে।

ন'টা না বাজতেই তৈরি। তৈরি হয়ে ড্রইং-রুমে ভদ্রভাবে বসে থাকবার অবস্থা নেই। মন আকুলি-বিকুলি করছে। ঘড়ির কাঁটা যেন গরুর গাড়ির চালে চলেছে। ছোট্ না রে বাপু আজকের এই দিনটা! ছুটে চল্—

উন্মুক্ত পথের উপর সকলে পায়চারি করছি। বাস দাঁড়িয়ে সারবন্দি। দোভাষিরা গুণছে আমাদের, নামধাম মিলিয়ে নিচ্ছে। হিসাবপত্র চুকে গেলে তখন বাসে উঠতে বলবে। যত্রতত্র উঠে পড়লে হবে না—ঠিক করা আছে, কোন নম্বরের বাস কাদের বইবে। জামার উপরে রক্তবরণ ব্যাজ। শান্তি-সম্মেলনের মহামান্য বিদেশি অতিথি, যে সে ব্যক্তি নই—ব্যাজের উপরের সোনালি চীনা লিপি নিঃশব্দ চিৎকারে জানিয়ে দিচ্ছে সর্বজনকে।

ভারতীয়দের জন্য দুটো বাস। তিলধারণের জায়গা আছে নিশ্চয়, কিন্তু একটা গোটা দেহ ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া একেবারে দুঃসাধ্য। হেনকালে ডক্টর কিচলু এলেন। তিনি দলপতি—সকলের সঙ্গে একাসনে নয়, আলাদা মোটরে পুরে তাঁকে চালান দেবে। রবিশঙ্কর মহারাজ সহ-দলপতি এবং বুড়ো মানুষ বলে তাঁকেও নিয়ে তুলল সেই মোটরে। যেন শহুরে বিয়ের শোভাযাত্রা —মোটরে কর্তাব্যক্তিরা, বাস ভর্তি চলেছি বরযাত্রিদল।

পিকিন শহরে ঘরবাড়ির গোণাগুণতি নেই; গাছপালাও তেমনি অজস্র। গাছের মাথায়, বাড়ির ছাতে, পাঁচিলের উপর—যেখানে একটু উঁচু জায়গা, সেই-খানে পতাকা তুলেছে। নির্মেঘ আজ আকাশ—উজ্জ্বল রোদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কনকনে হাওয়া বইছে সকাল থেকে, হাজার হাজার রক্ত-পতাকা ঝিলিক দিচ্ছে যেন। হাওয়া না থাকলে এমন বাহার খুলত না। নতুন আশায় ও আনন্দে উন্মত্ত হাজার-লক্ষ মানুষের মন—সেই মনগুলো যেন নতুন সূর্যের রং মেখে চোখের উপরে নেচে বেড়াচ্ছে।

পিপল্স্ পার্ক পিকিন হোটেলের অনতিদূরে—হোটেলের এই একই রাস্তার উপর। ট্রাম-লাইন রাস্তার মাঝখান দিয়ে—দু'পাশে যথারীতি অপরাপর গাড়ি চলবার জায়গা। আজকে এ রাস্তায় গাড়ি যাওয়া মানা। বাস তাই ঘুরে ঘুরে অলিগলি দিয়ে চলল। একটা মানুষ দেখছি নে বিরস-মুখ, একটুকু জায়গা দেখছি নে সজ্জাবিহীন। ফুটপাথের উপর টুল পেতে বসে কয়েকটি বুড়ো-

বুড়ি, আশে-পাশে খেলা করছে বাচ্চারা। গাড়িতে বসিয়ে ঠেলছেও দু-তিনটিকে। বুড়োরা হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে আমাদের—বাচ্চারাও দেখাদেখি হাত নাড়ে। আজকে বাড়িতে আছে শুধু এরাই—ভিড়ের মধ্যে তাল সামলাতে পারবে না। বুড়োরা এইখান থেকে লাউড-স্পীকারে উৎসব শুনবে আর বাচ্চার খবরদারি করবে।

পৌঁছলাম অবশেষে। পিছন দিকে এসেছি—নিষিদ্ধ শহরের মাঝামাঝি। সান-ইয়াৎ-সেন পার্কে বাস রাখল। পায়ে হাঁটা এখান থেকে। মোটরগাড়ি আরও কিছু এগিয়ে যাচ্ছে, মোটরওয়ালাদের কম হাঁটতে হবে।

পাথরে বাঁধানো প্রাচীন পথ। চলেছি তো চলেইছি। খানিক ডাইনে, খানিকটা বা বাঁয়ে। এগুতে এগুতে হঠাৎ পেছুতেও হচ্ছে দু-পাঁচ কদম। গোলকধাঁধা বিশেষ। রাজরাজড়ার ব্যাপার—ধরুন, পাঁচ-সাত শ' পুরস্ত্রী নিয়ে ঘরবসত। তাঁদের গতিবিধি আলাদা রকমের—নগণ্য সাধারণের মতো শাদা-মাঠা সহজ পথে বেড়িয়ে সুখ হবে কেন?

মুশকিল এ যুগে আমাদের—পথ ভুল করে দেয়ালে হুমড়ি খেতে হয়। মোড়ে মোড়ে তাই তীর-চিহ্ন দিয়ে পথ বাতলানো। তা ছাড়া লোকও রেখে দিয়েছে—সসম্ভ্রমে তারা গোলমেলে বাঁক পার করে দিচ্ছে। তিয়েন-আন-মেনের সামনে বাঁ-দিককার গ্যালারিতে আমাদের জায়গা—হঠাৎ এক সময় দেখি, তারই নিচে এসে দাঁড়িয়েছি। উঠে পড়ুন, আর কি!

হেলতে দুলতে উপরে উঠেই যে গ্যাঁট হয়ে বসে পড়বেন, সে জো নেই। দেখতে হবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। দশটা থেকে শুরু, এটা ঠিক আছে—শেষ কখন হবে, সঠিক তার হদিস পাইনি। কেউ বলে একটা, কেউ পাঁচটা। পড়া-না-পারা ছাত্রের মতো অতক্ষণ ধরে বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে থাকা। বেঞ্চিই বটে এক-রকম—গ্যালারির উপরে থাকে-থাকে কংক্রিটের ধাপ বেঞ্চির মতন উঠে গেছে।

এদিকে এই আমরা। আর ডাইনের গ্যালারিতে আছেন শ্রমিকবীর, কৃষক-বীর; মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনারা; কোরিয়া যুদ্ধে হিম্মৎ দেখিয়ে ফিরেছেন যাঁরা। আর শহীদদের মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন। নিঃসীম জনসমুদ্র সামনে। কত মানুষ হবে, দশ লক্ষ? কোস্টারিকার ছাত্র ভেগা একেবারে বসিয়ে দিল —এক লক্ষ নাকি! তুমুল তর্ক। যাদের সালিশ মানি তারা আবার নতুন এক এক সংখ্যা বলে। আরও জট পাকিয়ে যায়। ক্লান্ত হয়ে শেষটা মুলতুবি রাখা হল কালকের দিনের জন্যে। কাগজে কি বেরোয়, দেখা যাক। ছাপার অক্ষর তো মিছে কথা বলে না!

তা আমিই জিতলাম। ডেইলি নিউজ-রিলিজে লিখল পাঁচ লক্ষ। আমি বলেছিলাম দশ—প্রায় তো মিলে গেল, আবার কি!

কি সুন্দর আবহাওয়া যে আজকের! প্রসন্ন সোনালি রোদ আর সেই সঙ্গে হলদে-সাগরের স্নিগ্ধ বাতাস। যেদিকে তাকাই—পতাকা। দিগ্‌ব্যাপ্ত পতাকার সমুদ্রে ঢেউ দিয়েছে বাতাসে। দুনিয়ার মানুষ আমরা পাশাপাশি—পাশের ইরানি ভদ্রলোক পরিচয় করলেন আমার সঙ্গে। কোথায় নিবাস, কি করা হয়, ছেলেমেয়ে ক'টি—ইত্যাকার প্রশ্ন। আমাদের গ্রামাঞ্চলে চাষীরা ভূঁয়ের আলে বসে হুঁকা টানতে টানতে পথিকজনকে যেমন ডেকে ডেকে শুধায়। এরই মধ্যে ঢুকে পড়েছেন, আবার দেখি, অস্ট্রেলিয়ান মহিলাটি। এমনি জমাটি আড্ডা এখানে-ওখানে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চলছে। চলবে যতক্ষণ না নিচের ও'রা শুরু করে দিচ্ছেন।

মুক্ত-চীনের বয়স আজ তিন বছর পুরল—এই তৃতীয় উৎসব। প্রতি উৎসবেই মনে রাখবার মতো কিছু ঘটেছে। পয়লা উৎসবে সারা চীন ঢুঁড়ে নিয়ে আসা হল পিছিয়ে-পড়া জাতগুলোর প্রতিনিধি। দু-চারটে নয়, ষাট রকম আছে এই প্রকার। চীনের মানুষ হয়েও এতাবৎ তারা পরদেশির অধম হয়ে থাকত। খানা-পিনা আদর-আপ্যায়ন আমোদ-স্ফূর্তি হল তাদের সঙ্গে। সমঝে দেওয়া হল—ভায়ারা গুহায় থাকো—ঝলসানো মাংস খাও—আর সাত-রঙা পোষাকই পরো, মোটের উপর কিন্তু তাবৎ চীনের মানুষ এক। কেউ কারো চেয়ে কম নয়। এ পিছিয়ে থাকা আর ক'দিন? হাত ধরো দিকি—হ্যাঁ, হাতে হাত মিলিয়ে মনে মন মিলিয়ে এক হয়ে এসো মহাজাতি গড়তে লেগে যাই।

পরের বছর নানান দেশের মহামহোপাধ্যায়দের আহ্বান করা হল—দেখে শুনে আশীর্বাদ করে যান দু-বছরের নতুন-চীনকে। পুরানো আমলে কত যাতায়াত ছিল, তার পরে চীনের আপৎকালে বন্ধুত্বের পথে কাঁটা পড়ে গেল। আসুন আবার, আমরাও যাবো আপনাদের ওখানে—আসা-যাওয়ায় তো মানুষের কুটুম্বিতা! এই শুভেচ্ছা-মিশনে ভারত থেকে সুন্দরলাল প্রভৃতি এবং পশ্চিম-বাংলার অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী ও নির্মল ভট্টাচার্য গিয়েছিলেন।

আর এই তৃতীয় বারে এসেছি আমরা। নানান দেশের বহুতর গুণীজ্ঞানী এবং ধনীরা আছেন। আবার এমন মহাশয়রাও আছেন, যাঁদের নামের একটা বিশেষণ বলতে গিয়ে—হাতড়ে হাতড়ে শেষটা মরীয়া হয়ে বলতে হয় লেখক। অথবা সমাজকর্মী। জীবনে কোন এক বয়সে একখানা কি প্রেমপত্র লেখেন নি

—নিদেনপক্ষে একপাতা জমাখরচ? তবে লেখক হলেন না কিসে? আর চাকরি করেন কি রাজা-উজির মারেন—সমাজকে বাদ দিয়ে কোন কিছু নয়। সমাজকর্মী বললে, অতএব, মিথ্যে পরিচয় দেওয়া হয় না।

চুপ, চুপ! দশটা বাজল—বিপুল উল্লাসধ্বনি লক্ষ-লক্ষ কণ্ঠে। আকাশ বুঝি বা ফেটে যায়! কেন—হঠাৎ কি হল রে বাপু? আমাদের পিছন দিকে প্রধান ফটকের অলিন্দ। মাও-সে-তুং এসে দাঁড়িয়েছেন সেখানে। সারা চীনের আনন্দ সাগর-তরঙ্গের মতো উত্তাল হয়ে ভেঙে পড়ছে সেই অভিমুখে। তাদের মাও-তুচি! পাশে রয়েছেন সুন-চিন-লিং! তাঁর পাশে চু-তে এবং সারবন্দি নতুন-চীনের নায়কেরা।

মিছিল শুরু। মিলিটারি ব্যান্ড। ঝকঝকে বাজনাগুলোয় রোদ পড়ে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। গুণতিতে এক হাজার। পায়োনিয়র ছেলে-মেয়ে—তারা বিশ হাজার, পরের দিন কাগজে পেলাম। চু-তে এর মধ্যে নিচে নেমে গেছেন কোন সময়—মোটর-বাইকে ভটভট আওয়াজ করে এসে আদেশ নিয়ে গেল তাঁর কাছ থেকে। সৈন্যরা মার্চ করছে—স্থল, জল ও আকাশবাহিনী। অশ্বারোহীদল—ঘোড়ার পা পড়ছে তালে তালে; খটাখট খটাখট—চলেছে তো চলেইছে। চার ঘোড়ায় টানছে কামানের গাড়ি—দু'জন করে চালক—জোড়া-ঘোড়া চালাচ্ছে প্রতি জনে। সারিতে এমনি চারখানা করে গাড়ি, চারটে কামান। লরী বোঝাই সাঁজোয়া বাহিনী আর বিমানধ্বংসী কামান। চলেছে রকেট-বাহী আর কামান-টানা লরী—গড় গড় করে রাস্তার উপর দিয়ে শত শত কামান টেনে নিয়ে চলেছে।

কামানের নাক উঁচিয়ে কালো কালো দৈত্যের মতো ট্যাঙ্ক চলেছে সগর্জনে। মাথার উপরে প্লেনের মিছিল। আশ্চর্য বেগবান জেট-প্লেন চক্ষের পলকে দিগন্ত-পার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। মোটর-সাইকেল চেপে যাচ্ছে নারীসৈন্যের পুরো এক রেজিমেন্ট।

মিছিলের পুরোভাগটা এমনি। ভদ্র-সন্তানের পিলে চমকে যাবার কথা। তার পরে বন্যা এলো—বিচিত্র সাজসজ্জার, ফুলের, উল্লাসের এবং হাজার হাজার শান্তি-কবুতরের। বিদেশি দর্শক আমরা যে ভদ্রস্থ হয়ে দেখছি—নিতান্তই উপরতলায় আছি এবং ঝাঁপিয়ে পড়বার সহজ কোন রাস্তা নেই বলে। হাজার হাজার মুখের হাসি এই যে আসছে পিছনে—মিলিটারি কামান-বন্দুক উঁচিয়ে

আগে ভাগে তারই যেন সতর্ক পাহারা দিয়ে ফিরছে। মাথার উপরে প্লেনের ঝাঁক বুঝি দূরবীন কষে দেখে গেল, দুশমন কেউ ঘাপটি মেরে আছে কি না কোথাও।

সাদা পোশাক-পরা ভলান্টিয়ারদল—সঙ্গে ব্যাগপাইপ জাতীয় বাজনা। সোনার রঙের অতিকায় এক প্রতীক মাথায় তুলে ধরেছে। আসছে ফুলের তোড়া হাতে কলহাসিনী মেয়েরা—যে দিকে তাকাই ফুলের সমুদ্র। আবার আসে ভলান্টিয়াররা পতাকা নিয়ে। কত রং আর কত চেহারার পতাকা!

কি প্রকাণ্ড ছবি সান-ইয়াৎ-সেন ও মাও-সে-তুঙের! জনতা মাথায় নিয়ে চলেছে। অমন বিশাল মূর্তি মানুষের হয় কখনো? আমার আপনার চোখে অবাস্তব, কিন্তু চীনের কোটি কোটি নরনারীর কাছে সত্যি সত্যি এমনই বিরাট ওঁরা। সাধারণ মাপের মানুষের পাঁচ-ছ' গুণ বড় করে এঁকে শিল্পীর তবু যেন তৃপ্তি নেই! ছবি আরও অনেক—কার্ল মার্কস, লেনিন, স্ট্যালিন, চাউ-এন-লাই, চু-তে...এঁরা হলেন প্রমাণ সাইজের।

আর পার্কের প্রান্তে অনেক দূরে ঐ যে ফুলের বাগান, এসে অবধি দেখছি —হঠাৎ তারা দুলতে লাগল। লাল ফুল, বেগুনি ফুল, হলদে ফুল, সবজে ফুল, সাদা ফুল—ফুলে ফুলে কিন্তু মেশামেশি নেই, চৌকো চৌকো সম-আয়তনের বাগান যেন আ'ল বেঁধে আলাদা করা। এ বড় তাজ্জব—বাগানগুলো, একের পিছনে অন্য, এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। এদেরও মিছিল—ফুল-পাতা দুলিয়ে দুলিয়ে আসছে। লাল বাগান ধীরে ধীরে চলে গেল আমাদের গ্যালারি তারপর নেতাদের অলিন্দের সামনে দিয়ে। এলো তার পিছে বেগুনি, এলো হলদে, এলো সবুজ, এলো সাদা...দক্ষিণের গ্যালারির পাশে গিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ব্যাপারটা বুঝলেন? ইস্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েগুলোর কীর্তি। এতও জানে! কাগজের ফুল-পাতা-ডাল বানিয়েছে। সত্যিকারের ফুল-পাতাও আছে—রং বাছাই করে তোড়া বাঁধা। পাঁচ শ' সাত শ' নিয়ে এক একটা দল,—একই রঙের ফুল-পাতা তারা ধরেছে মাথার উপর। আমরা উপর থেকে দেখছি। দেখতে পাচ্ছি, মানুষ নয়—শুধুই ফুল। কাছে এসে যখন মিছিল যাচ্ছে, তখনও সেই ফুল! স্বাস্থ্যে ও আনন্দে ঝলমল উৎসাহ-প্রদীপ্ত নতুন-চীনের ছেলেমেয়ে—ফুলই তো ওরা! সুবিশাল পিপলস্ পার্কে কত-ক্ষণ ধরে রং-বেরঙের ফুল ছাড়া কিছু আর নেই...

আমার চোখে কিন্তু জল এলো। দোহাই পাঠকবর্গ, কথাটা ওদের কানে

যেন না যায়! এত সমাদরের অতিথি—কিন্তু মন খুলে হাসতে পারিনি সেদিন তাদের আনন্দে। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছেছি। এর আগে শুনেছিলাম ঐ পিপল্‌স্ পার্কের একটুখানি ইতিহাস। ১৯১৯ অব্দে প্রথম-মহাযুদ্ধের অন্তে রফা-নিষ্পত্তি হল—জাপানিরাও ভোগদখল করবে চীনভূমির এখানে-ওখানে। হেন উদার পরার্থপর প্রস্তাব ছাত্রদের বরদাস্ত হল না। বেরিয়ে এলো তারা এইখানে—ঐ পার্কের উপর। একটুকরো লাঠিও নেই, একেবারে খালি হাত। এদের উপর নির্ঝঞ্ঝাটে বীরত্ব দেখানো চলে। তাই করলেন কর্তারা—সৈন্য লেলিয়ে দিলেন মিছিলের উপর। ঠিক আমাদের জালিয়ান-ওয়ালাবাগ—আর ঐ একই সনের ব্যাপার। পার্কের মাটি ভিজে গেল ছাত্র-ছাত্রীর রক্তে। আজকে নতুন কালে, দেখ দেখ তারা সব ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে। সেই রক্তাক্ত ভূমির উপর আজকের ফুলবাগিচা। সেদিনের আর্তনাদ, শোন শোন, হাজার কণ্ঠের উচ্ছলিত হাসি। ক্যান্টনের পথে ওং-ঊন সেই যে বলেছিল, মৃত্যুর জন্য দুঃখ নেই, তারা যা চেয়েছিল, পাওয়া যাচ্ছে—গরবী মেয়েটার কথাগুলো মন বড় ব্যাকুল করে তুলছে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের চেহারাটা ভাবছি পিপল্‌স্ পার্কের সীমান্তে দাঁড়িয়ে। ও-বছর অমৃতসরে দেখে এলাম। সারা বিকালটা বসে ছিলাম এক গাছের তলে। সে গাছে বুলেটের দাগ—সামনের বড় দেয়ালেও দাগ ঐ রকম। ডায়ারের কীর্তি-চিহ্নগুলো পরিচায়ক-বোর্ড ঝুলিয়ে পরম যত্নে রক্ষা করছে। সে আমলে ছিল একটা মাত্র সুঁড়িপথ, যার মুখ কামান বসিয়ে আটকে ফেলেছিল। এখন দরাজ ব্যাপার—একটা দিকে পাঁচিল উড়িয়ে রাস্তার সঙ্গে একশা করে দিয়েছে হিন্দু-মুসলমানে সেই বড় দাঙ্গার সময়টা। ডায়ারের কামানে জাত-বিচার ছিল না—আজাদির আমলে আমরা এজাত-ওজাত করে বস্তি পুড়িয়েছি, পাঁচিল ভেঙেছি। পোড়ার দাগ, স্বচক্ষে দেখলাম, মোছে নি আজও। ডায়ারের চেয়ে আমাদের নিজ কীর্তি তবে কম হল কিসে? এক-কালের শোকবিধুর পিপল্‌স্ পার্কে আজকের এই মাতামাতি, আর আমাদের জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রান্তে নিরীহ মানুষের পোড়া-ভিটেগুলো সারি সারি শবদেহের মতো নিঃসাড় হয়ে পড়ে রয়েছে। হিংসার বিষে আরও কালো হয়ে এসেছি চীন থেকে—সত্যি বলছি, এত কালো এর আগে ছিলাম না।

দলের পর দল ধীর পায়ে এগিয়ে চলে—একটুকু থেকে দাঁড়ায় অলিন্দের সামনে এসে। যেখানে মাও ও অপর মহানায়কেরা। হাত তুলে পতাকা

নেড়ে কুসুমগুচ্ছ দুলিয়ে তাঁদের সম্ভাষণ জানায়। ফুটফুটে এক দল মেয়ে আসছে—চুলে সবুজ ফিতে, হাতে সবুজ পতাকা। আসছে পিচবোর্ডে আঁকা শান্তির শ্বেত-কবুতর বয়ে—আরে, আরে—আকাশ ভরে গেল যে উড়ন্ত কবুতরে! আঁকা ছবি কোন ম্যাজিকে পাখনা মেলে আকাশে ওড়ে? তামাম মানুষের দৃষ্টি এবার উপর দিকে। করেছে কি শুনুন—জ্যান্ত পায়রা এনেছে কাপড়ের মধ্যে ঢেকে-ঢুকে। একটা-দুটো নয়—হাজার দু-হাজার! মাও-তুচির সামনে এনে ছেড়ে দিল। উড়ছে, উড়ছে—মুক্তির আনন্দে উড়তে উড়তে দৃষ্টির সীমানা পার হয়ে গেল।

চলেছে ঐ বেলুন নিয়ে। উড়িয়ে দিল এক সঙ্গে নানান রঙের বেলুন পায়রাগুলোর মতো। ঝাঁকে ঝাঁকে বেলুন উড়ছে। পায়োনিয়র দল—কি হাততালি, এরা যখন অলিন্দের সামনে মাও-র দিকে চেয়ে দাঁড়াল।

একটি খোকা আর এক খুকু দরদার ছুটছে ফুলের তোড়া নিয়ে। উঠছে উপর তলায়। ফুল দিয়ে এলো তাদের মাও-তুচির হাতে। ফুল দিয়ে ফিরে আসার পর তবে সে দল নড়ে সেখান থেকে। পতাকা নিয়ে উঠে গেল আর একটা দলের প্রতিনিধি। নিচের মাঠে তখন কি কলরব চলছে আন্দাজ করে নিন। মিছিলে দলের পর দল চলেছে ফুল আর ছবির পায়রা নিয়ে, বেলুন আর জীবন্ত পায়রা উড়িয়ে। বেলুন ওড়াচ্ছে অবিকল আঙুরের থেলোর মতো করে, কত কি লেখা বেলুনের গায়ে। ফুলের সমুদ্র—আনন্দের উন্মত্ত কল্লোল। দালান-কোঠা ভেঙে ফেলবে যে চেঁচানির ঠেলায়! কি বলছে, মানেটা একটু সমঝে দেবেন কেউ? জয় হোক সর্বজাতি আর সকল মানুষের, ব্যাপ্ত হোক বিশ্বভুবন জুড়ে নির্বাধ আনন্দ আর নিশ্চল শান্তি!...

গ্যালারির স্বর্গধামে চড়েও ঢেঁকি এদিকে যথারীতি ধান ভেনে চলেছেন। সবাই মগ্ন হয়ে দেখছে, হাততালি দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে—এ অধমেরই কেবল হাত-জোড়া। বাঁহাতে ছোট্ট খাতা, ডান হাতে কলম। আপনাদেরই আতঙ্কে। ছিটেফোঁটাও ভান্ডারে না জমিয়ে তাবৎ আনন্দ একা একা যদি হজম করতাম, আস্ত রাখতেন কি পাঠক-সজ্জনেরা? তবে ছিটেফোঁটা নিতান্তই—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ অবস্থায় অধিক সঞ্চয় কি করে সম্ভবে?

সদ্য-জোটানো ইরানি বন্ধু হাসছেন আমার গতিক দেখে। সর্দার পৃথ্বী

সিং এগিয়ে এসে বললেন, নিচে যাননি একবারও? রোদে দাঁড়িয়ে আধমরা হয়েছেন—জলটল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসুন। লেখা দু-দশ মিনিট মুলতুবি থাকুক—ভুবন রসাতলে যাবে না।

গ্যালারির নিচের তলায় সারবন্দি খোপ—উঠবার মুখে নজর করে এসেছি। তথায় চেয়ার-বেঞ্চি পাতা, সামনে টেবিল। টেবিলে গরম চা, ঠাণ্ডা মিনারল ওয়াটার এবং ফলটা বিস্কুটটারও বন্দোবস্ত আছে। যেমন আপনার অভিরুচি। চাই কি উপরের গ্যালারিতে আদৌ না গিয়ে সারাক্ষণ ঠাণ্ডা ঘরে বসে চা-সেবন এবং গুলতানি করতে পারেন। কথার কথা বলছি—অতদূর আয়েসি অবশ্য কেউ নেই কোন দলে। খররৌদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিতান্ত অপারগ হলে তবেই নিচে নামছে জিরোবার জন্য। নামলেই তো লোকসান—আমার জন্য থেমে থাকবে না উৎসব। একটা দিনের পরম দৃশ্যে নেহাৎ দশটা মিনিটের অঙ্গহানি হবে তো! পারতপক্ষে কে যেতে চায় তবে আড়ালে?

রবিশঙ্কর মহারাজ, অধ্যাপক শুকলা ও উমাশঙ্কর যোশি নেমে যাচ্ছেন। মহৎ সঙ্গ ধরলাম। এসে দেখি, অধ্যাপক জৈন আর তাঁর আনন্দ-প্রতিমা মেয়েটা। নানা দেশের আরও বহুতর ব্যক্তি। খোপের মধ্যে বাড়তি জায়গা বড় বেশি নেই।

চেয়ারে চেপে বসে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। কই গো, গেল কোথায় ওরা? এই প্রথম দেখছি, খেজমতের লোকের অভাব। সামান্য দু-পাঁচজন আছে—তারা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। ব্যাপার কি মশায়, এদ্দিন রয়েছি—খাতির তাই কমে গেল নাকি? সেই যে কার ঘর-জামাইয়ের গল্পে আছে—পয়লা কিস্তিতে, হবিষে নয়—মানুষে টান ধরল?

উঁহু, ওদের দোষ নয়—সদয় হয়ে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন পূর্বাহ্ণে যাঁরা সব এখানে এসেছিলেন। সে কি কথা—উৎসব-দিনে আটকে থাকবে কেন এত জন? যাও তোমরা—দেখে-শুনে বেড়াওগে। হাত-পা চোখ-কান আছে—আমাদের ব্যবস্থা আমরাই করে নিতে পারব।

কেটলি-ভরা চা এলো বটে কিন্তু পাত্রের অভাব। খেয়ে খেয়ে লোকে রেখে গেছে, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় পড়ে আছে। চক্রেশ তাড়াতাড়ি দুটো কাচের গ্লাস নিজ হাতে ধুয়ে নিয়ে এলো। যোগি বললেন, এঁকে দাও—বই লিখবেন। সকলের আগে দাও এঁকে, বইয়ে তোমার নাম থাকবে।

অধ্যাপক জৈন গম্ভীর মানুষ।—ঘাড় নেড়ে মৃদু হেসে সায় দিলেন।

অতএব সকলের আগে আমি। আর এক গ্লাস দিল শ্রান্ত-ক্লান্ত এক বুড়ো ইংরেজকে। চোঁ-চোঁ করে সাহেব গরম চা সরবতের মতো গিলছে।

চক্রেশ আবদারের সুরে বলে, আপনার বই বেরুলে আমায় পাঠাবেন কিন্তু। অবিশ্যি যদি আমার নাম থাকে। নয় তো দেবেন না। নিজের নাম নেই, পরের একগাদা নাম পড়তে যাবো কি জন্যে?

কিন্তু তুমি তো বাংলা পড়তে জানো না। মিথ্যে করে যদি বলি নাম আছে তোমার—

সে আমি শিখে নেবো এর মধ্যে। বইয়ে নিজের নাম পড়বার লোভে।

তা সত্যি। জলের মতো ইংরেজি ও হিন্দি বলে। চীনাও শিখছে, অল্প-অল্প চীনা বলতে পারে এই তিনমাসের মধ্যে। চক্রেশের পক্ষে কঠিন নয় বাংলা শেখা।

বাপও বললেন, প্রবন্ধ বা বই যা-ই লেখেন, আমরা যেন পাই।

পিকিন ছেড়ে তাঁরা এখন বোম্বাইতে। তাগিদ এসে গেছে ইতিমধ্যে, কি লিখলেন?

আবার উপরে এসে দেখি, মিছিলের ভিন্ন চেহারা। ফ্যাক্টরির শ্রমিকরা চলেছে—নীল পোশাক, হাতে হাতে লাল পতাকা আর ফুল। তাদেরই এক বাজনার দল—পোশাক হল নীল প্যান্ট, সাদা জামা, কোমরে লাল কাপড় ঝুলানো। চলেছে রেলকর্মীরা, বিশাল এক ইঞ্জিন—পিচবোর্ড কিম্বা শোলার তৈরি—তাদের কাঁধে। ইলেকট্রিক শ্রমিক—নতুন নতুন আবিষ্কারের নমুনা লোহার জালের ফ্রেমে আটকে নিয়ে চলেছে। এক দল চলেছে ইয়াং-সি-নদী আটকাবার যে পরিকল্পনা হচ্ছে তারই বিরাট নক্সা বয়ে নিয়ে। ছাপাখানার কর্মীরা নিয়ে চলেছে মাও-সে-তুঙের লেখা এক বই। এত বড় করে বানিয়েছে —একটা মানুষের পক্ষে সে বস্তু বয়ে নিয়ে যাওয়া দুষ্কর। দাঁড়িয়ে ছাড়া পড়া চলবে না, পাতা উল্টাবার জন্য আলাদা মানুষ ঠিক করে রাখতে হবে।

এমনি চলেছে—কত আর লিখব! এক বছরের মধ্যে তারা কি করেছে, বড় বড় হরপে তাই তুলে ধরেছে। কি বেগে এগিয়ে চলেছি চেয়ে দেখ সকলে। চক্ষু মেলে দেখছে তাবৎ বিশ্ববাসী। নব্বুই হাজার এমনি কর্মী—আত্ম-বিশ্বাসে বলীয়ান। ত্রিভুবন থোড়াই কেয়ার করে, চলনে এমন উদ্ধত ভঙ্গিমা!

আসে এবারে চাষীর দল। যেখানে লাঙল চষে, সেই এখন তাদেরই জমি।

চাষীর প্রাণে সকলের বড় যে সাধ, এতদিনে তাই মিটেছে। কত রকম কায়দায় ফসল ফলাচ্ছে! নতুন নতুন যন্ত্রপাতি বের করেছেই বা কত! নমুনা দেখিয়ে যাচ্ছে সেই সব জিনিসের। রাক্ষুসে কুমড়ো-শশা নিয়ে যাচ্ছে। সত্যি সত্যি অত বড়, না মাটি দিয়ে বানানো কুমোরের চাকে?

এবারে অফিস-কর্মচারী, ছাত্রদল, শিক্ষকবৃন্দ। শিল্পী ও সাহিত্যিকরা। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির দল। বিজ্ঞান-ছাত্রদের চিনতে পারি অতিকায় এক মাইক্রোস্কোপ নিয়ে চলেছেন, তাই থেকে।

জনস্রোতের কি শেষ নেই? তাবৎ চীনদেশ যেন এনে জুটিয়েছে পিপল্‌স্‌ পার্কে। আর শৃঙ্খলা কেমন—লাইন ভাঙছে না কোন দিকে একটি মানুষ! কচি কচি ছেলেমেয়েরা হাত-ধরাধরি করে নেচে চলেছে মিছিল ঘিরে।

ছবি তুলছে নানা দিক থেকে। মোভি-ক্যামেরাও চলছে অনেক। পারবে কি বন্ধুরা মুক্তির এই রূপ ছবিতে গেঁথে রাখতে? আমার কলম তো হার মেনে গেল।

অপেরা-দল চলেছে মজার পোশাকে। গায়ক বাদক আর ফিল্মের লোক। কোন শ্রেণীর কেউ আর বাদ নেই। গেরুয়া আলখেল্লায় চলেছেন বৌদ্ধ শ্রমণরা, সাদা টুপি মাথায় মুসলমানরা। চিত্রবিচিত্র সজ্জায় বিভিন্ন মাইনরিটি দল। এক বিপুল পৃথিবী বয়ে নিয়ে যাচ্ছে—তার উপর বিরাট শান্তি-কবুতর পাখনা মেলে আছে। পৃথিবীর ঠিক সামনের দিকটায় আমাদের ভারতের মানচিত্র। পায়রার পাখা দুলছে চলার তালে তালে। পাখনার স্নিগ্ধ ছায়া সমস্ত এশিয়া অঞ্চলটা জুড়ে। খেলোয়াড়রা চলেছে—তরুণ আর তরুণীর দল। স্বাস্থ্য দেখে চোখ জুড়োয়—দৃষ্টি ফেরানো যায় না। মেয়ে খেলেয়াড়রা যাচ্ছে বিল-কুল সাদা পোশাকে। ছেলেদের সাদা প্যান্ট সকলেরই—জামা হল দল হিসেবে লাল হলদে আর সবুজ। পতাকার রঙও আলাদা। এক হাজার এমনি আনন্দ-মূর্তি সমান তালে পা ফেলে রূপের লহর তুলে চলেছে। মাও হাত তুলে আদর জানাচ্ছেন এই ভাবী-চীনদের। মাও-র মুখোমুখি এসে গতি শ্লথ হয়—কি করবে তারা যেন ভেবে পায় না, কত রকমের মনের উল্লাস পোঁছে দেবে মাও-র কাছে!

দুটোয় মিছিল শেষ—পুরো সাড়ে তিন ঘণ্টা। তার পরেও মাও-সে-তুঙের উদ্দেশ্যে কি আনন্দোচ্ছ্বাস! সমুদ্রের আলোড়নের মতো—তার যেন শেষ নেই, সীমা নেই। আর বুঝে দেখুন ঐ কর্তাদের অবস্থা। বেজুত ঠেকলে আমাদের নিচের খোপ আছে—তথায় ছড়িয়ে বসুন এবং যৎকিঞ্চিৎ সেবা নিন।

ও'দের সে জো নেই—কড়া রোদে লক্ষ চক্ষুর সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে এতক্ষণ! বারবার তাকিয়ে দেখছি, অলিন্দের ঠিক মাঝখানে মাও—নিশ্চল নিস্তব্ধ—পটে-আঁকা ছবির মতন। কি ভাবছেন কবি মাও? সেই সমস্ত ছেলে-মেয়ে—পথের মাঝে যাদের হারিয়ে এসেছেন, আজকের আনন্দ-দিনে যারা নেই? কিম্বা সামনের দিনের আরও এক মধুরতর স্বপ্ন—নতুন-চীন যেখানে গিয়ে পৌঁছবে? উৎসব-শেষে এবারে তিনি ছুটোছুটি করছেন এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত—হাত তুলে চারিদিককার অগণিত মানুষকে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাচ্ছেন।

হোটেলে ফিরে গড়িয়ে পড়লাম। ধকল কম নয়—অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোকের পোষায়? ঘুমোই নি তা বলে—জেগে জেগেই দিবাস্বপ্ন।...... মিছিল চলেছে বুঝি এখনো অফুরন্ত প্রবাহে—কলরোল কানে আসে। আহা, তাই হোক—এ আনন্দ না ফুরোয় যেন কোন কালে! মানুষে দুঃখ পায়, মানুষের চোখে জল আসে—আজকের এই ব্যাপার দেখে আর কে বিশ্বাস করছে বলুন? পৃথিবী এমন গরিব নয় যে মানুষগুলোর পেটের ভাত-জোগাতে পারে না, এত সঙ্কীর্ণ নয় সে বাসিন্দাদের জায়গা দিতে পারে না। কাজ করো আর স্ফূর্তি করো ভাই—কেন মিছে বাজে ঝামেলা!

সন্ধ্যার কাছাকাছি ইয়ং এলো।

মিছিলে শেষ হয় নি, রাত্তিরেও আছে। আলো দেবে, বাজি পুড়বে, নাচবে গাইবে খেলবে ছেলেমেয়েরা। আপনাদের জন্য বাসের ব্যবস্থা আছে, আমি এসে ডেকে নিয়ে যাবো—

তার মানে বাসে তুলে নিয়ে ভদ্রজন মাফিক স্থাপনা করবে গ্যালারির উপরে। খাতিরে অতিথি হয়ে উপর থেকে নাচ ইত্যাদি দেখে হাততালি দিয়ে ফিরে আসব সকালবেলার মতো। সেটি হচ্ছে না। ব্রজরাজ কিশোরের সঙ্গে যুক্তি আঁটলাম, আমরা হেঁটে বেড়াবো। হাঁটতে হাঁটতে মিশে যাবো উল্লসিত জনতার সঙ্গে। এর আনন্দ আমার তো ধারণায় আসে না। ওদের সঙ্গে মেশামেশি করে গায়ে গা ঠেকিয়ে ওদের মনের স্ফূর্তির একটুখানি ছোঁয়াচ নিয়ে দেশে ফিরব।

ইয়ং-এর সাড়া পেয়ে কাতরাচ্ছি, বিষম মাথা ধরেছে রে ভাই—হ্যাঁ,

দু-জনেরই। যন্ত্রণায় ছটফট করে এতক্ষণ পরে একটু বুঝি চোখ বুজেছেন—ডেকো না কিশোর মশায়কে।

বিশ্রাম নেবার যথাযথ উপদেশ দিয়ে ইয়ং অগত্যা চলে গেল। দরজা ফাঁক করে করিডরে এদিক-ওদিক দেখে নিঃসন্দেহ হই। গেছে চলে সকলেই—সাততলা হোটেলবাড়িতে সব ঘর ফাঁকা। একশ পাঁচ নম্বর রুমের আমরা দুই ষড়যন্ত্রী এইবার জামা-কাপড় পরে বেরুবার তোড়জোড় করছি।

পৌনে আটটা। পায়ে হাঁটা—অতএব বড় রাস্তা দিয়ে যেতে বাধা নেই। চতুর্দিক কি আলোয় সাজিয়েছে রে! আমাদের হোটেল-বাড়িটারই বা কি রূপ—লনে বেরিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। এখন দাঁড়িয়ে থাকার মুশকিলও কিছু নেই—ফাঁকা লন হা-হা করছে, সব গিয়ে জড় হয়েছে তিয়েন-আন-মেনে।

লাউড-স্পীকারের দ্রুত তালের বাজনা—ফ্লাশ-লাইটের প্লাবন বইয়ে দেওয়া হচ্ছে ঘন ঘন। বুকের ভিতর নাচিয়ে তোলে। ঘরের মধ্যে হেন অবস্থায় কে পড়ে থাকবে—শহরের কোন বাড়িতে বুঝি একটা মানুষ নেই। বাচ্চা ছেলে-মেয়ের হাত ধরে কোনটাকে বা কোলে কাঁখে তুলে চলেছে বাপ-মায়েরা। একটা পুলিশের টিকি দেখতে পাই না—অথচ সবাই কেমন নিয়ম মেনে চলেছে। এতটুকু বেচাল নেই কোন দিকে।

শোঁ-শোঁ করে বাজি উঠছে আকাশে—লাল সবুজ হলদে তারা কাটছে। এক কনফারেন্সে ওদের ঔপন্যাসিক মাও-তুন বক্তৃতা করছিলেন, দেখ হে—বারুদ আমরাই আবিষ্কার করেছি, কিন্তু তাই দিয়ে বানালাম শুধু আতশবাজি—বাজি দেখিয়ে মানুষকে আনন্দ দিলাম। সেই বারুদ কামান-বন্দুকে পুরে মারণ-কর্মে লাগাল অন্য জাত। ঠিক তাই, তাবৎ বিশ্ব বাজির হাতে-খড়ি নিয়েছে চীনের কাছ থেকে। আদি আমল থেকে হালফিল অবধি বহুৎ রকমের বাজি তৈরি করেছে, তারই নমুনা ছাড়ছে মুহুর্মুহু। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে মানুষজন ফুটপাথের উপর বসে পড়ে বাজি দেখছে।

বিপুল এই জনারণ্যের মধ্যে এতটুকু ময়লা কি একটুকরো ছেঁড়া কাগজ বের করুন দিকি! দগ্ধাবশেষ সিগারেট হাতে নিয়ে চলেছি—খুঁজে-পেতে আবর্জনার জায়গা না পাই তো শেষ অবধি পকেটে পুরে ফেলতে হবে। যত এগোচ্ছি, ভিড় এঁটে আসে। সকলে তাকাতাকি করে আমাদের দিকে—বিশেষ করে আমার পোশাকের প্রতি। হিমরাত্রিতে লম্বা ওভারকোট চাপিয়ে অনেক-খানি তবু তো ঢেকে দিয়েছি। বুকে ব্যাজ—কৌতূহলীদের চোখের উপর

সগর্বে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াচ্ছি, পড়ে দেখ সোনার অক্ষরে কি লেখা! দেখছ কি—রবাহূত নই—বড় কর্তাদের নিমন্ত্রণে সকালবেলা ঐ ঊর্ধ্বলোকে ছিলাম। ইচ্ছে করলে এখনো এক লহমায় উঠে বসতে পারি। দর্শন ও পঠন অন্তে নর-নারী ঘাড় নেড়ে অভিনন্দন জানায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মজা পেয়ে গেছে—ঘিরে ধরছে আমাদের। কচি কচি হাত টেনে আচ্ছা করে মলে দিচ্ছি। কত খুশি! খিল-খিল করে হাসছে মুখের দিকে চেয়ে। বালখিল্যের আরও নতুন নতুন দল হাত বাড়াচ্ছে নিচের থেকে।

নাচছে এক-এক জায়গায়। মানুষ জমে গেছে—বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে দেখছে। নৌ-সৈন্যের সঙ্গে নাচছে মেয়েরা। বড় বড় মেয়ে—কলেজের ছাত্রী হয় তো। পবিত্র নিষ্পাপ—মুখ আর হাসি দেখে, কণ্ঠের গান শুনে সাধ্য কি আপনি অন্য-কিছু ভাবেন! আনন্দের বন্যায় সকলে এক। এক মানুষ ও আর মানুষে তফাৎ আছে—কোন মূঢ় আজ উচ্চারণ করবে হেন বাক্য? কানামাছি খেলছে এক জায়গায়। এমনি কত! কাছে এসে আলগোছে কাঁধে হাত ঠেকাচ্ছে, কথা তো বুঝব না—নির্বাক ভালবাসা জানিয়ে যাচ্ছে এমনি করে। বিদেশি আমরা দু-জন নিঃসীম এই জনসমুদ্রে দুটো বারিবিন্দুর মতো মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছি।

অথচ, বছর পাঁচ-সাত আগেকার খবর নি—কেমন ছিল এখানটায়? গা ঘিন-ঘিন করবে শুনে। কালোবাজারির চাঁদনিচক—ফাটকা-জুয়ার আড্ডা। সন্ধ্যের পর নরক গুলজার—পৃথিবীর যত নোংরামি ও সামাজিক পাপের কথা জানা আছে, সমস্ত একখানে। সে সব ভেঙে এখন চুরমার করে দিয়েছে। ছোট-পা পঙ্গু মেয়ে আর লাস্যবতী পণ্য মেয়ে নেই, খুনি বোম্বেটে নেই, পিঠকুঁজো কুলিও নেই—নতুন মানুষ এরা।

একটা নৃত্য-চক্রের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছি। কয়েকটি হঠাৎ এগিয়ে এলো। হাত ধরে টানছে। একটু না-না করি। কিন্তু হাতের আর ভালবাসার টান—সাধ্য কি এড়িয়ে পালাব! নাচের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। কি হাততালি! আমরা দু'জনেও হাততালি দিই। তার পরে, ও হরি! নাচতে বলছে তাদের সঙ্গে। আকারে ইঙ্গিতে বলে, তবু বুঝতে আটকায় না। কিন্তু সাহসটা কি—আমরা কি দরের মানুষ, অবোধ ছেলেমেয়েরা ঠাহর পাচ্ছে না। কথা বুঝবে না—ঠাহর করেই বা কি করে? আবার দেখিয়ে দিচ্ছে, কেমন কায়দায় নাচতে হয়। আসরের মধ্যেই নাচের ক্লাস। নৃত্য-গুরুর বয়স—তা বছর দশেক

হবে বই কি! পরম গাম্ভীর্যে আনাড়ি ছাত্রদ্বয়কে হস্ত-পদ চালনার প্রণালী শেখাচ্ছে।

নেশা লেগে গেল। আহা, এই সুদূর দেশে এদের মধ্যে আবার একটা দিন কয়েকটা মুহূর্ত যাই না কেন ছেলেমানুষ হয়ে! কে দেখছে যে মহাবিজ্ঞ অমুক মহাশয় শিশুসুলভ চাপল্যে মত্ত হয়ে পড়েছেন? গিয়েই ভালমানুষ হয়ে শুয়ে পড়ব। কাল থেকে শান্তি-সম্মেলন—অনবসর কর্মপ্রবাহ, তাবৎ বিশ্বভুবনের জন্য দুশ্চিন্তা তার মধ্যে কেউ খোঁজই পাবে না এক রাত্রের এই ক্ষণিক মতি-বিভ্রম।

আমি নাচছি, নাচছেন ব্রজরাজ। ঢেঙা মানুষ তিনি, মাথায় চকচকে টাক—আর আমি কিঞ্চিৎ গায়ে-গতরে আছি। সিনেমা-ছবিতে লরেন-হার্ডিকে দেখে থাকেন, ধরে নিন তেমনি একটি জোড়া। বিলাতি পোশাক বলে ব্রজরাজের কিছু বাঁচোয়া। আমার আবার একখানা হাত সতত কোঁচা ধারণ করে আছে। নাচের বাহার আন্দাজ করে নিলেন তো রসগ্রাহী পাঠক-সুজন? এতেই রক্ষা নেই—একের পর এক আসছে হাত ধরে এক একপাক নাচবার জন্য। বাজনা বাজছে, গাইছে সকলে। কি গান বুঝিনে—একই কথা বারম্বার আবৃত্তি করে যাচ্ছে। আমরাও করছি তাই। একটা ছোট মেয়ে—মাথায় লাল রিবন—তিড়িং করে এসে পড়ল আমাদের চক্রের মধ্যে। পঞ্চাশ আর পাঁচে হাত-ধরাধরি করে ঘুরঘুর করে নাচছি। সে তাজ্জব দেখলেন না চোখে—লেখা পড়ে কি মজা পাবেন! আবার ভুল বাতলে দেয়—অমন নয়, পা ফেল এমনি-এমনি করে। আরো বেতালা হয়ে যাচ্ছে স্বদেশস্থ আপনাদের কথা স্মরণ করে। হেন নৃত্যের পর আপনারা হলে কি কাণ্ডটা করতেন—টিটকারি না-ই দিলেন, হেসে ফেটে পড়তেন। অথবা মুখে কাপড় দিয়ে প্রাণপণে হাসি চাপতেন—সেইটে হল আরও মারাত্মক। আর এই বাচ্চার দল, দেখুন, ভারি ভদ্রলোক—মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, শ্রদ্ধা সম্ভ্রম আর আনন্দ জ্বলজ্বল করছে মুখের উপর।

এমনি ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম কতক্ষণ। আবার এক জায়গায় গ্রেপ্তার করে আসরে নিয়ে দাঁড় করাল—নাচতে হবে। অত ফেলনা নই বাপু, যে বললেই অমনি নাচতে লেগে যাবো। এখন মনে হচ্ছে, নেচেছি নিশ্চয় উত্তম। দেখে তাক লেগে গেছে, তাই এমনধারা পশার। এই মওকায় কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করব নাকি পিকিন অপেরা-দলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে? সে অবশ্য পরের কথা। আপাতত এক নাচনেই হাঁপিয়ে পড়েছি—প্রাণপক্ষী পঞ্জর-পিঞ্জরের মধ্যে পাখা ঝাপটাচ্ছে। দু-হাত নেড়ে সোজা বেকবুল যাই। হবে

না—কোন উপায় নেই। ওরাই আমাদের ঘিরে নাচে তখন। স্বপদে না নাচলেও হাততালি দিয়ে তাল রাখছি। তালমাত্রায় কেমন পরিপক্ক হয়ে গেছি, এই আধ-ঘণ্টাখানেকের ভিতর। বাজিতে বাজিতে আকাশে আগুন ধরাবার জোগাড়। চাঁদ হাসছে। নাক-ঢাকা পরে ঘুরছে অনেকেই—বারুদের বাতাসে নিশ্বাস নিলে স্বাস্থ্য খারাপ হবে। এই স্বাস্থ্য-স্বাস্থ্য করেই এরা মরবে—আমরা নিরঙ্কুশ কেমন দেখুন দিকি!

রাত অনেক হয়েছে, উৎসবের তবু ক্ষান্তি নেই। ফিরে আসছি আনন্দোন্মাদ জনতার মধ্য দিয়ে। এ ছবি আর কোথাও দেখব! মানুষে মানুষে এমন মেশামেশি, নিশিরাত্রে একসঙ্গে গাইছে বড় বড় ছেলে আর মেয়ে। হাত-ধরাধরি করে নাচছে—

ব্রজরাজ জিজ্ঞাসা করেন, কেমন দেখলেন?

'স্বর্গীয় শান্তির দরজা' ঐ সামনে—এই তো স্বর্গধাম!

কি বলেন, স্বর্গ তো মানেই না এরা—

পাঁকের জীব আকাশের দিকে হাত বাড়ায়। স্বর্গের উল্লাস মাটিতে যারা নিয়ে আসছে, আর এক স্বর্গ কি করবে তারা?

আরও খবর পাচ্ছি ক্রমশ। ক্ষিতীশ গায়ক মানুষ—কাঁধে কাঁধে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে তাকে। গাইতে গাইতে গলা ভেঙে সে ফিরল। রোহিণী ভাটে আর চক্রেশও পাগল হয়ে নেচে বেড়িয়েছেন। সবাই ফিরছেন হোটেলে। নেচেকুঁদে রাক্ষসের ক্ষুধা নিয়ে আসবে—ঘরে ঘরে এক গাদা করে স্যান্ডউইচ আর কলা-আঙুর-আপেল দিয়ে গেছে। দেড়টা বাজল, রাস্তার বাজনা শুনতে পাচ্ছি এখনো। সারা রাত্রি এমনতরো মচ্ছব চলবে নাকি?

এখন একটি চিন্তা। আজকের বৃত্তান্ত দেশে-ঘরে না পৌঁছায়! এমনি তো সভায় সভায় ধুল পরিমাণ—সাহিত্য-ব্যাপার আছে, চীনের কথা শোনাবারও বিস্তর হুকুম আসবে। কত আর অজুহাত রচনা করা যায় বলুন! না-না করেও হাজির হতে হবে বৃহৎ গুণীজনের সামনে। এর উপরে নাচের খবর প্রচার হয়ে গেলে মারা পড়ব। পিকিন-রাস্তায় নেচে এসেছি—অতএব বক্তৃতাদি অন্তে সুনিশ্চিত নৃত্যের ফরমাস হবে। আমার শত্রু বাড়বে—পেশাদার নাচিয়েরা ভাববেন, চীন থেকে ফিরে এই বুঝি আবার এক নতুন লাইন ধরল।

তা আমিও সংকল্প করেছি, সে নাচ কিছুতে দেখাবো না আপনাদের। রাগ করলে নাচার। বলবার কথা আছে—এনে দিন আমার সেই দেব-শিশু নৃত্যসঙ্গী ও সঙ্গিনীদের। আর দশ বছরের সেই নৃত্যগুরুকে—পা ফেলবার

কায়দাগুলো যে বাতলে দেবে। আর সেই পিকিন-পথের রসিক দর্শককুল —মাধুরীময় দৃষ্টি দিয়ে যারা অভিনন্দন করবে। দিলখোলা খুশির প্রবাহ চতুর্দিকে; আকাশে চাঁদ; আলো, আতশবাজি ও বাজনায় মর্তলোকে ইন্দ্রপুরী। পারবেন জোটাতে এত সব? তবে রাজি আছি। নয় তো সে-ই আমার জীবনের প্রথম নাচ এবং সে-ই শেষ।

এইখানে একটু দাঁড়ি টানি। প্রথম পর্বের ইতি। কাল দোসরা অক্টোবর —মহাত্মাজীর জন্মদিন। প্রত্যূষে তাঁর স্মৃতির আরাধনা। রবিশঙ্কর মহারাজ পুরোধা। শান্তি-সম্মেলনের শুরু তার পরে। আমার চীনের কাহিনীর পরের অধ্যায়।

প্রায় একটানা প্রশংসা চলল এত দিন। নিজেরই লজ্জা করছে। নিছক ভালো ভালো বস্তু নিয়ে ধর্মব্যাখ্যা হতে পারে, কাহিনী জমে না। থাকত দেবাসুর অথবা সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব—আপনারা রোমাঞ্চিত কলেবরে পড়তেন। বুঝি—সমস্ত বুঝি। আর ভেবেছিলামও, দিই এক-আধটা কাল্পনিক ভিলেন ছেড়ে কাহিনীর মধ্যে। কিন্তু সেই যে যাত্রা-মুখে কয়েকটি তরুণ বন্ধুকে কথা দিয়েছিলাম, নিজের চোখে-দেখা জিনিস ও অন্তরের উপলব্ধি হুবহু লিখব —তাই কাল হয়েছে। মন্দ মানুষ তবে কি কুলো বাজিয়ে একেবারে দেশ-ছাড়া করেছে? এতখানি বিশ্বাস করি নে। সেই ভরসায় যথাসাধ্য খোঁজাখুঁজিও করলাম। কিন্তু তাঁরা এমন গা-ঢাকা দিয়ে রইলেন যে কোন রকমে পাত্তা পাওয়া গেল না। অদৃষ্ট আমার—আর কি বলব! খোঁজ পেলে তো লেখা মজাদার করা যেত। চীনকে যাঁরা নখের উপর তুলে টিপে মারতে চান সেই মহদাশয়েরাও কিঞ্চিৎ স্ফূর্তি পেতেন।

প্রথম পর্ব শেষ

মনোজ বসুর বই

উপন্যাস

এক বিহঙ্গী—২য় সং। 'ঘরোয়া পরিবেশে সহজ স্বাভাবিক জীবনের প্রকাশ "এক বিহঙ্গী।" লেখকের লিরিক-ধর্মী মন অতি-পরিচিত পরিবেশে এক বিচিত্র জগতের সৃষ্টি করিয়াছে। যে জগতের সন্ধান পাইবার জন্য বর্তমানকালের অসংখ্য তরুণ-তরুণী ব্যাকুল হইয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে। সংলাপের মিষ্টতা ও ভাষার আশ্চর্য সংযম পাঠককে অতি দ্রুত সম্মুখ পানে টানিয়া লইয়া যায়।'—যুগান্তর। দাম চার টাকা।

সৈনিক—৬ষ্ঠ সং। 'বলিষ্ঠ আশাবাদ, নবযুগের দৃষ্টিভঙ্গি, দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম গভীর অনুরাগ 'সৈনিক' উপন্যাসখানিকে আমাদের জাতীয় সাহিত্যে অনন্য-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবে।'—যুগান্তর। দাম সাড়ে তিন টাকা।

ওগো বধূ সুন্দরী—৩য় সং। স্নিগ্ধ-মধুর প্রেমের উপন্যাস। আগাগোড়া দুই রঙে ছাপা। বিচিত্র প্রচ্ছদপট। উপহারের শ্রেষ্ঠ রুচিসম্মত বই। দাম দুই টাকা বারো আনা।

বকুল—৩য় সং। 'কুশলী কলমের গুণে ছোট-বড় প্রত্যেকটি চরিত্র মনে স্থায়ী ছায়া রেখে যায়। মিষ্টিমধুর উপন্যাস রচনায় মনোজ বসু খ্যাতিমান। শুধু খ্যাতিমান নয়, অপ্রতি-স্বন্দ্বীও। "বকুল" তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।'—সত্যযুগ। দাম দুই টাকা।

নবীন যাত্রা—৩য় সং। 'লক্ষ্মণ-যাত্রার স্বল্প পরিসরকে নবীন যাত্রার আদিগন্ত পরিসরে রূপান্তরিত করা—এ শুধু মনোজ বসুর লেখনীতেই সম্ভব।'—দেশ। দাম তিন টাকা।

ভুলি নাই—২৫শ সং। পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। পাইকা অক্ষরে বিচিত্র সজ্জায় রজত-জয়ন্তী সংস্করণ বেরুল। দাম দুই টাকা।

বাঁশের কেল্লা—৪র্থ সং।—'The novel unfolds the epic-story of India's struggle for freedom which during the hundred and fifty years of British rule shook out of their peaceful slumber the quiet little villages all over the country..The author of BHULINAI has added one more feather to his cap'—Hindusthan Standard. দাম দুই টাকা বারো আনা।

আগস্ট, ১৯৪২—৩য় সং। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম স্মরণীয় সুবৃহৎ উপন্যাস। 'In this volume Manoj Basu has told a few of the human stories which the flame, smoke and blood had engulfed at the time, and which he has knit together in an integrated whole.'—Hindusthan Standard, দাম চার টাকা।

জলজঙ্গল—২য় সং। 'বাদা অঞ্চলের বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অপূর্ব জীবন-যাপন পদ্ধতিকে আশ্রয় করিয়া উপন্যাসের গল্পাংশ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বাদাবনের অধিবাসী-সুলভ প্রেম ও প্রতিহিংসা, দয়া ও দৌরাত্ম্য, উপকার ও উপদ্রব-প্রবণ বিপরীত-মুখী ঘটনাসমূহের ঘাত-প্রতিঘাতে কাহিনী এমন জমিয়া উঠিয়াছে যে বিস্ময় ও ব্যাকুলতার আবেগে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শেষ অবধি পড়িয়া যাইতে হয়। সমাপ্তিতে পৌঁছাইবার পূর্বে মধ্যপথে কোথাও থামিয়া দাঁড়াইবার ছেদ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।'—আনন্দবাজার। দাম চার টাকা।

শত্রুপক্ষের মেয়ে—৪র্থ সং। 'Sj Monoj Bose has a striking manner of re-producing atmosphere—of bringing to the readers' mind the vast alluvial streches, the mighty rivers in spate, fearless spirits in the passion for fight and the ways of human heart that beat the same through different ages and times'—Amrita Bazar. দাম সাড়ে তিন টাকা।

যুগান্তর—২য় সং। 'শত্রুপক্ষের মেয়ে' উপন্যাসের কিশোর-সংস্করণ। রসসমৃদ্ধ অপরূপ পরিবেশ। ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেবার সর্বাংশে উপযোগী। দাম দুই টাকা।

সবুজ চিঠি (প্রকাশিতব্য)

গল্প

মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প—৩য় সং। একখানা বইয়ের ভিতর দিয়েই মনোজ বসুর সৃষ্টির সমগ্র রূপটি প্রস্ফুটনের চেষ্টা হয়েছে। দাম পাঁচ টাকা।

দিল্লি অনেক দূর—'স্বাধীনতার জন্য একদা যে দিল্লি চলো—ধ্বনি উচ্চারিত হইয়াছিল ভারতের পূর্ব দেশ হইতে দেশপ্রেমিক ফৌজের নেতার মুখে, সে ধ্বনি আজ থামিয়া গিয়াছে বটে—কিন্তু দিল্লি এখনো দূরেই আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গল্পগুলির উপর এক নূতন আলোকপাত হইয়াছে। কিন্তু মনোজবাবু দুর্দান্ত আশাবাদী লেখক, তাই তাঁহার গল্পগুলি শেষ পর্যন্ত মনে সকল নৈরাশ্যের মধ্যেও একটা জীবনের ধ্বনি বাজাইয়া তোলে, মন আনন্দে ভরিয়া যায়।'—যুগান্তর। দাম দুই টাকা।

দুঃখ-নিশার শেষে—৩য় সং। 'বর্তমান গল্পসংগ্রহে মনোজ বসুর আধুনিক দৃষ্টির চরম বিকাশ পরিলক্ষিত হইল'—শনিবারের চিঠি। দাম দুই টাকা।

উলু—২য় সং। 'অভিভূত-করা ট্রাজেডি গল্প।...মনোজ বাবুর গল্পের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহাদের কাছে বইখানি অবশ্যই অভ্যর্থনা পাইবে'—যুগান্তর। দাম দুই টাকা চারি আনা।

একদা নিশীথ কালে—শোভন সচিত্র ৪র্থ সংস্করণ। 'হালকা লেখাতেও মনোজ বসুর ক্ষমতা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইবেন।'—শনিবারের চিঠি। দাম দুই টাকা।

কাচের আকাশ—'পড়তে পড়তে মনে হয় কে যেন সামনে বসে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে, বড় মিষ্টি। লিখতে অনেকে পারেন, কিন্তু মনোজবাবুর মত এমন সহজে মনকে ছোঁবার ক্ষমতা বোধ হয় কম লেখকেরই আছে'—দেশ। দাম দুই টাকা।

দেবী কিশোরী—২য় সং। বনমর্মর যুগের অবিস্মরণীয় বই। নানা গোলযোগে এই বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ দশ বৎসরাধিক কাল ছাপা সম্ভব হয় নি। দাম দুই টাকা।

পৃথিবী কাদের? ৩য় সং। 'It is a departure in the fiction-literature of the province'—Amrita Bazar. দাম দেড় টাকা।

নরবাধ ৪র্থ সং। 'বাংলা সাহিত্যে ইহার জুড়ি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই প্রসঙ্গে ইহা বলিয়া রাখিতে চাই যে এ গ্রন্থের ঐ দুইটি গল্প যিনি লিখিয়াছেন, তিনি আর যাহাই লিখুন বা না লিখুন, কেবল ঐ দুইটির জন্য (আরেকটির নাম 'নরবাঁধ') বাংলার শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের চত্বরে স্থায়ী আসন লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে আসন অতি অল্প কয়েকজনই দাবী করিতে পারেন'—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, বঙ্গদর্শন। দাম দুই টাকা।

বনমর্মর—৪র্থ সং। 'যে retrospect, চিন্তার গভীরতা এবং মনের বেদনা-বোধ থাকিলে লেখা চিরন্তনের পর্যায়ে গিয়া পেঁছায়, তাহা মনোজ বসুর আছে'—পরিচয়। দাম আড়াই টাকা।

খদ্যোত—২য় সং। 'ছোট গল্প বলিতে যাহা বোঝায়, এগুলি ঠিক তাহাই। ছোট এবং গল্প দুই-ই। প্লটের চমৎকার বিস্ময়। রস ঘনীভূত। দীপ্ত হীরকের, খদ্যোতের মিটিমিটি নহে।'—যুগান্তর। দাম দুই টাকা

কুঙ্কুম—খদ্যোতের মতো অতি-ছোট গল্পের সংকলন। দাম দুই টাকা।

কিংশুক—খদ্যোত ও কুঙ্কুমের মতো অতি-ছোট গল্পের সংকলন। দাম দুই টাকা।

নাটক

নূতন প্রভাত—৫ম সং। 'এই প্রকার সমস্যা লইয়া ও এই ভাবের সত্যদিদৃক্ষা ও সাহসের সঙ্গে লেখা নাটক বাংলায় পড়ি নাই'—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। দাম দুই টাকা।

রাখিবন্ধন—'বিদেশী শাসকের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে দুর্বার জাতীয় প্রতিরোধের কণ্ঠরুদ্ধ করিবার জন্য দেশীয় তাঁবেদারদের সহায়তায় শাসকগোষ্ঠির বর্বর অত্যাচার এবং জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নিঃশব্দ দুঃখবরণ ও মর্মচেরা আত্মদানের কাহিনীকে মূলত উপজীব্য করিয়া এই নাটকখানি গড়িয়া উঠিয়াছে।'—যুগান্তর। দাম দেড় টাকা।

প্লাবন ৪র্থ সং। 'নাটকের সংবেদনশীলতা ও লিপিচাতুর্য রসপিপাসুদের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে'—যুগান্তর। দাম দেড় টাকা।

বিপর্যয়—'কোন নাটকের প্রথম পর্যায়ে উন্নীত হইবার জন্য যে গুণ থাকা দরকার, আলোচ্য নাটকে তাহার সব কিছুই আছে। নানা ঘাতপ্রতিঘাতে নাটকের গতি হইয়াছে দ্রুততর, ডায়ালোগ জোরালো ও স্বচ্ছন্দ-গতি। বিষয়বিন্যাসে বৈচিত্র্য আছে'—আনন্দবাজার। দাম দুই টাকা।

শেষলগ্ন (প্রকাশিতব্য)

ভ্রমণ-কথা

চীন দেখে এলাম (১ম পর্ব) সম্পর্কে—

Amrita Bazar Patrika—Sri Monoj Basu is almost a household name in Bengali and his position both as a story-writer and a novelist is in the front rank. . . . Being a story-teller himself, Sri Basu has unfolded the story of New China in a brilliant manner, as a result of which this delightful travel-book reads almost like a novel. . . . The main trend of his approach is humane as well as national. He has written what he has seen, and has given complete pen-picture of whatever appeared striking to him. The lucidity and richness of his language take the reader for a moment to that ancient land of culture and glory. The travel-talk has reached the perfection of beautiful belles-letters . . . "Chin Dekhey Elam" is a truthful representation of New China blended with humour and gossip. Undoubtedly, this book will remove misconception and misgivings on New China and shall further strengthen the cultural bond between the two great nations. With this book Sri Basu has proved that he is quite an adept in skillfully presenting abstract subjects in plain and simple manner. . .

চীন দেখে এলাম (১ম পর্ব)—দাম তিনটাকা।

চীন দেখে এলাম (২য় পর্ব)—দাম তিন টাকা আট আনা।

সকল পত্র-পত্রিকা একমত—

যুগান্তর—যে শ্রদ্ধার সঙ্গে অগ্রসর হইলে কোন-কিছুর যথার্থ মূ
নিরূপণ করা সম্ভব হয়, মনোজ বসু সেই শ্রদ্ধার সঙ্গে চীনকে দেখিব
চেষ্টা করিয়াছেন। একটা জাতিকেই তিনি দেখিয়াছেন, সাম্যব
নামক রাষ্ট্রনীতি তিনি দেখিবার চেষ্টা করেন নাই। রাষ্ট্রনীতির কো
কথাও নাই, প্রচারও নাই। "চীন দেখে এলাম" নামটি সেজন্য সার্থক

আনন্দবাজার—ভ্রমণের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে তিনি সাহিত্যে
রসে স্নিগ্ধ করে নিয়েছেন; মাধুর্যময় ভঙ্গীতে তার একটি আনুপূর্বি
বর্ণনা দিয়েছেন। সে বর্ণনা সুন্দর, রসোত্তীর্ণ। ছোটখাটো এক-এক
ঘটনা, ছোটখাটো এক-একটি অনুভূতিও সেই বর্ণনার প্রসঙ্গে এ
জীবন্ত হয়ে দেখা দিয়েছে যে তাতে মুগ্ধ হতে হয়। লেখকের পরিহা
রসোজ্জ্বল চিত্তের স্পর্শে তা আরও মাধুর্যময় হয়ে উঠেছে। গ্রন্থখানি
সর্বত্রই তাঁর আন্তরিকতার উত্তাপ অনুভব করা যায়।

স্বাধীনতা—ভ্রমণ-কাহিনী হিসাবে বইখানিকে অভিনব বলা চলে
লঘু পরিহাস ও প্রবল কলহাস্যের মধ্যে বৈঠকখানায় বসিয়া লেখক যে
চীনের গল্প বলিতেছেন। আপাতদৃষ্টিতে যাহা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ঘটনা
তাহাকে মুহূর্তে অসাধারণ করিয়া তুলিতেছেন, নিজকে লইয়া রসিকতা
করিতে করিতে চীন-ভারত মৈত্রীর গুরুগম্ভীর প্রশ্নটি কখন যে উত্থাপন
করিয়াছেন, মুগ্ধ পাঠক বুঝিতেই পারে নাই।…ক্ষুদে অভিভাবকদে
যন্ত্রের বেড়াজাল গোপনে ডিঙাইয়া ভারতীয় দোকানীর দোকানে
সওদা করিতে যাইবার পরম সরস কাহিনীর অন্তরালে কখন যে দ্রব্য
মূল্যবৃদ্ধি ও কালোবাজারের বিরুদ্ধে নবীন চীনের নির্মম সংগ্রামে
গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি উঁকি মারিতে শুরু করিয়াছে, মশগুল পাঠক তা
বুঝিতে পারেন নাই। চিয়াং আমলের মুদ্রাস্ফীতি-কলঙ্কের পাশাপাশি
নবীন চীনের মুদ্রার দৃঢ়তা ও স্থিতিশীলতার একটি তুলনামূলক চি
আঁকিতে বসিয়া ক্রয়-বিক্রয়, লেন-দেন, ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি গুরুতর নীর
তত্ত্ব তথ্য সহ পরিবেশন করিতে গিয়া যে লঘু পরিহাসের আবহাওয়া
সৃষ্টি করিয়া পাঠকের বিমুখ মনকে টানিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে বিস্ম
বোধ করিয়াছি।…এ কাহিনী সততা, অন্তর্দৃষ্টি ও লিপিচাতুর্যের এ
অপূর্ব সম্মেলন।